ইস্কাবনের টেক্কা

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

BanglaBook.org

ইস্কাবনের টেক্কা

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

প্রথম 'মিত্র-ঘোষ' সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৮২
পঞ্চম মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১৮

—নব্বই টাকা—

প্রচ্ছদপট :
অঙ্কন—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রণ—রাজা প্রিন্টার্স

ISKABANER TEKKA
A detective novel by Niharranjan Gupta. Published by
Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.,
10 Shyama Charan Dey Street, Kolkata 700 073

Price Rs. 90/-

ISBN : 81-7293-508-0

শব্দগ্রন্থন : পাইকা ফটোসেটার্স

॥ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ॥
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনও রকম পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনর্ব্যবহার বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘন করলে লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ হইতে পি. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও অটোটাইপ, ১৫২ মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
প্রীতিভাজনেষু

অনেক বছর আগে একটি রহস্যকাহিনী রচনা করেছিলাম, 'অভিশপ্ত পুঁথি' নাম দিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, প্রথম মুদ্রণ আর নিঃশেষ হ'লো না। বছরের পর বছর গড়িয়ে যায় অব্যয় অক্ষয় হয়ে প্রথম মুদ্রণ থেকে যায়—তারপর আমার পাঠকরা তো ভুলে গেলই আমি নিজেও বুঝি ভুলে গিয়েছিলাম বইটার কথা, কথাটা অকস্মাৎ মনে করিয়ে দিল আমার এক বন্ধু।

বললেন, 'অভিশপ্ত পুঁথি' নামে তোমার একটা বই ছিল না?

বললাম, একটা ছিল যেন মনে পড়ে।

তখন বললেন তিনি, লোকে সেটা চায়—দেখ না কি করতে পার।

সেই খুঁজে তখন বের করলাম জীর্ণ লাল হয়ে যাওয়া বইখানা।

অসংখ্য ভুল ও অসামঞ্জস্যে ভরা—পাতার পর পাতা।

তখন নতুন করে লিখলাম—সংশোধন করলাম—আগাগোড়া—'ইস্কাবনের টেক্কা'র জন্ম ইতিকথা ঐটুকুই তিন পর্বে।

পাঠকসাধারণ যদি এখন আমার শ্রমকে স্নেহের চোখে দেখেন তবেই শ্রম আমার সার্থক।

উল্কা **নীহাররঞ্জন গুপ্ত**

২৬/এ গড়িয়াহাট রোড

কলিকাতা-১৯

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ইস্কাবনের টেক্কা

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

১৯৪১ য়ের শেষের দিক।

যুদ্ধের জীবনধ্বংসী আগুন চারিদিকে লেলিহ শিখায় ছড়িয়ে পড়েছে।

অষ্টম বাহিনীর পতন—মস্কোর সংগ্রাম শুরু এবং মাত্র কয়দিন আগে—৭ই ডিসেম্বর—জাপান অতর্কিতে পার্লহারবার আক্রমণ করেছে—অজস্র বোমা বর্ষণ করেছে।

এমনি এক সন্ধ্যায়—আগের দিন মাত্র ব্রিটিশের সুবিখ্যাত অর্ণব-পোত প্রিন্স্ অফ্ ওয়েলস্ ও রিপালস্ জাপান টর্পেডো মেরে ডুবিয়ে দিয়েছে—তার পরদিন ১১ই ডিসেম্বর—জার্মানী ও ইটালী—আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

ঐদিনকার সংবাদপত্রে সেই সংবাদটাই ফলোয়া করে বেরিয়েছিল এবং সেই সংবাদ পড়তে পড়তেই হঠাৎ এক জায়গায় সংবাদপত্রের শেষ পৃষ্ঠায়—নীচের দিকে একটি বিচিত্র সংবাদ সুব্রতর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

Ace of Spades. ইস্কাবনের টেক্কা।

একটা বক্স করে শুধু বড় বড় অক্ষরে মাত্র ঐ একটি কথাই লেখা—Ace of Spades. ইস্কাবনের টেক্কা।...

কত রকমের বিজ্ঞাপনই না বার হয় আজকাল।

সুব্রত ভাবছিল : ঐ অদ্ভুত বিজ্ঞাপনের কি অর্থ কে জানে!...পাতা উল্টে আবার আগের পৃষ্ঠায় আসে সুব্রত অন্যমনস্কভাবে এবং হঠাৎ ঐ পৃষ্ঠাতেও শেষের দিকে—ডানদিকে আর একটি জায়গায় নজর পড়ে তার।

ক্রিশ্চানা M. S.

Ace of Spades...

বক্স করে কথা দুটো ছাপা।

ভৃত্য এসে ঐ সময় ঘরে ঢুকল—হাতে তার ঐদিনকার সান্ধ্য টেলিগ্রাম—চা দেব দাদাবাবু?

দে—কিরে টেলিগ্রাম বুঝি!

আজ্ঞে—রাস্তায় বিক্রী করছিল নিয়ে এলাম—

দেখি—

হাত বাড়িয়ে সুব্রত টেলিগ্রামটা নেয়।

যুদ্ধের অন্যান্য সংবাদের মাঝখানে বিশেষ একটি সংবাদ—সর্বশেষ ইভাকুইসদের প্রায় হাজারখানেক স্ত্রী পুরুষ শিশু যাত্রী নিয়ে যাত্রীবাহী ক্রিশ্চানা নামক জাহাজটি যা ধীরে ধীরে, সিংগাপুর থেকে কলকাতার দিকে আসছিল সেই জাহাজটিকে শত্রুরা টর্পেডো মেরে ভারত মহাসাগরে ডুবিয়ে দিয়েছে—

হঠাৎ যেন চমকে ওঠে সুব্রত।

ক্রিশ্চানা জাহাজ।

Ace of Spades.

ক্রিশ্চানা জাহাজ—ইস্কাবনের টেক্কা।

তবে কি ঐ ডুবে যাওয়া ক্রিশ্চানা জাহাজ সম্পর্কেই কোন গোপন সংবাদ—আশ্চর্য নয়—চারিদিকে শত্রুর পঞ্চম বাহিনী—স্পাইরা—ঘুরছে।

BanglaBook.org

ভারত মহাসাগরের জলরাশি শান্ত নিস্তরঙ্গ, কাচখণ্ডের মতই মসৃণ।

১৯৪১য়ের ডিসেম্বর। রাত্রি প্রায় দেড়টা হবে। সেই সন্ধ্যা থেকে আকাশটা মেঘলা করে আছে। মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করে এক এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। মেঘাচ্ছন্ন মসীকৃষ্ণ আকাশ থম থম করছে। চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। অন্ধকার প্রকৃতি যেন সাগরের কালো জলের বুকে লেপ্‌টে একাকার হয়ে গিয়েছে। একে ডিসেম্বর মাস, তাতে আবার সামান্য বৃষ্টি হওয়ায় ঠাণ্ডাটা হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড কনকনে।

সর্বশেষ ইভাকুইয়ের দল। প্রায় হাজারখানেক যাত্রী নিয়ে 'ক্রিশ্চানা' জাহাজখানা সিংগাপুর থেকে কলকাতা অভিমুখে এগিয়ে চলেছিল।

জাহাজের মধ্যেও ব্ল্যাক আউট। ভিতরের কেবিনে কেবিনে ঠুলি ঢাকা আলো জ্বলছে বটে, কিন্তু ডেকে বা অন্য কোথাও কোন আলো নেই। ইন্‌জিনের ঘর-র-র শব্দ একটানা শোনা যায় কেবল।

হাজার যাত্রীর পক্ষে জাহাজে স্থান সংকুলান হওয়া সত্যই দুষ্কর। একদল পশুর মতই যেন নর-নারী ও শিশুর দল ওরই মধ্যে গাদাগাদি ঠেসাঠেসি করে চলেছে।

সহসা ইন্‌জিনের একটানা গর্জনকে মথিত করে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দ হয় এবং সেই সঙ্গে সমস্ত জাহাজটা যেন প্রবল বেগে থর থর করে কেঁপে ওঠে।

প্রথম শ্রেণীর একটা কেবিনে সিংগল বার্থের উপরে একজন মধ্যবয়সী পুরুষ শুয়েছিলেন, সেই শব্দে ও জাহাজের কাঁপুনিতে ধড়ফড় করে বার্থের উপরে উঠে বসলেন।

কেবিনের মধ্যে বিদ্যুৎবাতি জ্বলছে।

ভদ্রলোকর বয়স চল্লিশের কোঠা পেরিয়ে গেছে বলেই মনে হয়। ঢ্যাঙা লম্বা চেহারা। পেশল বলিষ্ঠ গঠন। রগের দু'পাশের চুলে পাক ধরেছে। কপালের চামড়ায়ও ভাঁজ দেখা দিয়েছে। উঁচু চোয়াল। কঠিন ও দৃঢ়। হাতের আঙুলগুলো কিন্তু অদ্ভুত। শিল্পীর আঙুলের মত সরু সরু লম্বাটে। ভদ্রলোক এক লাফে বার্থ থেকে নীচে নেমে পড়লেন এবং দ্রুত এগিয়ে গিয়ে কেবিনের দরজাটা খুলতেই একটা অস্পষ্ট গোলমালের শব্দ শুনতে পেলেন। বহুলোকের উত্তেজিত মিশ্র কণ্ঠস্বর।

দু'চার সেকেণ্ড কান পেতে শুনলেন, পরক্ষণেই কেবিনের মধ্যস্থিত গা-আলমারিটার দরজা টান দিয়ে খুলে ফেললেন। আলমারির মধ্যে একটা মাঝারি গোছের সুট্‌কেশ ছিল, কেবিনের গায়ে হুকে ঝুলানো ওভারকোটের পকেট থেকে একটা চাবি বের করে সুট্‌কেশটা খুলে ফেললেন। সুট্‌কেশের মধ্যে ছিল একটা বড় লেপাফা, শিলমোহর করা। লেপাফাটা নিয়ে ওভারকোটের পকেটে রেখে কোটটা গায়ে চাপাচ্ছেন, এমন সময় কেবিনের দরজাটা খুলে গেল।

চম্‌কে ভদ্রলোক পিছন ফিরে তাকালেন।

হীরা সিং! ...আগন্তুকের গলার স্বর চাপা উত্তেজনায় যেন ভেঙে পড়ে।

আগন্তুকের বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশের মধ্যে। লম্বায় পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির বেশী হবে না। বলিষ্ঠ সবল চেহারা, পরিধানে লংস ও গায়ে গরম সার্জের কোট। মাথার চুলগুলি ছোট ছোট করে ছাঁটা। একটা চোখ সামান্য ট্যারা।

আগন্তুক বলতে লাগল, সর্বনাশ হয়েছে মিঃ সিং। সাবমেরিন জাহাজটাকে জখম করেছে। জাহাজ ডুববার আর বেশী দেরি নেই। যাত্রীরা সব ডেকের ওপরে গিয়ে গোলমাল শুরু করেছে।

আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে মিঃ সিং মুখ ও ঠোঁট নেড়ে কী যেন কতকগুলো ইঙ্গিতে বলে

BanglaBook.org

গেলেন, কিন্তু মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হলো না, শুধু ঠোঁট দু'টোই নড়ে গেল। বোঝা গেল মিঃ সিং বোবা।

আগন্তুকের কিন্তু মিঃ সিংয়ের ঠোঁট নাড়া দেখে তার বক্তব্য বুঝতে কষ্ট হলো না, সে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালো এবং নিঃশব্দে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে কেবিন থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

* * *

সেলুন ডেকে তখন অসংখ্য যাত্রী প্রাণভয়ে ভীত ঠেসাঠেসি গাদাগাদি করে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে।

ভীত ত্রস্ত নরনারীর মৃদু অস্ফুট গুঞ্জন। হঠাৎ মাইক্রোফোনে ক্যাপটেনের ভারী গলা শোনা গেল। থেমে গেল মৃদু গুঞ্জন, হাজার শ্রবণেন্দ্রিয় উৎকর্ণ হয়ে উঠল ঃ

'Attention Please! দুর্ভাগ্যবশতঃ শত্রুপক্ষের ডুবোজাহাজ আমাদের জাহাজকে জখম করেছে। জাহাজের ভিতরে সমুদ্রের জল ঢুকছে। জাহাজ ডুবে যাবে। কিন্তু আমাদের এই ভয়ঙ্কর দুঃসময়েও সাহস হারালে চলবে না। ধৈর্য ও সাহস রাখতে হবে। যথাসাধ্য আমরা কর্তৃপক্ষেরা চেষ্টা করবো সকলের প্রাণ বাঁচাতে, যতক্ষণ না শেষ আদেশ আমরা জারি করি কেউ প্রাণভয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করবে না। সব যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকো। গোলমাল করলে আমাদের কাজ পণ্ড হবে। কেউই প্রাণে বাঁচবে না।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত যাত্রীরা স্থির নিষ্কম্প। কারো মুখে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই।

জাহাজ থেমে গেছে নিশ্চয়ই। ইন্‌জিনের শব্দ আর শোনা যায় না। কিন্তু অস্পষ্ট একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। জাহাজের ভগ্ন অংশ দিয়ে তীব্র স্রোতে সাগরের জলধারা জাহাজের খোলে প্রবেশ করছে।

জাহাজ ডুবছে। ধীরে ধীরে একটু একটু করে।

* * *

অন্ধকারে মানুষের ভীড় ঠেলে ঠেলে মিঃ সিং জাহাজের হালের দিকে এগিয়ে চলেছেন। অন্ধকার। নিশ্ছিদ্র নিকষ কালো সীমাহীন অন্ধকার যেন মৃত্যু-ক্ষুধায় মুখব্যাদান করে সব কিছু গ্রাস করতে উদ্যত। জলের বুকে ঢেউগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে সাদা ফেনার গুঁড়োগুলো যেন হিংস্র হায়নার দাঁতের মতই ঝিকিয়ে ওঠে।

একটা রবার ব্যাগের মধ্যে সেই শিলমোহর করা লেপাফাটা ভরে ব্যাগটার মুখটা হাওয়া ভরে বেঁধে রেলিংয়ের উপর থেকে ঝুঁকে সাগরের জলে মিঃ সিং নিক্ষেপ করলেন। জলের বুকে সেই ব্যাগটা ভাসতে লাগল ঢেউয়ের দোলায় দোলায়।

* * *

জাহাজের ছাদে। রেডিও অপারেটারের ঘর।

রেডিও অপারেটার রেডিওর উপরে ঝুঁকে পড়ে অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে রেডিওর চাবি টিপছে। যাত্রীদের প্রাণরক্ষার জন্য S.O.S. পাঠাচ্ছে।

সঙ্গীন মুহূর্ত। টক্ টক্ শব্দ হচ্ছে।

সামনেই টেবিলের উপরে একটা শেড্ ঢাকা নীল বাতি জ্বলছে। রেডিও অপারেটারের কোন দিকে আর খেয়াল নেই। S.O.S. পাঠাতেই সে ব্যস্ত।

নিঃশব্দে কে একজন সেই ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। লোকটা ঢ্যাঙা, গায়ে একটা ওভারকোট। মুখে একটা কালো রংয়ের পাত্‌লা মুখোশ। মুখোশের দু'টি গর্ত দিয়ে শুধু দু'টি

BanglaBook.org

ভয়ঙ্কর চক্ষু দেখা যায়। ডান হাতে উদ্যত একটি পিস্তল। মুখোশধারী নিঃশব্দে এসে রেডিও অপারেটারের সামনে দাঁড়ায়।

ডান হাতে তার উদ্যত পিস্তল। পিস্তলটির লক্ষ্য রেডিও অপারেটারের কপাল। বাম হাত দিয়ে পকেট থেকে একটি কাগজের টুকরো বের করে মুখোশধারী রেডিও অপারেটারের কাছে রাখতেই, অপারেটার মুখ তুলে তাকায় সামনের দিকে।

তাকানোর সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখ দুটো বিস্ময়ে আতঙ্কে বড় বড় হয়ে গেল। সামনেই পিস্তলের সরু নলটা। কালো মুখোশের ফুটো দিয়ে চোখের দৃষ্টি যেন হিংস্র শ্বাপদের চোখের মত জিঘাংসায় ভরা। মুখোশধারী নিঃশব্দে বাম হাত তুলে অপারেটারের টেবিলের উপরে রক্ষিত কাগজটার প্রতি সংকেত করে।

অপারেটার বোকার মতই কাগজের টুকরোটার দিকে এবারে তাকাল। পরিষ্কার বড় বড় অক্ষরে লেখা ঃ

Send this message
'Ace of Spades'

অপারেটার আবার মুখোশধারীর দিকে মুখ তুলে তাকাল। শীতের রাত্রেও তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। মুখোশধারীর হাতের উদ্যত পিস্তলটা সামনের দিকে আর একটু এগিয়ে এলো, এবারে অপারেটারের কপাল প্রায় ছোঁয়-ছোঁয়।

মৃত্যু! কঠিন মৃত্যু! শুধু একটি বুলেট। তারপরেই শেষ।

মুখোশধারী কাগজটার প্রতি আবার সংকেত করলে। অর্থাৎ সংবাদটা এখুনি পাঠাও নচেৎ দেখতে পাচ্ছো, এই পিস্তলের একটি গুলিতেই তোমার মৃত্যু অনিবার্য। যেন যমের কঠিন অনুশাসন। মৃত্যুর অবধারিত ভয়ংকর নির্দেশ।

অপারেটার এবার একটু নড়ে উঠল, তুমি কী পাগল হয়েছ, হাজার হাজার যাত্রীর প্রাণ বিপন্ন। আমি এখন S.O.S. পাঠাচ্ছি এদের প্রাণ যাতে কোন মতে রক্ষা হয় তার জন্য। আর এই সময় হলো তোমার এই সংবাদ পাঠাবার?

নির্বাক মুখোশধারী নিঃশব্দে অপারেটারের দিকে আরো একটু এগিয়ে এসে চাপা গলায় বলে, যা বলছি, শোন—

সহসা পিস্তলের ঠাণ্ডা নলটা অপারেটারের কপাল স্পর্শ করল, অপারেটার দেখলে মুখোশধারীর ডান হাতের আঙুল পিস্তলের ট্রিগারের উপরে ক্রমে চেপে বসছে। সমস্ত মুষ্টিটা শক্ত হয়ে উঠছে। হাতের শিরাগুলি যেন সজাগ হয়ে উঠছে। একটা ঠাণ্ডা স্রোত ওর শিরদাঁড়া বেয়ে শির শির করে নিচের দিকে নেমে গেল।

চম্‌কে উঠে অপারেটার রেডিওর 'কীবোর্ডের' উপরে ঝুঁকে পড়ে ততক্ষণে চাবি টিপতে শুরু করেছে ঃ "ইস্কাবনের টেক্কা! ...ইস্কাবনের টেক্কা! ...Ace of Spades! Ace of Spades!"

ওদিকে জাহাজ ক্রমে একটু একটু করে জলধির তলে তলিয়ে যাচ্ছে তখন।

॥ ১ ॥

সুব্রত দুটো ব্যাপারকে একসঙ্গে জোড়া দেবারই বোধ হয় চেষ্টা করছিল—হঠাৎ ঐ সময় কানে এল সিঁড়িতে জুতোর শব্দ। খোলা দরজাটার দিকে তাকাল সুব্রত।

BanglaBook.org

দ্রুত চঞ্চল পদে কে যেন জুতো পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে।

একটা আরাম-কেদারার উপর সুব্রত আড় হয়ে শুয়েছিল, সোজা হয়ে উঠে বসল। আগন্তুক সোজা এসে সুব্রতর ঘরেই ঢুকল একটা যেন ছায়মূর্তির মত।

কে?

সুব্রতবাবু! সুব্রতবাবু আছেন? উত্তেজনায় আগন্তুকের কণ্ঠস্বর যেন ভেঙে পড়তে চায়।

সুব্রত উঠে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে ঘরের বিদ্যুৎবাতিটা জ্বেলে দিল। ঢাকনি দেওয়া বিদ্যুৎবাতির আলোয় ঘরটা স্বল্পালোকিত হয়ে উঠল। স্বল্পালোকে সুব্রত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে তাকাল।

আগন্তুক একজন চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবক। রোগা লিক্‌লিকে চেহারা। রক্তশূন্য ফ্যাকাশে রং, মুখখানি লম্বাটে, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। মাথার চুল উস্কখুস্ক। পরিধানে ধুতি ও দামী ভায়লার অ্যাশ্ কলারের ঢোলা-হাতা পাঞ্জাবি। চোখে মুখে ফুটে উঠেছে একটা আতঙ্ক-মিশ্রিত উদ্বেগের চিহ্ন। যুবক নিশ্চয়ই অত্যন্ত দ্রুত চলে এসেছে, এখনও রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

সুব্রত এক দৃষ্টিতেই বুঝলো যুবক কোন অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে।

সুব্রতবাবু আছেন?

আমারই নাম সুব্রত রায়, বসুন। আপনি অত্যন্ত হাঁপিয়ে পড়েছেন দেখছি। সুব্রত যুবককে সামনেই একখানা চেয়ারে বসবার জন্য নির্দেশ করলে। যুবক বিনা বাক্যব্যয়ে থপ করে নির্দিষ্ট চেয়ারটার উপর বসে পড়ল।

আপনি?...আপনাকে তো চিনতে পারলাম না—সুব্রত শুধায়।

আমার—আমার নাম শশাংক মিত্র—যুবক তখনও হাঁপাচ্ছে।

আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে শশাংকবাবু, কোন কারণে আপনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন যেন।

ঠিকই ধরেছেন। আমি বিশেষ একটা বিপদে পড়েই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

বিপদ!

হ্যাঁ—অত্যন্ত বিপদ—

ঐ সময় ভৃত্য ট্রেতে করে এক পেয়ালা ধূমায়িত সোনালী চা নিয়ে এসে টীপয়ের ওপরে রাখল।

নিন্ শশাংকবাবু, চা খান। এগিয়ে দেয় সুব্রত চায়ের কাপটা শশাংকর দিকে।

চা?

হ্যাঁ, চা-টা খেয়ে নিন্ আগে, তারপর শুনছি—

বিনা বাক্যব্যয়ে শশাংক চায়ের পেয়ালাটা হাতে তুলে নিল।

সুব্রত ভৃত্যকে আর এক কাপ তার জন্য চা আনতে বলল।

ভৃত্য চলে গেল।

এদিকে শশাংকর চা-পানের পর সুব্রত প্রশ্ন করে, বলুন এবার কি বলছিলেন?

সুব্রতবাবু, একটা বিশেষ বিপদে পড়েই আপনার কাছে আমি ছুটে এসেছি। আমি আপনার বাড়ির সামনের বাড়ি ঐ 'স্মৃতিকুটিরে' থাকি।

কিন্তু আপনাকে কখনো ওখানে দেখেছি বলে—

না দেখাই সম্ভব, কারণ বেশীর ভাগ সময়ই আমি থাকি পাটনায়। স্মৃতিকুটির আমাদেরই

BanglaBook.org

বাড়ি, এতদিন ভাড়া খাটছিল, যুদ্ধ শুরু হওয়ায় ভাড়াটে উঠে গেছে। একজন দারোয়ান ও আমাদের পুরাতন অনেক দিনের বৃদ্ধ ভৃত্য স্বরূপদা শুধু বাড়িতে থাকে, তা সেও দু'দিন নেই, দারোয়ানটাও পালিয়েছে বোমার ভয়ে। অত বড় বাড়িতে আমার একা একা থাকতে যেন কেমন ভয় করতে লাগল, তাছাড়া—

তাছাড়া....বলুন, থামলেন কেন? সুব্রত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শশাংকর মুখের দিকে তাকায়। ভদ্রলোকের কথাগুলো এলোমেলো কেমন।

আমি আজ আমার বাড়িতে থাকতে সাহস পাচ্ছি না সুব্রতবাবু।

বেশ তো। রাত্রে আমার এখানেই থাকুন না কেন, আমারও সমস্ত বাড়িটা খালি। কিন্তু কলকাতা শহরে আপনার একটা বড় বাড়িতে একা একা থাকতে ভয় করছে কেন বলুন তো? সুব্রত শশাংককে প্রশ্ন করে।

কেন যে ভয় করছে তা আপনাকে আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না সুব্রতবাবু। কুণ্ঠিত দ্বিধায় যেন শশাংকর গলার স্বর বুজে আসে।

সুব্রত একান্ত বিস্মিতভাবে শশাংকর মুখের দিকে তাকায়। চকিতে অনেকগুলো চিন্তা একসঙ্গে ওর মনের আশপাশে ভিড় করে দাঁড়ায়। সুবেশধারী সুশ্রী যুবক, দেহে বেশভূষায় আভিজাত্যের সুস্পষ্ট পরিচয়। চেনা নেই, জানা নেই, হঠাৎ এসে বিপদে পড়েছি বলে একজন অচেনা ভদ্রলোকের কাছে আবেদন জানাচ্ছে, নিজের বাড়িতে রাত্রে থাকতে সাহস হচ্ছে না। নিজের বাড়িতে থাকতে তার ভয় করছে। এ ধরনের ভদ্রবেশধারী অনেক যুবক নানান ফিকিরে ভদ্রলোকের বাড়িতে প্রবেশ করে ডাকাতি করে সরে পড়ে; আবার অনেক সময় বাড়ির অলিগলি জেনে নিয়ে পরে একসময় এসে ডাকাতি করে যায় দলবল নিয়ে। সুব্রত আবার যুবকের মুখের দিকে তাকাল। যুবক দু'হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে। মাথার এলোমেলো চুলগুলি দু'দিক দিয়ে কপালের উপরে এসে পড়েছে।

ঘরের স্বল্প আলোয় যুবককে অত্যন্ত করুণ মনে হয়।

আবার মনে হয় যুবক সত্য সত্যই হয়ত কোন বিপদে পড়েছে, সংকোচে বলতে পারছে না। ঝোঁকের মাথায় এখানে তার কাছে হয়ত ছুটে এসেছে, এখন সংকোচে পেছিয়ে যাচ্ছে। কতপ্রকার বিচিত্রতার মধ্যেই তো চিন্তা ও বিকাশ। এমন সময় ক্রিং ক্রিং ক্রিং করে ঘরের টেলিফোনটা বেজে উঠল।

সুব্রত উঠে গিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিলে, হ্যালো...হ্যাঁ, সুব্রতই কথা বলছি। কে ...কিরীটি...না ভাই, আজ রাত্রে আর তোর ওখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা হলো না। একটা বিশেষ জরুরী কাজে আট্‌কা পড়ে গেছি ভাই হঠাৎ।

আচমকা শশাংক তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ঃ না না, তা কখনোই হতে পারে না সুব্রতবাবু, আপনি আমার জন্য নিমন্ত্রণে যাবেন না তা হতে পারে না, আমি তা হতে দেবো না।

সুব্রত শশাংকর মুখের দিকে একটিবার তাকাল মাত্র, চোখের কোণে জেগে উঠলো একটুখানি হাসি, পরক্ষণেই সে আবার বলতে লাগল, আরে না না, দেখা হলে সব বলবো। আচ্ছা ভাই, গুড নাইট।...

সুব্রত রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

এ কখনোই হতে পারে না সুব্রতবাবু। আমার জন্য আপনি যাওয়া বন্ধ করতে পারবেন না। আমি এখুনি চলে যাচ্ছি...আচ্ছা আসি নমস্কার। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে যুবক ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে

BanglaBook.org

যাবার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু সুব্রত এগিয়ে এসে বাধা দিল, শুনুন শশাংকবাবু, কিরীটীকে একবার যখন বলে দিয়েছি আমার যাওয়া হবে না, সত্যই আমার আর যাওয়া হবে না, অর্থাৎ আমি যাব না।

তারপর হঠাৎ হাত-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা।

সুব্রত শশাংকর মুখের দিকে তাকাল, আপনার রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কী হয়েছে বলুন তো শশাংকবাবু?

আজ সকালে মাত্র কলকাতায় এসে পৌঁছেছি, দুপুরে হোটেলেই খেয়েছিলাম, সন্ধ্যায় হোটেলেই খাবো।

বেশ তবে চলুন, কোন একটা ভাল হোটেলে গিয়ে দু'জনে খেয়ে আসা যাক। নিমন্ত্রণটা ফসকে যাবার আক্ষেপটা আর তাহলে থাকবে না, কি বলেন।

কিন্তু...

এর মধ্যে আর কোন কিন্তুই থাকতে পারে না, আপনি এক মিনিট দাঁড়ান, আমি চট করে তৈরী হয়ে নিই।

আসল কথা শশাংক যে সুব্রতর একেবারে অপরিচিত তা নয়—পাটনায় ও থাকলেও ইতিপূর্বেও দেখেছে শশাংককে সামনের বাড়িতে।

ভদ্র যুবক।

যাহোক সুব্রত পাশের ঘরে গিয়ে পায়জামাটা ছেড়ে একটা ধুতি ও একটা লংক্লথের পাঞ্জাবি পরে নিল। গরম শালটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে এল, চলুন।... শশাংক নীরবে দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেণ্ড যেন কী ভাবল তারপর অত্যন্ত শ্লথ-ভাবে বললে, চলুন।

॥ ২ ॥

গ্যারেজ থেকে সুব্রত তার গাড়িটা বের করে চালকের আসনে নিজে বসে শশাংককে গাড়ির দরজা খুলে আহ্বান জানাল, উঠুন।

শশাংক গাড়িতে সামনের সিটেই সুব্রতর পাশে উঠে বসল।

সুব্রত গাড়ি ছেড়ে দিল।

শীতের ব্ল্যাক-আউটের রাত্রি। অন্ধকারে ভূতুড়ে ছায়ার মত রাস্তার ফুটপাতে লোকগুলো চলাচল করছে। তবু কিন্তু দোকানে দোকানে খরিদ্দারের ভিড়।

সুব্রত আমহার্স্ট স্ট্রীট ছাড়িয়ে সোজা বৌবাজার স্ট্রীট পার হয়ে বাঁয়ে এগুতে লাগল। কোথায় যাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে।

হঠাৎ ঐ সময় মনে পড়ে, নয়া রাস্তার উপরে শ্রীবিলাসবাবুর মস্ত বড় হোটেল—'রিপোজ'—যুদ্ধের বাজারেও সেখানে বিলাতী ও দেশী সর্বপ্রকার ভাল খানাই পাওয়া যায়। চার্জও মডারেট।

সুব্রত 'রিপোজে'র দিকেই গাড়ি ছুটাল।

সুব্রত এতক্ষণে মনে মনে বেশ একটু কৌতূহলই অনুভব করছিল। ব্যাপারটা যেন আগাগোড়াই কেমন একটু খাপছাড়া। স্বভাবতই কৌতূহলী মন তার ব্যাপারটার কোথায় যেন একটা রহস্যের

BanglaBook.org

ইশারা পেয়েছে। শিকারী যেমন শিকারের গন্ধ পায়, সুব্রতও তেমনি কিছুর সন্ধান যেন পাচ্ছে। চাকরি ছেড়ে দেবার পর দেড়টা মাস ঘরে শুয়ে শুয়ে বই পড়ে, একান্ত একঘেয়ে ও অসহ্য মনে হচ্ছিল জীবন। আজ হঠাৎ এই আকস্মিক ঘটনাটা যেন তার ঘুমিয়ে-পড়া মনের কোণে বেশ একটা দোলা দিয়েছে।

শশাংক কোনও একটা বিশেষ রকম বিপদে পড়েছেই সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নেই। তা ছাড়া যে কারণেই হোক শশাংক হঠাৎ নিজেকে শামুকের মত খোলের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছে। যে আবেগে সে একটু আগে তার কাছে ছুটে এসেছিল সাহায্যের আশায়, কোন কারণে নিশ্চয়ই সে আবেগে বাধা পড়েছে। কিন্তু কেন?

নয়া রাস্তার ঠিক একেবারে উপরেই 'রিপোজ' হোটেলটি।

তিনতলা বাড়িটা। অত্যন্ত আধুনিক। দোতলায় ডাইনিং হল ও রেস্তরাঁ। তিনতলায় ফ্ল্যাট্ সিস্টেমে ভাড়া দেওয়া হয়। একতলায় সব দোকানঘর।

যুদ্ধের হিড়িকে হোটেলটিতে নানা ধরণের লোকেরই আনাগোনা। ভিড়টা সাধারণতঃ রাত্রেই একটু বেশী হয়। রাত্রি ন'টা থেকে রাত্রি সাড়ে এগারটা পর্যন্ত যারা এই হোটেলটিতে যাতায়াত করে তারা বিশেষ একশ্রেণীর অভিজাত খরিদ্দার।

সুব্রতর গাড়ি যখন হোটেলের সামনে এসে লাগল, প্রায় ২০।২৫ খানা নানা আকারের প্রাইভেট ও ভাড়াটে গাড়ি অন্ধকারে ছায়ার মত সেখানে পার্ক করা আছে।

সুব্রত গাড়ি থেকে নেমে শশাংককে সঙ্গে করে সিঁড়ি বেয়ে সোজা উপরে দোতলায় চলে গেল। হোটেলটিতে খাওয়ার ব্যবস্থা দুই প্রকারের। হলঘরে আলাদা আলাদা ছোট ছোট টেবিলে এক জায়গায় বসে খাওয়া যায়, আবার ইচ্ছা করলে বাইরের ব্যালকনিতে ছোট ছোট পার্টিশন দেওয়া জায়গা আছে, সেখানেও খাওয়া যায় অন্যের দৃষ্টির আড়ালে, নিরিবিলিতে।

সুব্রত ও শশাংক যখন এসে হলঘরে ঢুকল, হলঘরের মধ্যে অনেকেই বসে খাচ্ছে। ঘরের এককোণে রেডিওতে এনায়েৎ খাঁর সেতার বাজছে। ফিস্‌ফাস্ হাসির ও কথার শব্দ, কাঁটা-চামচ-প্লেটের মৃদু টুং টাং আওয়াজ।

হলঘরটি একেবারে শব্দ-তরঙ্গে রিম্‌ঝিম্ করছে যেন।

হলঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় একজন সাদা উর্দি পরা ওয়েটার সামনে এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল, ইংলিশ না ইণ্ডিয়ান ডিনার সাব?

ইণ্ডিয়ান ডিনার। ব্যালকনিতে প্রাইভেট ঘরে বসব। সুব্রত জবাব দিল।

যান বসুন গে, নয় নম্বর লাস্ট পার্টিশনটা খালি আছে সাব!...ওয়েটার হাত তুলে দেখিয়ে দিল।

সুব্রত শশাংককে নিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট পার্টিশনের মধ্যে প্রবেশ করল। ছোট একটি পার্টিশন দেওয়া জায়গা। মাঝখানে একটি গোলটেবিল, চারখানি গদি-মোড়া চেয়ার, একটি লক্ষ্ণৌই টেবিল ক্লথ পাতা। একটি ফ্লাওয়ার-ভাসে কিছু টাটকা সীজন ফ্লাওয়ার।

শশাংক খাচ্ছে বটে কিন্তু খাওয়াতে তেমন কোন মনোযোগ বা আগ্রহ নেই যেন।

হঠাৎ একসময় শশাংক বললে, সুব্রতবাবু আপনাকে হঠাৎ এভাবে বিব্রত করায় সত্যিই আমি লজ্জিত হয়েছি। ভেবে দেখলাম, আপনাকে আমার বিপদের সঙ্গে জড়িয়ে মিথ্যে শুধু বিব্রত করি কেন, তার চাইতে আমার বিপদ আমি একাই গ্রহণ করবো।

বিপদ! কিসের বিপদ? সুব্রত প্রশ্ন করে।

BanglaBook.org

হ্যাঁ মানে—বলতে গিয়েও বলা হয় না শশাংকর কথাটা। হঠাৎ থেমে যায়।

আর ঠিক সেই সময় পার্টিশানের আধখোলা দরজা-পথে হলঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করে শশাংক যেন কেমন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সুব্রতর সতর্ক দৃষ্টিকে কিন্তু এড়াতে পারে না সে।

সুব্রত নিঃশব্দে শশাংকর দৃষ্টি অনুসরণ করে হলঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করে। একজন বলিষ্ঠ চেহারার মধ্যবয়সী লোক একটি মোটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করতে করতে আড়চোখে ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে মনে হল।

লোকটির পরিধানে দামী গরমের কালো সার্জের সুট্।

মাথার চুলগুলো ব্যাকব্রাশ করা।

লোকটি সবে খানা শেষ করে টেবিলের সামনে উঠে দাঁড়িয়ে সিগার ধরাতে ব্যস্ত তখন।

সুব্রত চাপা-গলায় প্রশ্ন করে, লোকটাকে চেনেন নাকি শশাংকবাবু?

উত্তেজিত চাপা-কণ্ঠে শশাংক জবাব দেয়, হ্যাঁ, অরিন্দম সরকার। লোকটা হয়ত এখুনি এদিকে আসবে। ও আমাকে অনুসরণ করেই এখানে এসেছে আমি জানি। নিশ্চয়ই ও আমার উপরে লক্ষ্য রেখেছিল। বাড়ির জানালা দিয়ে আমি দেখেছিলাম তাই নির্জন বাড়িতে একা থাকতে সাহস পাইনি। আপনার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম। তারপর গলাটা আর একটু খাটো করে, সুব্রতর দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, সুব্রতবাবু, আপনাকে একটু উপকার করতে হবে, ও এখুনি এখানে আসবে তা আমি জানি—ও এখানে এলে আপনাকে এই ভাব দেখাতে হবে যেন আপনি আমার বিশেষ পরিচিত এবং আমার সমস্ত কিছুই আপনি জানেন।

সুব্রত যে অবাক হয়ে গেছে বলাই বাহুল্য, কৌতূহলটাও সেই সঙ্গে বেড়ে ওঠে। কিন্তু তার কৌতূহলের চঞ্চলতা এতটুকুও বাইরে প্রকাশ পায় না। ওদিকে অরিন্দম সরকার হলঘর থেকে সত্যিই ওদের দিকে এগিয়ে আসে। মুখে তার জ্বলন্ত সিগার।

লোকটি বরাবর এসে ওদের সামনে দাঁড়ায়, বলে, 'ক্ষমা করবেন, মিঃ শশাংক মিত্রের সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা ছিল।

সুব্রত পাশের খালি চেয়ার ইঙ্গিত করে বলল, বসুন না।

লোকটি মৃদু হেসে না বসেই শশাংকর দিকে তাকিয়ে বলল, সত্যি আপনাকে এখানে আমি এ সময়ে দেখতে পাবো আশাই করিনি মিঃ মিত্র, ভাবছিলাম কাল সকালেই কোন এক সময়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবো। কারণ ব্যাপারটা সত্যিই বিশেষ জরুরী। তা আপনার যখন দেখা পাওয়াই গেল দৈবক্রমে এখানে, তখন—

কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক আড়চোখে সুব্রতর দিকে একবার তাকাল।

শশাংক জবাবে বললে, সত্যি আমি দুঃখিত। হ্যাঁ মিঃ রায়, ইনি শ্রীযুক্ত অরিন্দম সরকার। আর ইনি মিঃ সরকার, আমার বিশেষ পরিচিত বন্ধু মিঃ সুব্রত রায়। এর সামনে আপনার কোন সংকোচেরই কারণ নেই মিঃ সরকার। আপনার যা বলবার এঁর সামনেই সব কথা বলতে পারেন।

শশাংকর কথায় মিঃ সরকার যেন বেশ একটু থমকেই যান। কিন্তু অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে নিজের সে সংকোচটুকু কাটিয়ে মৃদু হেসে বললেন, ও তাই নাকি। বেশ, বেশ। তবে শুনুন মিঃ মিত্র, একটা ভয়ংকর দুঃসংবাদ আছে। সন্ধ্যার দিকে আজকের টেলিগ্রাম পড়েছেন কী? 'ক্রিশ্চানা' জাহাজটা শত্রুরা ডুবিয়ে দিয়েছে পথেই!

সংবাদটা শুনে মিঃ মিত্র উপরের দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা জোরে চেপে ধরলে এবং সুব্রত

BanglaBook.org

দেখতে পেল ঐ সঙ্গে একটা হাত দিয়ে শশাংক তার চেয়ারের হাতলটা জোরে চেপে ধরেছে।

আর আপনি বোধ হয় জানেন মিঃ মিত্র যে, ডাঃ মিত্রর এটর্নী দিগেন সান্যালও ঐ জাহাজে আসছিলেন? আবার কথা বলেন অরিন্দম সরকার।

॥ ৩ ॥

অরিন্দম সরকার কথাগুলো বলে শ্যেন দৃষ্টিতে যেন তাকিয়ে শশাংকর মনোভাবটা বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

তাই বলছিলাম মিঃ মিত্র, আমাদের এই চরম বিপদের সময়ে আমাদের উভয়ের স্বার্থই যখন এক তখন—বলতে বলতে আর একবার আড়চোখে সুব্রতর দিকে তাকিয়ে মিঃ সরকার এ্যাস্ট্রের উপরে সিগারের ডগাটা একটু ঠুকে নিলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন, উভয়তঃ আমাদের স্বার্থ বা ইন্টারেস্ট যখন একই! এবং ঘটনাচক্রে মিঃ সান্যালের এ ব্যাপারে সাহায্য করার সম্ভাবনা যখন সুদূরপরাহত মনে হচ্ছে, তখন আমাদের দু'জনের মিলেমিশে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করাই উচিত। বলতে বলতে আবার মিঃ সরকার সুব্রতর দিকে দীর্ঘ একটা বাঁকা চাউনি নিক্ষেপ করলেন। এবং এবার সুব্রতকেই লক্ষ্য করে যেন বলতে লাগলেন, এ কথাটা আমি আগে আর একবার সকালে মিঃ মিত্রকে বলেছি মিঃ রায়। আশা করি মিঃ মিত্রর কাছ হতে সে কথা আপনি শুনেছেনও, এ ব্যাপারে আপনার কী মত মিঃ রায়?

সুব্রত যেন সবই জানে এইভাবে ওর কথা শুনতে থাকে আর অন্য দিকে শশাংকর নীরব স্থির দৃষ্টি হতে যেন একটা ভাষাহীন মিনতি জানাতে থাকে। সুব্রত যেন কি ভাবল একটু এমনি ভঙ্গি করে মাথা হেলিয়ে যথাসাধ্য গভীর স্বরে বললে, ব্যাপারটার মীমাংসা এত সহজেই কী হতে পারে মিঃ সরকার, আগাগোড়া ভেবে ভাল করে বিবেচনা করে দেখা দরকার সর্বাগ্রে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবার স্বপক্ষে আপনারই বা যুক্তি কী?

অসহিষ্ণু ভাবে মিঃ সরকার জবাব দিলেন, আমি ধরেই নিচ্ছি আপনি সবই জানেন। এবং এ ব্যাপারের গুরুত্বও আপনি উপলব্ধি করতে পারছেন। এক্ষেত্রে অবশ্যি মিঃ মিত্রের আমাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করা না-করা সম্পূর্ণ ওঁর ইচ্ছাধীন। তবু এতদিন পর্যন্ত উনি মিঃ সান্যালের উপরেই নির্ভর করছিলেন। সিঙ্গাপুর হতে ফিরবার পথে 'ক্রিশ্চানা' জাহাজ ডুবে যাওয়ায় মিঃ সান্যালের মৃত্যু ঘটেছে অবধারিত, এবং যদি ভগবান করুন জলে ডুবে তাঁর মৃত্যু নাও ঘটে থাকে, আবার কবে যে তিনি কলকাতায় ফিরে আসবেন, এবং আবার কবে যে মিঃ মিত্রকে তিনি সাহায্য করতে পারবেন তারও স্থিরতা কিছু নেই। অথচ এ কথাও সত্যি যে, আমি জানি আমরা যে কাজে হাত দিয়েছি, সেটাকে নষ্ট করে দেবার জন্য শহরের একদল অতীব দুর্ধর্ষ লোক উঠে পড়ে লেগেছে। আর মিঃ মিত্র সে কথা বেশ ভাল ভাবেই জানেন। অরিন্দম সরকারের কথাগুলি যেন সুব্রতকে বেশ একটু চঞ্চল করে তোলে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়েই মিঃ মিত্রর রহস্যের সঙ্গে যেন ক্রমেই সে জড়িয়ে পড়েছে এবং ঘটনার ধারা দেখে তার স্পষ্টই মনে হচ্ছে, কিছু একটা গভীর ও জটিল রহস্যের সঙ্গে শশাংক মিত্র জড়িয়ে পড়েছে। যদিও সামান্য ঘটনা ও কথার উপরে নির্ভর করে সমস্ত রহস্যটার গুরুত্ব নির্ণয় করা বর্তমানে তার পক্ষে দুঃসাধ্য, তথাপি সুব্রত তখনও ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি ঘটনার সত্যিকারের গুরুত্ব সঠিক কতখানি।

BanglaBook.org

মিঃ সরকার বলছিলেন, আর পুলিস যদি ঘুণাক্ষরে একবার এ ব্যাপারের অনুসন্ধান পায়, সত্যি সত্যি ব্যাপারটা তাহলে রীতিমত গুরুতর হয়ে উঠবে না কি? হয়ত তখন আর বাঁচবার কোন উপায়ই থাকবে না আমাদের কারো।

মিঃ সরকার ! সহসা যেন শশাংক মিত্র মিঃ সরকারকে তাঁর অনর্গল কথার স্রোতে বাঁধ দিলেন।

সুব্রত যে ব্যাপারটা সবটা না হলেও কিছুটা বুঝতে পারছিল না তা নয়, তবু কিছু না বোঝার ভান করেই সে পূর্বের মত চুপ করে বসে রইলো।

হঠাৎ যেন নিজের বিস্মিত ভাবটাকে দূর করে শশাংক মিত্র বলে উঠল, আমিও অবিশ্যি খুব গুরুতর ব্যাপার ঘটলেও পশ্চাদ্‌পদ হবো না। হঠাৎ যদি কোন সঙ্গীন মুহূর্ত এসেই থাকে আমি তাকে face করবার জন্য প্রস্তুত এবং এও জানবেন একবার যখন মনে মনে স্থির করেছি তখন যতক্ষণ না আমি successfull হচ্ছি ততক্ষণ এ কলকাতা শহর আমি ছাড়ছি না। তাছাড়া বর্তমানে সব দিকই আমি ভাল করে ভেবে দেখেছি। আপনার সাহায্যের আমার এতটুকুও প্রয়োজন হবে বলে আমার মনে হচ্ছে না। সকালবেলা আজ আপনি আমাকে বলেছিলেন, কারও দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করে আমাকে সাহায্য করতে এসেছেন। কিন্তু জানতে পারি কি, কে আপনাকে আমার সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলেন?

মিঃ সরকার একটা চাপা হাসি হাসলেন। তারপর স্মিতভাবে বললেন—আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তিকে আমি প্রশংসা না করে আর থাকতে পারছি না মিঃ মিত্র। বয়সে আপনি ছেলেমানুষ হলেও ভেবে দেখবার ক্ষমতা সত্যিই দেখছি আপনার আছে। এবং দেখছি আপনি কেমন করে সাবধান হয়ে সব দিক বাঁচিয়ে চলতে হয় তা বেশ ভাল করেই জানেন। Well—আপনি জানতে চান কে আমাকে পাঠিয়েছেন বা অনুরোধ করেছেন আপনাকে সাহায্য করবার জন্য তাই না, আমাদেরই মিত্রপক্ষ! আর কে? যারা সিংগাপুরে ছিল।

কে, মিঃ সান্যাল কী?

মিঃ সান্যালই যে এমন কথা আমি বলতে চাই না মিঃ মিত্র, কিন্তু আমার একটা কথা বিশ্বাস করুন, মিঃ সান্যাল ছাড়াও এ ব্যাপারে আপনার কাকার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আরো অনেকেরই স্বার্থ আছে এবং তাদেরই একজন কেউ তবে—আপাততঃ নামটা তার উচ্চারণ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কিন্তু আমার নিজস্ব পারিবারিক ব্যাপারে একমাত্র সান্যাল ছাড়া আর কারও কোন স্বার্থ থাকতে পারে একথা আমি যতক্ষণ না মিঃ সান্যালের মুখে শুনছি, একেবারে বিশ্বাসই করতে পারছি না এবং আপনার প্রস্তাবও মেনে নিতে পারছি না। মিঃ মিত্র ধীর সংযত কণ্ঠে কথাগুলো একটানা যেন বলে গেলেন।

ওঃ! কিন্তু, এমন যদি সত্যিই হয়ে থাকে যে, জাহাজডুবির ফলে মিঃ সান্যাল সত্যিই চিরদিনের মত ভারত মহাসাগরের অতল জলরাশির তলে তলিয়ে থাকেন, তবে ভাল করে ভেবে আর একবার বিবেচনা করে কথা বলবেন মিঃ মিত্র, ছেলেমানুষি করবেন না। আপনার সহযোগিতার উপরে অনেকখানি আমাদের নির্ভর করছে। আর আপনিও যাদের আপনার শত্রু ভাবছেন তারা আমারও শত্রুই বলেই জানবেন, তাই বলছিলাম আপনি যদি আমার সঙ্গে হাতে হাত মিলান—

মিঃ সরকার! তীব্রভাবে বাধা দিয়ে মিঃ মিত্র বললেন, আমি তো আপনাকে বললাম আমি কারও সাহায্য চাই না, যা করবার আমি একাই করবো।

BanglaBook.org

তীব্র শ্লেষের স্বরে মিঃ সরকার জবাব দিলেন, মিঃ সুব্রত রায়ের সাহায্যও নয়? কী বলেন শশাংকবাবু?

কথাটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সুব্রতই ভীষণ রকম চমকে মিঃ সরকারের মুখের দিকে তাকাল।

কথাটা শেষ করেই কিন্তু অরিন্দম সরকারও তীব্রদৃষ্টিতে সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সুব্রতও পাল্টা দৃষ্টিতে সরকারের চোখের সঙ্গে চোখ মিলাল।

মিঃ সরকারের দৃষ্টিতে যেন একটা উদ্ধত যুদ্ধ আহ্বান!

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল, কারও মুখেই কোন কথা নেই। সুব্রত এ ব্যাপারে তার কতটুকু স্থান তাই মনে মনে যাচাই করে দেখছিল। এও সে বুঝতে পারছিল এতটুকু ভুল করলেই মিঃ সরকারের মত অতি ধূর্ত লোক মুহূর্তেই ধরে ফেলতে পারবে আসল ব্যাপারটা যে, সুব্রত এখনো কিছু বুঝতে পারেনি। কিন্তু মুখ বুজে চুপচাপ বসে রইল। মিঃ সরকার তখনও তার দিকে তাকিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে। তার সমস্ত মনটা যেন সেই চোখের দৃষ্টির উপরে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে।

সহসা এক সময় আবার মিঃ সরকার বললেন, সুব্রতবাবুরই বা এ ব্যাপারে স্বার্থ কী জানতে পারি কি?

আপনিই জিজ্ঞেস করুন না ওঁকে স্বার্থ কী ওঁর? মিঃ মিত্র জবাব দিলেন।

স্বার্থ! তা কিছু একটা আছে বৈকি। সুব্রতই এবার জবাব দিল আর চুপ করে থাকা উচিত হবে না ভেবে।

হুঁ! তাহলে এই আপনার শেষ কথা শশাংকবাবু? আপনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না?

বললাম তো আপনাকে, আমি কারও সাহায্যই চাই না মিঃ সরকার।

সহসা টেবিলের উপরে একটা মৃদু মুষ্ট্যাঘাত করে, চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে অরিন্দম সরকার জবাব দিলে, বেশ, তবে তাই হোক। কিন্তু এর ফলাফলও ভাল হবে না জানবেন। কিন্তু তখন আর হাজার অনুশোচনায়ও কোন কাজই হবে না। এবং আশা করি এ কথাটা তখন মনে থাকবে আপনার।

কথাগুলো বলে আর দাঁড়াল না মিঃ সরকার, ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

অরিন্দম সরকার ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন হঠাৎ সুব্রত উঠে পড়ে বললে, একটু বসুন মিঃ মিত্র, আমি এখুনি আসছি।

সুব্রত তড়িৎপদে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ থেকে সুব্রত কেবলই ভাবছিল অরিন্দম সরকার তাকে চিনতে পেরেছে। অথচ হাজার চিন্তা করেও সে কিছুতেই অরিন্দম সরকারকে কোথায়ও দেখেছে কিনা মনে করতে পারছিল না, সম্পূর্ণ যেন অপরিচিত। এবং অরিন্দম সরকারের শেষের কথাগুলি মিঃ মিত্রকে লক্ষ্য করে বলা হলেও, কথাগুলি যে পরোক্ষে তারই প্রতি সাবধান-বাণী এ কথাটাও তার বুঝতে এতটুকুও কষ্ট হয়নি। সুব্রত তাই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে মিঃ সরকার তখন নেমে যাচ্ছে। সিঁড়িতে একটা কালো ঘের-টোপ দেওয়া স্বল্প পাওয়ারের বিদ্যুৎ বাতির আলোয় সমস্ত সিঁড়ি-পথটা মৃদু আলোছায়ায় যেন রহস্যঘন মনে হয়।

সুব্রত পিছন থেকে ডাকলে, মিঃ সরকার, একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে!

সুব্রতর আহ্বানে মিঃ সরকার ফিরে দাঁড়ায়। দুজনের মধ্যে ব্যবধান মাত্র চার-পাঁচটি সিঁড়ি।

BanglaBook.org

ঢাকনি দেওয়া আলোটার ঠিক নীচেই দাঁড়িয়ে অরিন্দম সরকার। তার দীর্ঘ দেহের উপরে আলোর একটা চোরা রশ্মি এসে তির্যকগতিতে পড়েছে। মিঃ সরকারের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি যেন সুব্রতকে ভেদ করে ফেলতে চায়।

আপনার সতর্কবাণীগুলোর জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি, মিঃ সরকার।

সত্যি! ব্যঙ্গ মিশ্রিত একটা বাঁকা হাসির রেখা অরিন্দম সরকারের ওষ্ঠপ্রান্তে মুহূর্তের জন্য জেগে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল।

হ্যাঁ, সুব্রত রায়কে আপনি ঠিক চেনেন না নচেৎ তার প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করবার আগে হয়ত একবার ভাবতেন।

চিনি বই কি সুব্রত রায়কে। মিঃ সরকার শ্লেষ-ভরা কণ্ঠে জবাব দেয়।

চেনেন নামটাকে, কিন্তু মানুষটাকে হয়ত এখনো পুরোপুরি চিনতে পারেননি।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ—আচ্ছা Good night! আশা করি বুঝবার সুযোগ খুব শীঘ্রই আপনার মিলবে একদিন মিঃ সরকার।

প্রতীক্ষায় থাকবো। তীক্ষ্ণ একটা ব্যঙ্গের সুর যেন মিঃ সরকারের কণ্ঠস্বর হতে ঝরে পড়ে। কথাটা বলেই দু'তিন লাফে বাকি সিঁড়ি কটা একপ্রকার টপকেই মিঃ অরিন্দম সরকার রাস্তার অন্ধকারে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুব্রত ফিরে এসে দেখলে শশাংক চুপটি করে একা-একা চেয়ারের উপরে বসে আছে নিঝুম হয়ে।

চলুন শশাংকবাবু, রাত্রি অনেক হলো, এবারে ফেরা যাক।

চলুন।

শশাংক শ্লথ-ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল।

॥ ৪ ॥

গাড়ি কলেজ স্ট্রীট দিয়ে চলেছে।

সুব্রত ইচ্ছা করেই অন্য পথে এবার এসেছে।

মিঃ সরকারের একটা কথা কিছুতেই সুব্রত ভুলতে পারছিল না ঃ এ-কথাও আমি জানি, আমরা যে কাজে হাত দিয়েছি, সেটাকে নষ্ট করে দেবার জন্য শহরের একদল অতীব দুর্ধর্ষ লোক উঠে পড়ে লেগেছে। কথাটা যেন শোনা অবধি সুব্রতর মনের মধ্যে তোলপাড় করে ফিরছিল। কথাটা যেন কিছুতেই সে ভুলতে পারছে না।

অরিন্দম সরকার কি ইচ্ছা করেই সুব্রতকে ভয় দেখাবার জন্য কথাগুলো বলে গেল? কিংবা এমনও তো হতে পারে তাদের দুজনকেই ভয় দেখাবার জন্যই এই কথাগুলি অরিন্দম সরকার বলেছে? কিন্তু শশাংকর হাবভাব দেখে তখন যেন স্পষ্টই মনে হলো অরিন্দম সরকারের কথায় শশাংক এতটুকু বিচলিতও হয়নি। অতি সহজভাবেই কথাগুলি সে গ্রহণ করেছে। তারপর পুলিসের সংস্রবে আসতে অরিন্দম সরকারের আপত্তি। কিন্তু শশাংক তো প্রথমে সাহায্যের আশায় সুব্রতর কাছেই ছুটে এসেছিল। সুব্রতও তো এককালে পুলিশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। তবে? আগাগোড়া সবকিছুই যে সুব্রতর কাছে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ এক সময়ে সুব্রত অন্ধকারে

BanglaBook.org

পার্শ্বে উপবিষ্ট শশাংকর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, মিঃ মিত্র, আপনার ঐ অরিন্দম সরকারের কথা শুনে কী মনে হচ্ছিল, জানেন? আপনি যে আপনাদের গোপনীয় ব্যাপারে আমার সাহায্যপ্রার্থী হয়েছেন, অরিন্দম সরকার যেন কিছুতেই সেটাকে সহ্য করতে পারছে না। অবিশ্যি একটা জিনিস ভাল হলো ও জেনে গেল যে, আপনি আমার সাহায্যপ্রার্থীই হয়েছেন।

শশাংক জবাব দিল, সত্যি, আপনি যে ভাবে আগাগোড়া ব্যাপারটা বাঁচিয়ে দিয়েছেন, সে জন্য কী বলে যে ধন্যবাদ দেবো আপনাকে জানি না। সে সময়টা অরিন্দম সরকারকে দেখে আমি সত্যিই হঠাৎ যেন একটু কেমন হক্‌চকিয়েই গিয়েছিলাম। এখন বোধ হয় আপনি বুঝতে পারছেন, তাকে আমার জানতে দেওয়ার মোটেই ইচ্ছা ছিল না ব্যাপারটা, কেন না সে জানে কলকাতার শহরে আমাকে সাহায্য করার মত সত্যিই কোন বন্ধু নেই।

কিন্তু সত্যিই কি কলকাতা শহরে আপনার কোন বন্ধু নেই মিঃ মিত্র?

সুব্রতর প্রশ্নের সঠিক জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে শশাংক বললে, সুব্রতবাবু! আমি জানি আপনি পুলিসের চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। আপনার সঙ্গে পুলিসের আজ আর কোন সম্পর্কই নেই! তা না হলে আজ আপনার কাছে মোটে আসতামই না। আমি চাই না পুলিসের লোক আমার এ ব্যাপারের মধ্যে আসে। কোন একটা বিশেষ কারণেই পুলিসকে এড়িয়ে চলা আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু আপনার কাছে আসবার পরেই একটা কথা আমার মনে হলো, আমার এ বিপদের মধ্যে আপনাকে জড়ানো হয়ত সত্যিই উচিত হবে না, পুলিসকে যখন আমি সাহায্যের জন্য ডাকতেই পারবো না, মিথ্যে কেন আপনাকে আমার এ বিপদের সঙ্গে জড়াব! আমার এ বিপদ যে কত জটিল সে কথা হয়ত আপনার চিন্তারও অতীত।

আমার জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না মিঃ মিত্র। আমি ভাবছিলাম অবিশ্যি আপনার যদি কোন ব্যক্তিগত আপত্তি থাকে তবে সে অন্য কথা। আমার সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন।

কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে কাগজের হকাররা চীৎকার করছিল ঃ টেলিগ্রাফ বাবু—টেলিগ্রাফ! টাট্‌কা তাজা ভীষণ খবর! ভারত মহাসাগরে ক্রিশ্চানা জাহাজডুবি!

রাস্তায় তখন বেশী লোকজন নেই। সুব্রত ব্রেক করে গাড়ি থামায়। চার পয়সা দিয়ে মিঃ মিত্র একটা কাগজ কিনল।

শত্রুপক্ষের ডুবো জাহাজের আক্রমণে যাত্রীবাহী জাহাজ 'ক্রিশ্চানা' ডুবে গেছে। ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত দীগেন সান্যাল ঐ জাহাজেই সিংগাপুর থেকে অন্যান্য ইভাকুইদের সঙ্গে কলকাতায় ফিরছিলেন, তিনিও অন্যান্য সহযাত্রীদের সঙ্গে সলিল সমাধি লাভ করেছেন।

জাহাজডুবির বৃত্তান্ত পড়তে পড়তে কাগজের এক জায়গায় একটা বোল্ড টাইপের হেডিংয়ের দিকে দৃষ্টি পড়ায় সহসা শশাংক মিত্র যে চকিত হয়ে ওঠে। গাড়ির ড্যাস্ বোর্ডের স্তিমিত আলোয় লেখাটার দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে ঝুঁকে পড়ে।

সুব্রতর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিকে কিন্তু শশাংক ফাঁকি দিতে পারে নি।

গাড়ি ততক্ষণ আবার চলতে শুরু করেছে।

শশাংক একাগ্রমনে লেখাটা পড়তে শুরু করে। জাহাজডুবির সংবাদ নিয়ে যখন S.O.S. চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে; সেই সময় অদ্ভুত একটা সংবাদ S.O.S. -এ পাওয়া যায়। ACE OF SPADES—ইস্কাবনের টেক্কা। যাঁরা সংবাদটি ধরেছে তাঁরা কেউ বুঝতে পারেননি—এ সংবাদটার অর্থ কি?

BanglaBook.org

শশাংকর মনের পাতায় ঈষৎ বিদ্যুতস্ফুরণের মতই ঐ কথা কয়টি তখন বার বার জেগে উঠেছে।

ইস্কাবনের টেক্কা! ইস্কাবনের টেক্কা!...

শশাংক যেন ঘন অন্ধকারে সহসা আলোর একটা রশ্মি দেখতে পেয়েছে।

গাড়ি এসে আমহার্স্ট স্ট্রীটে সুব্রতর বাড়ির সামনে দাঁড়ায়।

চলুন মিঃ মিত্র, আজকের রাত্রিটা আমার বাড়িতেই থাকবেন চলুন।

বেশ চলুন। অন্যমনস্ক ভাবেই শশাংক জবাব দেয়।

* * *

সুব্রত তার পাশের ঘরেই শশাংকর শয়নের ব্যবস্থা করে দেয়। শুভ-রাত্রি জানিয়ে শশাংক পাশের ঘরে গিয়ে খিল দিল। সুব্রতও নিজের শয়নকক্ষে এসে প্রবেশ করল।

অনেকগুলো এলোমেলো চিন্তা তার মাথার মধ্যে ধোঁয়ার মত অস্পষ্টভাবে পাক খেয়ে খেয়ে ফিরছে তখন।

শশাংক কাগজখানা সুব্রতর ঘরেই ফেলে গিয়েছিল। সন্তর্পণে কাগজখানা সুব্রত চোখের সামনে তুলে ধরল। কী এমন সংবাদ শশাংক এটার মধ্যে পেল যাতে করে সে হঠাৎ এত চিন্তান্বিত হয়ে উঠলো!

জাহাজডুবির সংবাদ নিয়ে স্পেশাল বেরিয়েছে।

সুব্রত তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে কাগজটা পড়তে শুরু করল।

কাগজটার মাঝামাঝি জায়গায় একটা স্কোয়ারের মধ্যে ছোট্ট একটি সংবাদ ঃ জাহাজডুবির সংবাদ নিয়ে যখন S.O.S. চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে; সেই সময় অদ্ভুত একটা সংবাদ S.O.S.-এ পাওয়া যায়।

ACE OF SPADES—ইস্কাবনের টেক্কা!

রাত অনেক হয়েছে। সুইচ্ টিপে ঘরের আলোটা সুব্রত নিবিয়ে দিল।

নিশ্চিদ্র আঁধারে ঘরটা যেন সহসা স্তব্ধ হয়ে যায়।

সুব্রত খোলা জানালাটার পাশে এসে দাঁড়াল।

শীতের স্তব্ধ রাত্রি অস্পষ্ট কুয়াশার ওড়না গায়ে জড়িয়ে যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে।

ইস্কাবনের টেক্কা! ইস্কাবনের টেক্কা! কথাগুলো যেন সুব্রতর মনের মধ্যে মাকড়সার মত জাল বুনে চলে। কোথায় যেন রহস্যের একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত! রাত্রি এখন ক'টা হবে? অন্ধকারে রেডিয়াম দেওয়া হাতঘড়ির ডায়েলটার দিকে সুব্রত তাকায় ঃ রাত্রি এগারটা বেজে চল্লিশ মিনিট।

জনহীন রাস্তার উপরে একটা শূন্য ট্যাক্সি শব্দের তরঙ্গ তুলে মিলিয়ে যায়। নিঃশব্দতার সমুদ্রে যেন একটা ঢেউয়ের শব্দ।

একটা অস্পষ্ট খস্‌খস শব্দ। সুব্রতর শ্রবণশক্তি উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে যেন কে সতর্ক পায়ে চলে বেড়াচ্ছে।

কোথা থেকে শব্দটা আসছে?

পাশের ঘর থেকেই না? হ্যাঁ, পাশের ঘর থেকেই তো বলে মনে হয়।

সুব্রত নিঃশব্দে দরজা খুলে অন্ধকারে খোলা বারান্দাটার দিকে দৃষ্টিপাত করে।

সুব্রতর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যেন শিকারী বিড়ালের সতর্ক অনুসন্ধিৎসা। অতি সন্তর্পণে পা টিপে নিঃশব্দে কে ওই বারান্দা দিয়ে অন্ধকারে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে! কে ও?

BanglaBook.org

॥ ৫ ॥

অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির মত কে ওই নীচের সিঁড়ির দিকে এগুচ্ছে? সহসা বিদ্যুৎ ঝলকের মত একটা সন্দেহ সুব্রতর মনে উঁকি দিয়ে যায়। শশাংকবাবু নয় তো?

সুব্রত চট্ করে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে পিস্তল ও পেন্‌সিল টর্চটা নিয়ে বেরিয়ে আসে।

পাশের ঘরের দরজাটা খোলা হাঁ হাঁ করছে। সুব্রত বোতাম টিপে সন্তর্পণে টর্চটা জ্বালাল। শূন্য ঘর—জনপ্রাণীও সেখানে নেই। সুব্রত আর মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত সতর্ক পদে নীচে নেমে গেল কারণ সে বুঝতে পেরেছিল যে ছায়ামূর্তি আর কেউ নয়—শশাংকই।

সদর দরজাটাও খোলা হাঁ-হাঁ করছে! সুব্রতও দ্রুত পদে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

একটা দীর্ঘ অজগর সাপের মতই আমহার্স্ট স্ট্রীট্‌টা রাতের অন্ধকারে যেন গা এলিয়ে পড়ে আছে।

তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সুব্রত চকিতে রাস্তার এদিক-ওদিক দেখে নিল। ওই তো দ্রুত পায়ে কে যেন রাস্তা ধরে এগুচ্ছে না? সুব্রতও দ্রুত পায়ে অগ্রবর্তী মূর্তিকে অনুসরণ করে চলে।

এবং একটু এগিয়েই চিনতে পারে—সে আর কেউ নয় শশাংকই। সুব্রত দেখতে পায় শশাংক তার ঠিক উল্টো দিকে 'স্মৃতিকুটিরে'র গেট ঠেলে বাড়ির মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করেছে। সুব্রত দূর থেকে তাকে অনুসরণ করে। বাড়ির বাইরে কমপাউণ্ডে গ্যারাজ—শশাংক গ্যারাজ খুলে ভিতরে প্রবেশ করল এবং একটু পরেই একটা মোটর ইন্‌জিনের অস্পষ্ট ঘর-র-র শব্দ শুনতে পেল।

চার পাঁচ সেকেণ্ড সুব্রত কী যেন ভাবলে, পরক্ষণেই এক প্রকার ছুটতে ছুটতেই নিজের বাড়িতে গিয়ে চটপট্ নিজের গ্যারাজ থেকে গাড়িটা বের করে রাস্তায় এসে পড়ল।

গাড়ি নিয়ে রাস্তায় খানিকটা এগুতেই ও লক্ষ্য করলে, ওই দূরে গাড়ির একটা লাল টেল লাইট ছুটে চলেছে—গাড়ির নম্বরটা পরিচিত।

সুব্রত অগ্রবর্তী টেল্ লাইটটার প্রতি লক্ষ্য রেখে গাড়ি ছুটাল।

অগ্রবর্তী গাড়িটা তখন সুকিয়া স্ট্রীট ধরে সারকুলার রোড়ের দিকে ছুটছে। পরিমিত ব্যবধান রেখে সুব্রত অগ্রবর্তী গাড়িটাকে অনুসরণ করতে লাগল।

আগের গাড়িটা সোজা নারকেলডাঙ্গা মেন রোডের দিকে চলেছে। নারকেলডাঙ্গা রেলওয়ে ব্রীজটা পার হয়ে গাড়িটা ডান দিকের রাস্তায় মোড় নিল।

রাস্তাটা অপরিসর—আবর্জনায় পূর্ণ। দু'পাশে নানা আকারের বাড়ি। রাস্তার দু'পাশে অনেকখানি দূরে দূরে ঢাকনি দেওয়া মিউনিসিপ্যালিটির কেরোসিনের টিমটিমে বাতিগুলি যেন পিটপিট করে চেয়ে আছে ব্ল্যাকআউটের রাত্রে রাত-জাগা সতর্ক প্রহরীর মত।

সুব্রত আগের গাড়িটার সঙ্গে নিজের গাড়ির দূরত্ব ইচ্ছা করেই আর একটু বাড়িয়ে দিল। অগ্রগামী গাড়িটা একটু পরে একটা বড় বাগানওয়ালা বাড়ির লোহার গেটের অনতিদূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

সুব্রতও নিজের গাড়ির ব্রেক কষল।

অগ্রগামী গাড়ির অস্পষ্ট হেড লাইটটা ততক্ষণে নিবে গেছে।

গেটের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে, সুরকী ঢালা সরু রাস্তা ধরে জুতোর মচ্ মচ্ শব্দ করে অগ্রবর্তী শশাংক আপন মনে এগিয়ে চলেছে। বাড়িটা তিনতলা। খুব বেশী দিনকার পুরনো বাড়ি বলেও মনে হয় না।

BanglaBook.org

শীতরাত্রের কুহেলিকার অবগুণ্ঠন-তলে মরা-চাঁদের আলো জেগেছে। ফ্যাকাশে বোবা।

বাড়িটার সমস্ত দরজা বন্ধ—চতুর্দিক নিস্তব্ধ—নিঝুম। বাড়িটার রঙ বোধ হয় হলদে, চাঁদের আলোয় কেমন যেন ফ্যাকাশে মনে হয়। চারিপাশে ছোটবড় নানা জাতীয় দেশী বিলাতী ফুল ও পাতাবাহারের গাছ। রাস্তার দু'পাশে মেহেদীর বেড়া অযত্নে বর্ধিত। সেই মেহেদীর বেড়ার আড়ালে আড়ালে আত্মগোপন করে, সতর্ক পদসঞ্চারে সুব্রত শিকারী বিড়ালের মতই নিঃশব্দে এগোতে লাগল। পায়ে তার কোন জুতো নেই। স্লিপার জোড়া গাড়ির মধ্যেই খুলে রেখে এসেছিল।

অগ্রগামী শশাংককেও চিনতে পেরেছিল সুব্রত। সামনের দরজা দিয়ে বাড়িতে না প্রবেশ করে বাড়িটার দক্ষিণ কোণে একটা ছোট দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। এবং পকেট থেকে একটা চাবি বের করে হস্তস্থিত টর্চ-বাতি জ্বালিয়ে নিঃশব্দে সেই দরজার কড়ার সঙ্গে লাগানো তালাটা খুলে ফেলে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল। দরজাটা সঙ্গে সঙ্গে আবার বন্ধ হয়ে গেল। মিনিটখানেক অপেক্ষা করে সুব্রত বন্ধ দরজার পাশে এসে মৃদু ধাক্কা দিল দরজার গায়ে।

দরজাটা শুধু ভেজানই ছিল, ভিতর থেকে বন্ধ করা হয়নি। ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল।

নিশ্চিদ্র আঁধারে চোখের দৃষ্টি যেন অন্ধ হয়ে যায়।

একটা মাঝারি গোছের সিঁড়ি-ঘর। সামনে একটা সিঁড়ি দেখা যায়। সন্তর্পণে সুব্রত পেন্‌সিল টর্চটা জ্বেলে সিঁড়ি-ঘরের চারিপাশ একবার দেখে নিল। তারপর অন্ধকারে নিঃশব্দে সিঁড়ির উপরে গিয়ে দাঁড়াল।

সিঁড়িগুলো অতিক্রম করে অন্ধকারে সুব্রত যেখানে এসে দাঁড়াল—দোতলার একটা টানা লম্বা বারান্দা সেটা। ম্লান চাঁদের আলো বারান্দাটার উপরে এসে লুটিয়ে পড়ে যেন কী এক ভৌতিক বিভীষিকায় থম্ থম্ করছে।

খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সুব্রত কী যেন ভেবে নিল; তারপর সতর্কভাবে বারান্দাটার সামনের দিকে তাকাতে তাকাতে এগুতে লাগল নিঃশব্দে।

হঠাৎ এমন সময় সুব্রতর ঠিক হাত দুই-তিন দূরে একটা আলোর রশ্মি এসে বারান্দার উপরে লুটিয়ে পড়ল। সামনেই একটা আলো জ্বালানো হয়েছে বোধ হয়। তারই খোলা দরজাপথে বারান্দায় এসে পড়েছে আলোর একটা রশ্মি। সুব্রত থম্‌কে দাঁড়ায়—এবং কিছুক্ষণ পরে আবার সেই দিকে এগিয়ে যায়।

সুব্রত নিঃশব্দে এসে খোলা দরজার একপাশে দাঁড়াল। বেশ বড় আকারের একখানি ঘর। ঘরটা লাইব্রেরী ঘর বলেই মনে হয়। কারণ ঘরের মধ্যে চারিপাশে বড় বড় কাঠের স্টীলের র‍্যাক এবং আলমারি। সেই আলমারি ও র‍্যাকগুলোর থাকে থাকে সব নানা আকারের বই সাজানো।

ঘরের দক্ষিণ কোণে প্রকাণ্ড স্টীলের দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা একটা আলমারি, প্রায় মানুষের সমান সাইজের। সেই আলমারির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শশাংক আলমারিটার গা-তালাটা তখন গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করছে।

এত রাত্রে একাকী চোরের মত এই জনমানবহীন বাড়ির নির্জন লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে আলমারিটার সামনে দাঁড়িয়ে কেন শশাংক? ওর মতলব কি? কেন ও এখানে এসেছে এই রাত্রে?

নানা প্রকার সন্দেহ সুব্রতর মনের মধ্যে চারিপাশ হতে এসে উঁকি দেয় শশাংককে ঘিরে। তবে কি শশাংক কোন মন্দ অভিপ্রায়ে এই নির্জন বাড়িতে এসে এত রাত্রে ঢুকেছে চোরের মত?

এ বাড়িটাই বা কার? কী করছে ও ঐ স্টীলের আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে? কী আছে ঐ

BanglaBook.org

প্রকাণ্ড আলমারিতে? আপন মনেই শশাংক বিড় বিড় করে কী যেন বলে ওঠে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা একপাশে সরে গেল এবং তারপরই আর একটা দরজা দেখা গেল। তার গায়ে একটা ফ্ল্যাট তালা লাগানো। হাত দিয়ে তালাটা নাড়াচাড়া করতেই হঠাৎ দ্বিতীয় দরজা দুটোও সরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল ভিতরে একটি গুপ্ত কামরা। ক্ষণমাত্রও দেরি বা ইতস্তত না করে নিঃশব্দে শশাংক হাতের টর্চটা জ্বেলে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সেই গুপ্ত কামরার মধ্যে যেন কি খুঁজতে লাগল অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে।

সুব্রত ততক্ষণে পায়ে পায়ে সেই প্রথম আলমারির খোলা কবাটের একপাশে এসে দাঁড়ায়।

ইতিমধ্যে সেই গুপ্ত কামরার ভিতর থেকে একটা বড় শীলমোহর করা লেপাফা বের করে শশাংক যেই গুপ্ত কামরার দরজাটা এঁটে দিয়ে গা-তালাটা লাগিয়েছে অমনি পিছন থেকে সুব্রতর ডাক শুনে চম্‌কে ফিরে দাঁড়াল।

শশাংকবাবু? সুব্রত ডাকল।

নির্জন পথে আনমনা চলতে চলতে হঠাৎ সামনে ভয়ংকর বিষধর সাপ দেখলে মানুষ যেমন চমকে ওঠে, চোখে মুখে একটা ভীত বোবা চাউনি জেগে ওঠে, শশাংকর মুখেও ঠিক তেমনি বোবা চাউনি ফুটে ওঠে।

এই জন্যই বুঝি আপনার আমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে না বলেছিলেন? রূঢ় কঠিন স্বরে সুব্রত প্রশ্ন করে।

শশাংক মিত্র যেন বোবা হয়ে গিয়েছে। একেবারে চুপ।

সুব্রত তখনও বলে চলেছে, চমৎকার অভিনয় করতে শিখেছেন তো এই বয়সে। কবে থেকে এই লাইনে পা দিয়েছেন? ছিঃ ছিঃ!...

এটা, মানে এটা আমার কাকার বাড়ি। আমার কাকার নাম নিশ্চয়ই আপনি শুনে থাকবেন, বৈজ্ঞানিক ডাঃ অজয় মিত্র—এটা তারই বাড়ি। আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন!...আমার সব কথা শুনলে....

এর পরও আর কিছু শুনবার প্রয়োজন আছে কি মিঃ মিত্র? সুব্রতর কণ্ঠস্বরে একটা চাপা ধিক্কার যেন ফুটে ওঠে, বলছেন আপনার কাকার বাড়ি! কিন্তু আপনার কাকার বাড়ি যদি হবে তো এভাবে রাত্রে চোরের মত—সুব্রতর কথাটা শেষ হলো না, হঠাৎ এমন সময় হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে শশাংক ঘরের আলোটা দিল নিবিয়ে। মুহূর্তে নিশ্চিদ্র আঁধারে যেন সব কিছু গ্রাস করলে।

সুব্রত চম্‌কে উঠল, ও কি, আলো নেবালেন কেন?...

চুপ। আস্তে...কার পায়ের শব্দ যেন। চাপা গলায় শশাংক সতর্কবাণী উচ্চারণ করে...।

সুব্রতর শ্রবণেন্দ্রিয়ও সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে ওঠে। সত্যিই একটা অস্পষ্ট সতর্ক পায়ের শব্দ। এবং সে শব্দ ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। এদিকেই আসছে সেই পায়ের শব্দ।

BanglaBook.org

॥ ৬ ॥

অন্ধকারের মধ্যে শশাংকর গলা আবার শোনা গেল, চাপা মিনতি-ভরা কণ্ঠে শশাংক বললে, আমি আপনাকে সব খুলে বলব মিঃ রায়, কিন্তু Please এখন নয়। তারাও নিশ্চয়ই এসে পড়েছে বলেই মনে হচ্ছে। এখুনি এখান থেকে যেমন করে হোক ওদের ফাঁকি দিয়ে আমাদের পালাতে হবে। এ

বাড়ির মধ্যে দু'তিনটে গুপ্ত দ্বার আছে, ওরা সম্ভবতঃ কেউ তা জানে না। আসুন আমার পিছনে পিছনে।...বলতে বলতে শশাংক অন্ধকারেই ঘরের অন্য দ্বারের দিকে এগিয়ে যায়।

আর আন্দাজে নির্ভর করে সুব্রতও তাকে অনুসরণ করে কতকটা যেন অন্ধর মতই।

এগিয়ে চলেছে সুব্রত অন্ধকারেই। একটা টানা বারান্দা মত। সেটা ধরে কিছুদূর এগুতেই সামনে নিরেট একটা দেওয়াল ওদের গতিরোধ করে দাঁড়ায়।

মৃদু একটা শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শশাংকর হাতের টর্চ-বাতি জ্বলে ওঠে এবং সেই আলোয় একটি অপ্রশস্ত সরু পথ চোখে পড়ে সুব্রতর। শশাংক আলো হাতে সেই পথ ধরেই এগুতে থাকে এবং সুব্রত শশাংককে অনুসরণ করে সেই পথে গিয়ে প্রবেশ করে।

ওদের পশ্চাতে সেই অপ্রশস্ত সরু গুপ্ত পথের দরজাটা বন্ধ হয়ে যায় আপনা থেকেই যেন।

আসুন! শশাংক আহ্বান জানায়, এই পথ দিয়ে তিনতলায় যাওয়া যায় এবং তিনতলায় ঘরের মেঝেতে একটা জানালার মত লোহার শিক দেওয়া চৌকো জায়গা আছে, তার ভিতর দিয়ে এ ঘরের সব কিছু দেখা যায়।

আবার ওরা এগিয়ে চলে। এবং সেই সরু পথটা যেখানে শেষ হয়েছে, তার সামনেই একটা সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে শশাংক উপরে উঠতে শুরু করে। সুব্রত আগের মতই তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে।

সিঁড়ির শেষে আবার একটা দরজা। দরজার পাশে একটা বোতাম টিপতেই দরজাটা যায় খুলে। এবারে তারা দু'জনে এসে প্রবেশ করে মাঝারি গোছের একটা খালি ঘরে। ঘরের মধ্যে পা দিলেই বোঝা যায় ঘরটা সাধারণত ব্যবহার হয় না। একপাশে কতকগুলো কাঁচের শিশি বোতল স্তূপাকার করা রয়েছে এবং অন্য দিকে কতকগুলো প্যাকিং বাক্স প্লাইউডের।

আসুন এদিকে, শশংক চাপা গলায় আহ্বান জানায় সুব্রতকে।

শশাংকর আহ্বান-মত সুব্রত সেই ঘরের মেঝেতে পূর্ববর্ণিত শিক দেওয়া ফাঁকটার সামনে এসে দাঁড়াল। সেখান থেকে পূর্বের ঘরটা দেখা যাচ্ছে নীচে। হঠাৎ ওদের দু'জনেরই নজরে পড়ে টর্চ-বাতির একটা অনুসন্ধানী আলোর রশ্মি নীচের ঘরটার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক। আলোর রশ্মিটা এদিক ওদিক অন্ধকারে বারকতক ঘুরে হঠাৎ আবার এক সময় নিবে গেল।

ওরা দু'জনেই উদ্‌গ্রীব হয়ে শ্যেনদৃষ্টি মেলে নীচের অন্ধকার ঘরটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

পূর্বের মতই হঠাৎ আবার একসময় টর্চ-বাতিটা জ্বলে ওঠে এবং ক্লিক্ করে সুইচ টেপার একটা শব্দ শোনা গেল ও সঙ্গে সঙ্গে নীচের ঘরে আলো জ্বলে ওঠে। এবারে ওরা দেখতে পেল নীচের ঘরের মধ্যে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে। একজনের মুখে একটা প্লাসটিকের কালো মুখোশ। লোকটা ঢ্যাঙ্গা, পরিধানে সার্জের কালো রঙের গরম সুট্। অন্যজনের মুখটা খোলা। কিন্তু চোখে একজোড়া কালো কাচের চশমা। দ্বিতীয় লোকটার পরিধানেও গরম সার্জের দামী সুট্, ডিপ্ অ্যাস কালারের। মাথার চুল কোঁকড়ানো, ব্যাকব্রাস করা। ডান হাতে শক্তভাবে ধরা ছোট্ট একটা পিস্তল। লোকটা বেঁটে এবং মোটা। ভারী কর্কশ গলায় সে সঙ্গের ঢ্যাঙ্গা লোকটিকে বললে, আর দেরি করো না, চট্‌পট্ সেরে নাও। তালা খোলার সাঙ্কেতিক শব্দটা মনে আছে তো—ইস্কাবনের টেক্কা। ...Ace of Spades.

হ্যাঁ মনে আছে। বলে ঢ্যাঙ্গা লোকটি পূর্ববর্ণিত আলমারিটার সামনে এগিয়ে গেল। কিন্তু

BanglaBook.org

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল তবু ঢ্যাঙ্গা লোকটা আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে তালাটা নাড়াচাড়াই করে চলেছে।

কি হলো? বেঁটে লোকটি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সঙ্গী ঢ্যাঙ্গা লোকটার মুখের দিকে তাকাল।

সর্বনাশ হয়ে গেছে, ইস্কাবনের টেক্কায় তো তালা খুলছে না। সাঙ্কেতিক অক্ষর বদলে গেল কি করে!

তুই গাধা! সর্ দেখি! বিরক্তি মিশ্রিত কণ্ঠে বলতে বলতে বেঁটে লোকটা ঢ্যাঙ্গা লোকটার পাশে এগিয়ে এলো। সেও দু'মিনিট ধরে সিন্দুকের গা-তালাটা খুলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। গা-তালা খুলল না।

এতক্ষণে প্রথম বেঁটে লোকটার মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে, হুঁ। ...আমাদের আগেই শশাংক মিত্তির তাহলে দেখছি কাজ হাসিল করে গেছে।

ঢ্যাঙ্গা লোকটা এতক্ষণে আবার কথা বললে, তালা খুলবার সাঙ্কেতিক রহস্যটা কি শশাংক জানত?

আগে জানত না, কিন্তু মনে হচ্ছে এতক্ষণে জেনেছে নিশ্চয়ই। সাঙ্কেতিক রহস্যটা একমাত্র শশাংকর কাকা ডাঃ অজয় মিত্রই জানতেন। জাহাজে হীরা সিং ছিল আমাদের লোক। এবং যতদূর আমরা জানি এটর্নী দিগেন সান্যালও সিংগাপুর থেকে ঐ জাহাজেই আসছিলেন। সান্যালের মত অতবড় ধূর্ত শয়তান ও জঘন্য প্রকৃতির লোক আর দ্বিতীয় আমি দেখিনি। ডাঃ মিত্রের ঐ ছিল লিগ্যাল এড্‌ভাইসর—আইনের পরামর্শদাতা—কিন্তু মরুক গে সে সব—এখন যে করেই হোক শশাংক মিত্রের হাত হতে জিনিসটা আমাদের উদ্ধার করতেই হবে।

তা তো বুঝলাম, কিন্তু কেমন করেই বা তা সম্ভব হবে?

সম্ভব হবে!...একটা কুৎসিত হাসিতে বেঁটে লোকটির মুখখানা কুঞ্চিৎ হয়ে ওঠে, বলে, 'নেকড়ের থাবা'! কে শশাংক মিত্তির চেনে না! সে জানে না যে, 'নেকড়ের থাবা'র হাতে তার নিস্তার নেই! তাকে খুঁজে আমি বের করবোই। কথাটা তার শেষ হয় না, হঠাৎ ঠিক সেই সময় রাত্রির জমাট স্তব্ধতাকে দীর্ণবিদীর্ণ করে একটা পিস্তলের আওয়াজ শোনা যায়, গুড়ুম!

দু'জনেই ভীষণভাবে চমকে ওঠে ওরা।

ওদিকে সুব্রত ও শশাংক উপরের ঘরে কম চমকে ওঠেনি। ব্যাপার কি?

আবার আর একটা পিস্তলের আওয়াজ শোনা গেল, গুড়ুম!...শশাংক চাপা গলায় বললে, বাগানের দিক থেকে গুলির আওয়াজ আসছে মনে হচ্ছে সুব্রতবাবু।

কোথায় সেই বাগান? সুব্রত প্রশ্ন করে।

এই বাড়ির পিছনেই। এই ঘরের বাইরেই যে সিঁড়ি আছে, সেইটেই বরাবর বাগানে নেমে গেছে, শশাংক চাপা কণ্ঠে বলে।

হঠাৎ কি যেন ভেবে শশাংকর দিকে তাকিয়ে সুব্রত বলে, এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি এখুনি আসছি—বলতে বলতে সুব্রত ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

হতভম্ব শশাংক একা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। সুব্রতকে বাধা দেবারও যেন সময় পেল না।

ওদিকে ততক্ষণে নীচের ঘরের ইলেকট্রিক বাতিটাও দপ্ করে নিবে গেছে আবার।

শশাংক বর্ণিত সিঁড়িটা সুব্রতর খুঁজে নিতে দেরি হয় না। সিঁড়ি দিয়ে সুব্রত যেখানে এসে দাঁড়ায়, সেটা ঐ বাড়ির পিছন দিক। চাঁদের ম্লান আলোয় অস্পষ্ট প্রকৃতি।...মস্তবড় বাগানটা। বাগানের

BanglaBook.org

চারপাশে দেড়মানুষ সমান উঁচু প্রাচীর। তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সুব্রত এদিক ওদিক তাকায়।

হঠাৎ চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় সুব্রতর নজরে পড়ে একটা আবছা ছায়ামূর্তি যেন হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে প্রাচীরের উপর শিকারী বিড়ালের মত এগুচ্ছে।

এমন সময় হঠাৎ আবার আর একটা গুলির শব্দ প্রকৃতির স্তব্ধতাকে দীর্ণ করে জেগে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে একটা মানুষের তীব্র কণ্ঠের আর্তনাদ রাতের অন্ধকারকে যেন ছিন্নভিন্ন করে ঐ সঙ্গে জেগে ওঠে। শেষ করুণ মরণ আর্তনাদ।

অন্ধকার ঘরে একাকী শশাংক সেই মরণ আর্তনাদ শোনে।

আর ওদিকে নীচের ঘরে ঢ্যাঙ্গা ও বেঁটে লোকটিও সেই আর্তনাদ শুনে ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

সুট্‌পরিহিত বেঁটে লোকটা ঐ সময় চাপাকণ্ঠে তার অনুচরকে প্রশ্ন করে, মান্‌কে গোবরা, তারা নীচের বাগানে পাহারায় আছে না মাধব?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু তবু মাধবের গলার স্বরটা ভয়ে যেন কেমন শুকিয়ে যায়। গলা দিয়ে যেন স্বর বের হতেই চায় না। একটা অবশ্যম্ভাবী ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা মাকড়সার মত কালো বাঁকা বাঁকা রোমশ পা দিয়ে যেন হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসছে—সমগ্র সত্তাকে ওর এখুনি গ্রাস করবে।

ও কে চীৎকার করলে মাধব!

মান্‌কের গলা বলে মনে হলো যেন!

মান্‌কেরই গলা, কিন্তু কে তাকে গুলি করলে?

বুঝতে পারছি না তো!

আর সুব্রত তখন আবছা চাঁদের আলোয় অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে প্রাচীরের দিকে এগুচ্ছে! প্রাচীরের উপরে সেই অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিটা আর চোখে পড়ে না—অদৃশ্য হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

কিন্তু একটু আগে অমন করে শেষ মরণ-চিৎকার করলে কে? তিন তিন বার গুলিই বা ছুঁড়লে কে?—শশাংককে তার না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করে ঘরে থাকতে বলে আসেনি, সে আবার না ঘর ছেড়ে চলে যায় কোথাও! সহসা এমন সময় কানের কাছে কার সতর্ক প্রশ্ন ভেসে আসে, সুব্রতবাবু?

কে? চম্‌কে অন্ধকারে সুব্রত সামনের দিকে দৃষ্টিপাত করে।—কই! কোথাও কেউ তো নেই। তবে কে ডাকলে একটু আগে তার নাম ধরে? আবার কার গলার স্বর শোনা যায়, সুব্রতবাবু!

ইতিমধ্যে চারিদিকে একটা কুয়াশার চাদর যেন নেমে এসেছিল। এবং সেটা যে কখন একটু একটু করে ঘন হয়ে এসেছে সুব্রত টের পায়নি। কুয়াশার আবরণের তলায় চাঁদের অস্পষ্ট আলো আরো ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে গেছে; সুব্রতর আশেপাশে সামনে যতদূর সম্ভব সে দৃষ্টি মেলে দেখে—কেউ নেই, কেউ কোথাও নেই; কেবল আছে কুয়াশার একটা রহস্য যেন চাঁদের আলোয় মাখামাখি হয়ে। সম্মুখে পশ্চাতে ঊর্ধ্বে নিম্নে যেন সব কিছুকে দৃষ্টির আড়াল করে দিতে চায় সেই কুয়াশা-রহস্য।

নীচের ঘরে ঢ্যাঙ্গা ও বেঁটে লোকটি দাঁড়িয়ে অন্ধকারে মুখোমুখি তখনো।

বেঁটে লোকটি একসময় প্রশ্ন করে, গাড়িটা গলির মধ্যে আছে না মাধব?

BanglaBook.org

হ্যাঁ।

তুমি এগিয়ে যাও, আমি আসছি।

বেশী দেরি করবেন না যেন, ভাল ঠেকছে না আমার স্যার—

এগোও তুমি, আমি আসছি।

ঢ্যাঙ্গা লোকটি আর দ্বিরুক্তি না করে অন্ধকারেই ঘর ছেড়ে চলে গেল।

॥ ৭ ॥

আবার অন্ধকারে ডাক এল সতর্ক চাপা কণ্ঠে, সুব্রতবাবু!

কে?

আমি শশাংক।

অস্পষ্ট কুয়াশা-ভরা চাঁদের আলোয় আবছা শশাংক সুব্রতর সামনে এসে দাঁড়ায়।

চলুন, নেকড়ের থাবার লোক সমস্ত বাড়িটা নিশ্চয়ই আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে এখন। আমাদের খুঁজতে খুঁজতে হয়ত তারা কোন এক সময়ে এসে পড়তে পারে এখানে।

নেকড়ের থাবার দল ছাড়াও আর কেউ নিশ্চয়ই হানা দিয়েছে, সুব্রত বলে। তার পর আবার একটু থেমে বলে, শশাংকবাবু, আমার মনে হয় আরো কোন তৃতীয় পক্ষ আছে।

যেই আসুক, শশাংক বলে, আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে, না-হলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা, কারণ কেউ না কেউ একজন মারা গেছে। এই বাগানেরই একটা পিছন দিকে দরজা আছে। চলুন, আমরা সেই দরজা দিয়ে সরে পড়ি।

সুব্রত মৃদুস্বরে বললে, বেশ, চলুন।

এগিয়ে যেতে যেতে শশাংক পূর্ববৎ চাপা কণ্ঠে আবার বলে, আমি যতদূর জানি এই বাগানের পিছনের দিক দিয়ে একটা সরু গলি-পথ আছে, সেটা বরাবর গিয়ে বাড়ির সামনের রাস্তায় পড়েছে, সেখানেই আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

শশাংককে অনুসরণ করে তার পিছনে পিছনে সুব্রত বাগানের দরজা দিয়ে গলি-পথে এসে পড়ল। সঙ্কীর্ণ গলি-পথ।

দু'জন মানুষ পাশাপাশি চলতে পারে। দু'ধারে বাড়ির উঁচু দেওয়াল মাথা তুলে পথটাকে চেপে দাঁড়িয়ে আছে যেন।

সাধারণত এ-পথটা বড় একটা বোধহয় ব্যবহার করে না কেউ যাতায়াতের জন্য। মেথরদের যাতায়াতের জন্যই হয়ত ব্যবহার হয়ে থাকে। গলির মধ্যে নানা প্রকার আবর্জনা জমে আছে। একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ, নাক জ্বালা করে, নিশ্বাস যেন আটকে আসে।

অন্ধকারে হোঁচট্ খেতে খেতে টাল সামলাতে সামলাতে দুজনে অতিকষ্টে বড় রাস্তার উপরে এসে দাঁড়াল।

বাড়ির থেকে বেশ খানিকটা দূরে শশাংকর গাড়িটা ছিল, সেটাকে কিন্তু সেখানে দেখা গেল না।

আমার গাড়িটা? শশাংক বলে চাপা কণ্ঠে, কি হলো?

সুব্রত মৃদু হাসল, এখন সেটার আশা ত্যাগ করুন। পরে খুঁজে দেখলেই চলবে। চলুন দেখি আমার গাড়িখানাও উধাও হয়েছে না আছে।

BanglaBook.org

আপনিও আপনার গাড়ি এনেছিলেন নাকি মিঃ রায়?

সেইরকম তো মনে হচ্ছে। রাস্তার ধারে রেখেছিলাম, চলুন দেখি। তবে লক্ করে রেখে এসেছিলাম এই যা ভরসা।

আরো খানিকটা এগিয়ে দেখা গেল, সুব্রতর গাড়িটা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে। সুব্রত একটা আরামের নিশ্বাস নিল, যাক্ আছে। মহাপ্রভুদের নজর এড়িয়ে গেছে দেখছি। চলুন, পা চালিয়ে চলুন।

গাড়ির সামনে এসে দরজার লক্ খুলে সুব্রত আহ্বান জানাল, আসুন, উঠুন।

শশাংক বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়িতে উঠে বসল। সুব্রত গাড়িতে স্টার্ট দিল, গাড়ি নড়ে উঠল।

স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে অ্যাকসিলারেটারে পায়ের মৃদু চাপ দিয়ে সুব্রত প্রশ্ন করে, তারপর এখন কোন্ দিকে?

আপাততঃ সারকুলার রোডের দিকে চলুন। শশাংক বলে।

গাড়ি সারকুলার রোডের দিকে তীর বেগে ছোটাল সুব্রত।

সারকুলার রোডে এসে পড়তেই, সুব্রত বাড়ির দিকে না গিয়ে এবং শশাংককে কোন প্রশ্ন না করেই হঠাৎ গাড়ি ঘোরাল সোজা শ্যামবাজারের দিকে এবার।

একি, কোন্ দিকে গাড়ি চালাচ্ছেন, মিঃ রায়? শশাংক প্রশ্ন করে।

আপাততঃ শ্যামবাজার অভিমুখে। জবাব দেয় সুব্রত।

কিন্তু আমাদের তো যেতে হবে আমহার্স্ট স্ট্রীটের দিকে?

না।

না মানে?

পরে জানতে পারবেন। সুব্রত শান্ত ভাবে জবাব দেয়।

সুব্রত গাড়িটা চালিয়ে চার রাস্তার মোড় ছাড়িয়ে শ্যামবাজার বি. ও. সি. অয়েল স্ট্যাণ্ডের সামনে এসে একবারে ব্রেক কষল।

আসুন, শশাংকবাবু নেমে পড়ুন।

কিন্তু এ কোথায় এলেন? কোথায় নামবো?

তর্ক করবেন না, আগে তো নামুনই। পরে জানতে পারবেন সব।

শশাংক কতকটা হতভম্বের মতই যেন গাড়ি থেকে নেমে পড়ে অতঃপর।

সুব্রত সোজা গিয়ে সামনের পেট্রোলের দোকানটার মধ্যে ঢোকে। সেখানে চেয়ারের উপর বসে সামনের টেবিলটার উপরে মাথা রেখে একজন আধবয়েসী লোক ঘুমিয়েছিল। সুব্রত তার কাঁধে মৃদু একটা ধাক্কা দিয়ে ডাকলে, যদু! ওহে যদুনাথ কুম্ভকর্ণ দি সেকেণ্ড, একবারটি নয়ন মেল।

কে ? যদুনাথ হাতের চেটোয় চোখ দু'টো রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে।—বলি ব্যাপারটা কী? আরে! কে সুব্রতবাবু যে, কি সংবাদ—এত রাত্রে?

যদুনাথ, আমার গাড়িটা তোমার দোকানের সামনে রেখে গেলাম, কাল সকালে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে। বলতে বলতে সুব্রত এগিয়ে গিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল।

হ্যালো! সাউথ!...

একটু পরেই ওপার থেকে প্রশ্ন ভেসে আসে, কে?

কে কিরীটী! আমি সুব্রত কথা বলছি। হীরা সিংকে দিয়ে চট্ করে তোর গাড়িটা পাঠিয়ে দে ভাই।

BanglaBook.org

কেন রে—হঠাৎ?

পরে শুনবি, জলদি চটপট।

কিন্তু কোথায় গাড়ি নিয়ে যাবে?

হীরা সিংকে বলবি বাগবাজারের পতিত ময়রার মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ঠিক সামনে।

বেশ।

শশাংক এতক্ষণ অবাক হয়ে সুব্রতর কার্যকলাপ দেখছিল। সে যেন ঘটনার আকস্মিকতায় হঠাৎ একেবারে বোবা বনে গেছে।

শশাংকর কাছে সুব্রত যেন ক্রমেই রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

ফোন ছেড়ে রিসিভারটা যথাস্থানে নামিয়ে রেখে এবারে সুব্রত বলে, যদুনাথ, এক কাপ চা খাওয়াতে পারো?

চেষ্টা করে একবার দেখতে পারি। যদুনাথ জবাব দেয়।

তবে একটি বার দয়া করে দেখ, ততক্ষণ আমরা তোমার পাশের ঘরটাতে বসছি। আসুন মিঃ মিত্র।

সুব্রত সামনের বন্ধ দরজা ঠেলে পাশের ছোট অন্ধকার ঘরটায় গিয়ে প্রবেশ করে এবং সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জ্বালাল।

ছোট একখানি ঘর। ঘরের একপাশে একটি তক্তাপোশ পাতা। তার উপরে একটি মলিন শয্যা বিছানো। আসবাবপত্র ঘরের মধ্যে বিশেষ কিছুই নেই, এই তক্তাপোশটি ছাড়া ঘরের দক্ষিণ কোণে একটি টিনের সুট্‌কেশ; একটি টিফিন ক্যারিয়ার, একটা অ্যালুমিনিয়ামের কেত্‌লী ও একটি গলা-ভাঙা কুঁজো, তার উপরে একটি ময়লা তোবড়ান অ্যালুমিনিয়ামের জল খাবার ছোট গেলাস উবুড় করা। ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ভাঙা একটি আরশি। এক কোণে দুই তিনটি ময়লা জামাকাপড় জড়ো করা আছে।

বসবার আর কোন জায়গা নেই দেখে সুব্রত খাটের উপরেই বসে বলে, বসুন মিঃ মিত্র, আমাদের প্রোগ্রাম এখন ঠিক করতে হবে।

অভিভূতের মত শশাংকও বসে পড়ে তার পাশে।

আশা করি এবারে আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। এবারে বলুন তো কেন আপনি চোরের মত এই মাঝরাত্রে নারকেলডাঙ্গায় জনমানবহীন আপনার কাকার বাড়িতে হানা দিয়েছিলেন? সুব্রত প্রশ্ন করে।

ক্ষমা করবেন মিঃ রায়, সব কথা এখনো আপনাকে আমি খুলে বলতে পারছি না। শশাংক যেন কেমন গম্ভীর।

সুব্রত শশাংকর মুখের দিকে তাকাল। তারপর মৃদু হেসে বললে, ও, আচ্ছা বেশ তাহলে এখন বলুন যাবেন কোথায়?

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে এখুনি একবার চন্দননগরে বলরামবাবুর বাড়িতে যেতে হবে, তার সঙ্গেই আমার কথা আছে।

কিন্তু আপনার বিপক্ষ দলের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবেন কি করে? জানেন তারা আপনাকে নারকেলডাঙ্গা থেকে ছায়ার মতই অনুসরণ করে এসেছে আর সেই কারণেই হঠাৎ গাড়ি ঘুরিয়ে এখানে এসেছি। এবং এখানেও তারা এই দোকানের বাইরে শিকারী বাঘের মত ওৎ পেতে যে বসে আছে আপনার জন্য সে সম্বন্ধেও আমি নিশ্চিত।

BanglaBook.org

কি বলছেন আপনি?

সুব্রত আবার মৃদু হেসে বললে, হ্যাঁ—তাই। বলছিলাম চন্দননগরের বলরামবাবুর কাছে যদি আপনাকে যেতেই হয় তো ওদের চোখে ধুলো দিয়েই যেতে হবে।

কিন্তু আপনি ঠিক জানেন ওরা আমাদের অনুসরণ করে এসেছে এখান পর্যন্ত?

জানি, আর বললাম তো সেই কারণেই সোজা এখানে আমি চলে এলাম।

তা হলে কি হবে?

কি আর হবে! চলুন, আপনাকে আমি আমার গাড়িতে করে চন্দননগরে পৌঁছে দেবো। তারপর ঘড়ি দেখে আবার বলে, রাত্রি এখন দুটো, আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই হয়ত আমার গাড়ি পৌঁছে যাবে। আড়াইটেয় স্টার্ট করলে সাড়ে তিনটে নাগাদ চন্দননগরে পৌঁছতে পারবো বলে আশা করি—যদি অবশ্য লেবেল ক্রসিংগুলোয় বাধা না পাই।

॥ ৮ ॥

যদুনাথ এক কাপ চা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো, এই নিন চা।

চট্‌পট্ চা'র পেয়ালা নিঃশেষ করে সুব্রত উঠে দাঁড়াল এবং বললে, নিন উঠুন, চলুন, এতক্ষণে গাড়ি এসে গিয়েছে বোধ করি।

শশাংক উঠে দাঁড়াল। দু'জনে তখন ঐ বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে গলির মধ্যে এসে পড়ল। এগলি-ওগলি করে ওরা এসে শেষে বাগবাজার স্ট্রীটে পড়ল।

সামনেই পতিত ময়রার মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, কিন্তু তখনও কিরীটীর গাড়ি এসে সেখানে পৌঁছায়নি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই কিরীটীর প্রকাণ্ড ক্যাডিলাক্ গাড়ি এসে সেখানে পৌঁছাল।

সুব্রত গাড়িটার দিকে এগুতে এগুতে মৃদু স্বরে ডাকল, হীরা সিং?

জী সাব্।

মিঃ মিত্র আসুন, উঠুন গাড়িতে।

সুব্রত আগে গাড়িতে উঠে বসল, পরে শশাংকও গাড়িতে উঠে বসে।

চন্দননগর চলো হীরা সিং। পেট্রোল আছে তো?

দু'টিন এক্সট্রা আছে সাব্।

বেশ, চলো।

যন্ত্র-দানব চলতে শুরু করল।

ইতিমধ্যেই মিথ্যে নয় যে সুব্রত শশাংকর ব্যাপারে কেমন যেন একটা অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করছিল। এবং সেই কারণেই কতকটা এবং কতকটা ব্যাপারটা ইতিমধ্যে তাকে রীতিমত উৎসুক করে তুলছিল। শশাংককে ঘিরে যেন সত্যিই রহস্য একটা ঘনীভূত হয়ে উঠছে—কেন শশাংক নারকেলডাঙ্গার বাড়িতে গিয়েছিল, কী রহস্য লুকিয়ে আছে ঐ ভারী লেপাফোর্টার মধ্যে—আর কেনই বা এখনো শশাংক কোন কথা তাকে খুলে বলতে চাইছে না।

কিসেই বা ওর দাম লক্ষ লক্ষ টাকা! যেমন করেই হোক সুব্রতকে এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করতেই হবে।

নির্জন রাস্তা পেয়ে গাড়ি হাওয়ার বেগে ছুটে চলেছে তখন।

দক্ষিণেশ্বরের ব্রীজ। বালী, উত্তরপাড়া, বেলুড়। গাড়ি হাওয়ার গতিতে ছুটে চলেছে। কোথায়ও কোন বাধা পড়ল না। অবশেষে একসময় গাড়ি ফরাসী চন্দননগরের এলাকায় এসে প্রবেশ করল

BanglaBook.org

এবং এবার শশাংকই নিজে থেকে নির্দেশ দিতে লাগল তখন রাস্তার। গঙ্গার ধারে শহরের একেবারে বাইরে একটা পুরাতন দোতলা বাগানবাড়ির সামনে এসে শশাংকর নির্দেশমত হীরা সিং গাড়ি থামালো।

বাড়িটার একতলার ঘরে একটা আলোর আভাস পাওয়া যায়।

শশাংক আগেই গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। সুব্রতও গাড়ি থেকে নামে।

ইধার-ই ঠ্যারাগা সাব? হীরা সিং প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। যেতনা তক্ হাম লোগ না ওয়াপস আয়। সুব্রতও জবাব দেয়।

একটা জীর্ণ কাঠের গেট। গেটটা খোলাই ছিল, গেটটা অতিক্রম করে শশাংক আগে চলে, সুব্রত তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। সদর দরজা বন্ধ।...

কিন্তু দরজার গায়ে ঈষৎ ধাক্কা দিতেই দরজাটা গেল খুলে। ড্রইংরুম, কিন্তু সেটাও খালি, ঘরের এক কোণে সেলফের উপরে কেবল একটা কেরোসিনের টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে।

শশাংক ডাকে, বলদেব কাকা, বলদেব কাকা!

কিন্তু কোন সাড়াশব্দই মেলে না। দু'জনে এসে পাশের ঘরে ঢুকল তখন।

সে ঘরেও আলো জ্বলছে—দেওয়ালগিরি।

কিন্তু হঠাৎ অগ্রবর্তী শশাংকর কণ্ঠ চিরে একটা ভয়চকিত আর্তচীৎকার বের হয়ে আসে।

কি? কি হলো মিঃ মিত্র? সুব্রত প্রশ্ন করে।

শশাংকর কাঁধের পাশ দিয়ে সুব্রত সামনের দিকে উঁকি দিল। তাদের সামনেই মেঝের উপরে একটা দেহ উবুড় হয়ে পড়ে আছে। তার পিঠের জামাটা রক্তে ভেজা; একটা রক্তের ধারা তার পিঠের উপর থেকে নেমে মেঝেতে এসে পড়েছে।

বীভৎস দৃশ্য।

দু'জনে কিছুক্ষণ চোখের সামনেই মেঝের উপরে সেই নিশ্চল বিগতপ্রাণ ভূলুণ্ঠিত রক্তাক্ত দেহটির দিকে তাকিয়ে রইলো। কারও মুখেই কোন কথা নেই। একটু আগে যে শশাংকর কণ্ঠ চিরে আকস্মিক ভয়মিশ্রিত শব্দটা উত্থিত হয়েছিল সেটা যেন হঠাৎ ঘটনার ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে লীন হয়ে গিয়েছে। অদূরে টেবিলের উপরে যে দেওয়ালগিরিটা জ্বলছিল সেটা খোলা জানালাপথে হাওয়ার আনাগোনায় থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। বাতির শিখাটাও বুঝি ভয় পেয়েছে ঐ নৃশংস হত্যাকাণ্ডে, তাই ভয়ে সেটাও কেঁপে কেঁপে উঠছে। চাঁদ ডুবে গেছে কিছুক্ষণ হলো। পৃথিবীর বুকে কিছুক্ষণের জন্য যে মরা পাণ্ডুর আলো জেগেছিল তারও যেন সহসা ঘটেছে অপমৃত্যু। নিশ্ছিদ্র আঁধারে অবলুপ্ত হয়েছে সমস্ত পৃথিবী।

সুব্রতই প্রথমে এগিয়ে গেল ভূপতিত দেহটির দিকে। স্পর্শ করলে সেই নিশ্চল দেহটা, হিমানীর মত ঠাণ্ডা। প্রাণের এতটুকু স্পন্দনও আর অবশিষ্ট নেই। অন্ততঃ ঘণ্টা দুই আগে মৃত্যু যে হয়েছে সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। অদূরে দেওয়ালে বসানো দেওয়ালগিরির আলোর খানিকটা রশ্মি এসে লুটিয়ে পড়েছে মৃতের রক্তহীন ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখের উপরে যেন।

এতক্ষণ শশাংক যেন পাথরের মতই দাঁড়িয়েছিল, এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে সে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে।

সুব্রত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শশাংকর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল—চেনেন এঁকে?

হ্যাঁ...বলদেব কাকা। তারপর একটু যেন থেমে অশ্রুঝরা কণ্ঠে বললে, কিন্তু কারা এমন করে ওঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে গেল তাই কেবল ভাবছি সুব্রতবাবু।

করেছে নিশ্চয়ই কেউ। কিন্তু কথা হচ্ছে 'নেকড়ের থাবার' দল কি জানত যে আপনার সঙ্গে

BanglaBook.org

বলদেববাবুর কোন সংস্পর্শ আছে? এবং একথা কি তারা জানত যে আপনি ঐ লেপাফাটা উদ্ধার করতে পারলে সর্বাগ্রে এখানেই এঁর কাছে আসবেন?

জানত না নিশ্চয়ই, তবে হয়ত অনুমান করেছিল, কেননা বলদেব কাকা আজই সকালে আমার সঙ্গে আমার আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলেন।

হুঁ, তা এখন যে পুলিসে একটা সংবাদ দিতে হবে মিঃ মিত্র।

পুলিস! পুলিস কেন?

পুলিস কেন মানে? খুনের ব্যাপারে এখন সর্বাগ্রে পুলিসকেই তো সংবাদ দিতে হবে, নচেৎ আপনি নিজেও এই খুনের সঙ্গে যে জড়িয়ে পড়বেন বুঝতে পারছেন না!

কিন্তু...

এবার সুব্রত আর চুপ করে থাকে না। সমস্ত সংকোচ কাটিয়ে বলে ওঠে, শুনুন শশাংকবাবু, আপনি আমার চাইতে অনেক ছোট। এ সংসারটা বড় জটিল জায়গা। আমার মত অভিজ্ঞতা আপনার যদি থাকতো তবে বুঝতে পারতেন পুলিস একবার ছুঁলে আঠারো জায়গায় ঘা হয়। যদিও এ বাড়িটা শহরের উপকণ্ঠে একরকম নির্জন জায়গায়, তবু এ ব্যাপারে পুলিসের নজর এড়াবে না—আজ হোক কাল হোক একদিন না একদিন পুলিসে জানতে পারবেই এই নৃশংস হত্যার কথা। তখন তদন্ত করতে করতে আপনার পরিবারের সূত্রেও টান পড়বে; তখন আপনি কি করে এড়াবেন পুলিসকে! এখনও আপনি সব কথা আমাকে খুলে বলুন। এমনি করে সব কিছু আর গোপন করবার চেষ্টা করবেন না। আমার যতটুকু সাধ্য আপনাকে সাহায্য করব—কথা দিচ্ছি আমি। এবং আমি যদি বুঝি পুলিসের সংস্পর্শে এলে আপনার ক্ষতি হবে, তবে আমিই পুলিসকে এড়িয়ে চলবো। তাছাড়া আর একটা কথা হচ্ছে, এই মৃতদেহের পাশে বেশীক্ষণ থাকাও যুক্তিসঙ্গত হবে না আমাদের।

এতক্ষণে শশাংক সুব্রতর দিকে মুখ তুলে তাকাল। বললে, সব কথাই আপনাকে আমি খুলে বলব সুব্রতবাবু। চলুন পাশের ঘরে—এখানে আর আমি দাঁড়াতে পারছি না।

পাশের ঘরে এসে সংক্ষেপে তখন সব কথা খুলে বলে শশাংক। শশাংক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ অজয় মিত্রের ভাইপো। শশাংক বলতে থাকে, আমার যখন সাত বছর বয়স তখন আমার বাবা মারা যান। সেই থেকেই আমি আমার কাকার কাছে তাঁরই স্নেহের ছায়ায় ক্রমে এত বড়টা হয়ে উঠেছি। কাকা আমার আজন্ম ব্রহ্মচারী সন্নাসী মানুষ। বছর দুই আগে কোন কারণে কাকার সঙ্গে আমার সামান্য মতান্তর হওয়ায় তাঁর বাড়ি থেকে চলে গিয়ে আমি বর্ধমানে আমাদের যে পৈতৃক বাড়িটা আছে সেখানেই আছি। আমার সঙ্গে আমাদের পুরানো চাকর স্বরূপদাও চলে আসে। মধ্যে মধ্যে কলকাতার বাড়িতে এসেও থাকি। আমার কাকার এক ছোটবেলার বন্ধু ছিলেন। তিনিও একজন বৈজ্ঞানিক, তাঁর নাম ডাঃ সুনীল কর। কাকা ফাংগাসের ওপরে অনেকদিন ধরে একটা গবেষণা করছিলেন। তিনি বলতেন, ঐ ফাংগাস্ থেকে এমন একটি জিনিস তিনি বের করবেন, যার যে কোন রকম কক্কাই, বেসিলাস বিশেষ করে নিউমোককাস, গনককাস ইত্যাদি এবং যে কোন প্রকার সেফটিক উণ্ডকে অতি আশ্চর্য উপায়ে দ্রুত নিরাময় করে দেবার ক্ষমতা থাকবে। তাঁর গবেষণা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, এমন সময় ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দাবানল উঠলো জ্বলে। কাকার সঙ্গে যে বন্ধুটি কাজ করতেন, ঐ সুনীল কর তিনি যে এদিকে বিশ্বাসহন্তার মত তলে তলে অর্থের লোভে কাকাকে পথে বসাতে চেষ্টা করছিলেন, তা কাকা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন নি। এদিকে ৭ই ডিসেম্বর জাপান অকস্মাৎ পার্লহারবার আক্রমণ করে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

BanglaBook.org

তার কিছুদিন আগে থেকেই সুনীল কর গোপনে কলকাতার একটা বিদেশী ঔষধের কোম্পানীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে বহু টাকার বিনিময়ে কাকার আবিষ্কৃত জিনিসটা বিক্রী করবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

কাকার অজান্তেই ঐসব একস্‌পেরিমেন্টের একটা কপি করতে শুরু করেন। একের তিন অংশ যখন কপি করা হয়ে গেছে, কাকা যেমন করেই হোক সমস্ত ব্যাপারটা হঠাৎ জেনে ফেললেন। এদিকে সেকথা সুনীল করও বুঝতে পেরে রাতারাতি সিঙ্গাপুরে পালালেন জাহাজে চেপে, সেই বিদেশী কোম্পানীর সাহায্যে। দশ পনের দিন পরে জাহাজে কাকাও গেলেন সিঙ্গাপুরে। যাবার আগে এক রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা করে আমাকে সব কথা বলে গেলেন কাকা। কাকার কাছে যে একস্‌পেরিমেন্টের সম্পূর্ণ কপিটা ছিল তার মধ্যে $\frac{১}{৩}$ অংশ বিশেষ করে যেটার মধ্যে মেথেমেটিকাল ক্যালকুলেশন ছিল এবং সুনীল কর যেটা সম্পর্কে কিছুই জানত না সেটা কাকার নারকেলডাঙ্গার বাড়িতে দেওয়ালের মধ্যে গুপ্ত আয়রন সেফে বন্ধ রইলো। এবং সেই গুপ্ত সেফের দরজার তালা খোলবার সংকেত এক কাকা ছাড়া কেউ জানতো না। এমন কি আমাকেও বলে যাননি। ঐ তালাটার আর একটা মজা ছিল, প্রত্যেকবার খোলবার পর আটকাবার সময় নতুন নতুন সাংকেতিক কথা দিয়ে বন্ধ করা যেতো। এবং বাকী $\frac{১}{৩}$ অংশের কপি রইলো লাইব্রেরী ঘরে একটা বইয়ের মধ্যে; যাই হোক এদিকে কাকা সিংগাপুরে পৌঁছাবার পরই হঠাৎ একদিন রাত্রে হোটেলে কোন এক আততায়ীর হাতে অতর্কিত ভাবে গুরুতর আহত হন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর আইন-পরামর্শদাতা দিগেন সান্যালকে তার করেন শীঘ্র সিংগাপুরে চলে যাওয়ার জন্য হাসপাতাল থেকেই। দিগেনবাবু কয়েক দিনের মধ্যেই অতি কষ্টে প্যাসেজ যোগাড় করে সিংগাপুরের দিকে রওনা হলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মিঃ সান্যালের সিংগাপুরে পৌঁছাবার আগেই কাকার মৃত্যু হয়। এদিকে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে মিঃ সান্যাল সিংগাপুরে আটকা পড়ে গেলেন। জাপানী সৈন্যরা তখন ঝড়ের মত দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসছে। তাদের দুর্জয় সৈন্যবাহিনীর কাছে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটছে। এমন সময় সংবাদ পেলাম তারযোগে দিগেন সান্যাল শেষ দল ইভাকুইদের সঙ্গে 'ক্রিশ্চানা' জাহাজে সিংগাপুর থেকে ভারতে ফিরে আসবার ব্যবস্থা করেছেন। নানা প্রকার দুশ্চিন্তায় আমি যখন একপ্রকার দিশাহারা হয়ে পড়েছি এমন সময় অরিন্দম সরকার আমার সঙ্গে এসে দেখা করলো। অরিন্দম সরকারকে ইতিপূর্বে কখনো আমি দেখিনি, জানতামও না ওকে, ঐ প্রথম দেখলাম। প্রথমে মিঃ সরকারের অভিপ্রায়টা আমি ভাল করে বুঝতে পারিনি। এই সময় হঠাৎ দিগেন সান্যালের একখানা রেজিস্টার্ড চিঠি পেলাম গত কাল সকালে। এই দেখুন সেই চিঠি—বলতে বলতে শশাংক একটা খোলা খামেভরা চিঠি সুব্রতর দিকে দিল এগিয়ে জামার ভিতরকার পকেট থেকে বের করে।

॥ ৯ ॥

সিঙ্গাপুর স্নোভিউ হোটেল

প্রিয় শশাংক,

দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে তোমার কাকা শ্রীযুক্ত অজয় মিত্র আজ দশ দিন হলো হাসপাতালে গত হয়েছেন। যুদ্ধের জন্য এখানকার অবস্থা ভয়ংকর। যাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু কবে যে জাহাজে প্যাসেজ পাবো তা জানি না। একটা সংবাদ তোমাকে দিচ্ছি—সুনীল করের সঙ্গে আমার হঠাৎ

BanglaBook.org

বাজারে দেখা হয়েছিল; তার সঙ্গে কথা বলতে গেলাম কিন্তু মনে হলো সে যেন আমাকে চিনতেও পারলো না। দু-চার দিন তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করেছিলাম। তাতে বুঝতে পেরেছি তোমার কাকার বিরুদ্ধে একটা ভয়ংকর ষড়যন্ত্র গড়ে উঠেছিল। একটা প্রকাণ্ড দল এখনও কাজ করছে, তারা আপ্রাণ চেষ্টা করবে তোমার কাকার একস্‌পেরিমেন্টের সম্পূর্ণ কপিটা হস্তগত করবার। তবে একটা রক্ষে, যেখানে সেই কপি আছে অর্থাৎ গবেষণার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশটা আছে—সেটা খুলবার সাংকেতিক শব্দ তোমার কাকা ছাড়া আর কেউ জানতেন না। তোমার কাকার মৃত্যুটাও একটা প্রকাণ্ড রহস্যে আবৃত হয়ে আছে।

চন্দননগরে তোমার কাকার যে পুরোনো বন্ধু আছেন বলদেব ঘোষ, সময় পেলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবে এবং তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ভিন্ন কিছু করবে না। আমার ধারণা এ বিষয়ে তিনি অনেক কিছুই জানেন। কেননা, তোমার কাকা সিংগাপুর আসবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে বলে এসেছিলেন, প্রয়োজন হলে বলদেববাবুর পরামর্শ নিতে, তাঁর কাছে অনেক সংবাদ পেতে পারো। বলদেববাবুকেও আমি পৃথক চিঠি দিলাম, তোমার সঙ্গে দেখা করতে । দেখা হলে বিস্তারিত সব জানতে পারবে। ভালাবাসা রইলো। ইতি—

দিগেন সান্যাল

সুব্রত চিঠিখানা আগাগোড়া এক নিঃশ্বাসে পড়ে শশাংককে ফিরিয়ে দিল।

পড়লেন তো চিঠিটা সুব্রতবাবু? শশাংক প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ। তাহলে সেই এক্‌সপেরিমেন্টের ব্যাপার নিয়েই যত গণ্ডগোল!

হ্যাঁ।

তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার শশাংক বলতে লাগল, অরিন্দম সরকার লোকটা যে কে এবং তার কি সত্য পরিচয় কিছুই আমার জানা নেই। জীবনে তাকে পূর্বে কোন দিন দেখিওনি, সে যখন কয়েকদিন আগে এক সকালে উপযাচক হয়ে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে আমাকে সাহায্য করবার কথা বললে, এবং বললে সুনীল করকেও সে চেনে ও কাকারও নাকি সে বিশেষ বন্ধু, আমি তাকে বিশ্বাস করতে পারিনি কারণ কাকার মুখে তার নাম কখনো শুনিনি; আমি তাকে এড়িয়ে যাই। তারপর গতকাল সকালে বলদেব কাকা আমার সঙ্গে এসে দেখা করেন। আমি অরিন্দম সরকারের কথা তাঁকে সব খুলে বলি। তিনি বলেন, অরিন্দম বলে কেউ কাকার পরিচিত কোন দিন ছিল না। যাই হোক তিনিই আমাকে আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে বলেন এবং এ ব্যাপারে অন্য কারো সংস্রবে নিষেধ করেন।

অরিন্দম সরকার আপনাকে কি পরামর্শ দিয়েছিল?

তিনি বলেছিলেন, ঐ গুপ্ত সেফের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে এক্‌পেরিমেন্টের কপিটা সরিয়ে ফেলতে, কেননা সে নাকি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছে একটা দুর্ধর্ষ দল ঐ এক্‌স্‌পেরিমেন্টের কপিটা হাতাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

কিন্তু সে তার আসল পরিচয়টা দেয়নি আপনার কাছে?

না। কেবল বলেছিল সে কাকাকে চেনে এবং তার বন্ধু।

হুঁ।

সহসা এমন সময় একটা পিস্তলের আওয়াজ হলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের আলোটা ভেঙে চুরমার হয়ে ভাঙা কাঁচগুলো ঝন্‌ঝন্ শব্দ তুলে চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

একটা অস্ফুট শব্দ করে সঙ্গে সঙ্গে সুব্রত ও শশাংক লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

কাঁচ ভাঙার শব্দটা মিলিয়ে গেল ঘরটাকে অন্ধকার করে দিয়ে। আর দু'জনে ভূতগ্রস্তের মতই যেন সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলো।

পরস্পর পরস্পরের শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দটুকুও যেন শুনতে পাচ্ছে।

এমনি আকস্মিক ভাবে আক্রান্ত হয়ে ওরা সত্যিই যে বিস্মিত ও হতচকিত হয়ে উঠেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুব্রত স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিল শত্রুপক্ষই সহসা তাদের আক্রমণ করেছে এবং তাদের গতিবিধি আদৌ শত্রুপক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারেনি।

নিশ্চয়ই অলক্ষ্যে থেকে ওরা আমাদের অনুসরণ করে এসেছে এখান পর্যন্ত। কিংবা আগে থাকতে এখানে আশে-পাশে কোথাও আত্মগোপন করেছিল। শশাংক বলে।

ঘরের মধ্যে নিরন্ধ্র অন্ধকার হঠাৎ যেন এক ভৌতিক বিভীষিকায় প্রেতায়িত হয়ে উঠে থম্‌থম্ করছে। সীসের মতই একটা জমাট ভারী স্তব্ধতা। ঘটনার আকস্মিকতায় দু'জনেই ওরা যেন তখন বোবা হয়ে গেছে।

প্রথমে সুব্রতই সতর্ক চাপা গলায় ডাকলে, মিঃ মিত্র!

বলুন? তেমনি চাপা ভয়মিশ্রিত গলায় প্রশ্নোত্তর ভেসে এলো।

নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন ওরা আমাদের পিছনে পিছনে এসেছে এখানেও, কিংবা আগে থাকতেই এখানে উপস্থিত ছিল?

অন্ধকারটা ততক্ষণ ওদের কতকটা চোখ সহা হয়ে গেছে, অস্পষ্ট একটা ছায়ার মধ্যে আলোর ক্ষীণ আভাসের মত খোলা ঘরের দরজাটায় চোখ পড়ে।

শশাংক জবাব দেয়, মনে হচ্ছে তাই—

এখন যে ভাবেই হোক এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে, কিন্তু সাবধান! আশপাশে ওরা নিশ্চয়ই আছে। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে চলুন ঘর থেকে।

সুব্রত অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এগুতে থাকে, শশাংক সুব্রতকে অনুসরণ করে।

অদৃশ্য আততায়ীদের আর কোন সাড়াশব্দই নেই। তারা কী ভাবে কোন্ পথে এগুচ্ছে, কত কাছেই বা এসে পড়েছে এবং কত জনই বা তাদের দলে আছে, কিছুই জানবার একটুকু উপায় নেই।

অবিশ্যি সুব্রতও নিরস্ত্র নয়, কোমরের স্ট্রাপে আঁটা অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্রটা ডান হাত দিয়ে একবার স্পর্শ করে নেয়।

দু'জনে সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে পাশের অন্ধকার ঘরটার মধ্যে এসে ঢুকল।

ঐ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখল সে ঘরের একটা জানলা খোলা। এগিয়ে গিয়ে ঘরের খোলা জানলাটা দিয়ে সন্তর্পণে সুব্রত বাইরের দিকে তাকায় কিন্তু কিছুই চোখে পড়ে না।

বাড়িটা নিশ্চয়ই ওরা এতক্ষণে ঘিরে ফেলেছে। এ বাড়ি থেকে বের হবার এক ঐ সদর রাস্তা ছাড়া আর কোন রাস্তা আছে কি শশাংকবাবু? সুব্রত চাপা গলায় প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, একটা খিড়কির দরজা আছে, সেদিক দিয়ে বের হলে একটা বড় মাঠ ও ধেনো জমির মধ্যে দিয়ে অনেকটা ঘুরে আবার গিয়ে বড় রাস্তায় বোধ হয় পড়া যেতে পারে।

কতটা পথ হবে?

তা প্রায় আধ মাইলটাক তো হবেই, বেশীও হতে পারে।

BanglaBook.org

চলুন তবে, আর দেরি নয়। রাস্তাটা আগে আপনার সঙ্গে গিয়ে আমি দেখে নিই; তারপর আপনি আগে এগিয়ে যাবেন, আমি ফিরে এসে ওদের গতিবিধি একটু ভাল করে লক্ষ্য করে আপনাকে অনুসরণ করবো। পাঁচ-দশ মিনিটের বেশী আমার দেরি হবে না। ওদিকে আবার হীরা সিং একাকী গাড়ি নিয়ে সদর গেটের কিছুদূরে অপেক্ষা করছে বড় রাস্তায়। তার বা গাড়িটার কিছু হলো কিনা তাই বা কে জানে!

শশাংককে অনুসরণ করে অন্ধকারে অতি সাবধানে সুব্রত এগুতে লাগল।

যে ঘরটার মধ্যে ওরা দাঁড়িয়েছিল, সেই ঘরটা অতিক্রম করে ডান দিকের আর একটা ঘর দিয়ে একটা বারান্দা ও আঙ্গিনা পার হয়ে ওরা এসে একটা দরজার সামনে দাঁড়াল।

দরজাটার গায়ে লোহার একটা শক্ত খিল লাগানো। আঙ্গিনাটার চারপাশে উঁচু প্রাচীর। প্রাচীরের উপরে সব ধারালো ভাঙা কাচের টুকরো বসানো, সহজে অতিক্রম করে কারও বাড়ির মধ্যে আসবারও উপায় নেই।

সুব্রত হাতঘড়ির দিকে তাকাল। রেডিয়াম দেওয়া ঘড়ির অক্ষরগুলো ও কাঁটা দুটো সংকেত জানাচ্ছে, রাত্রি তখন প্রায় পৌঁনে পাঁচটা। অর্থাৎ রাত্রি শেষ হয়ে এলো। ভোরের আলো ফুটে উঠতে আর বেশী দেরি নেই।

কোথাও কোন সাড়া নেই শব্দ নেই। সমস্ত বিশ্বচরাচর যেন নিঃশব্দতার অতলে তলিয়ে গেছে।

শশাংক লোহার ভারি খিলটা হাত দিয়ে খুলে ফেলে। সামনেই খোলা দরজা—আবছা আবছা যতদূর দৃষ্টি চলে, ধু ধু একটা শূন্য মাঠ রাত্রিশেষের তরল অন্ধকারে ও নক্ষত্রের স্তিমিত আলোয় কেমন ধূসর স্বপ্নের মত গা এলিয়ে পড়ে আছে যেন।

শশাংক বলে, এই মাঠের ভিতর দিয়ে খানিকটা আল ধরে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেলেই একটা সরু কাঁচা মাটির পায়ে-চলা পথ পাওয়া যাবে, সেটাই বরাবর গিয়ে একটা কাঠের পুলের সামনে শেষ হয়েছে। গঙ্গার বুক থেকে একটা খাড়ি মত চলে গেছে, তারই উপরে ঐ কাঠের পুল। ঐ পুলের উপর দিয়ে যে কাঁচা সড়কটা গেছে, সেটা ধরে পোয়াটেক মাইল ডাইনে এগিয়ে গেলেই, এই বাড়ির সদর গেটের কাছে এসে পড়া যায়।

আপনি তা'হলে ঐ পুলের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকবেন, আমি এখুনি আসছি। সুব্রত বলে।

বেশ। শশাংক সামনের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সুব্রত আবার বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল। তখনও সেখানে কোন সাড়াশব্দই নেই। যে ঘরের মধ্যে মৃতদেহটা পড়ে আছে, প্রথমে সেই ঘরে এসে সুব্রত যেমন অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করতে যাবে, হঠাৎ অস্পষ্ট আলো-আঁধারে ঘরের মধ্যে দৃষ্টি পড়তেই ও থমকে দাঁড়িয়ে গেল। খোলা জানলা-পথে কে একজন বাইরের অন্ধকারে ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখবার চেষ্টা করছে। এমন সময় সহসা রাতের অন্ধকারে একটা তীক্ষ্ণ শিসের ধ্বনি ভেসে এলো।

সুব্রত চট্ করে দরজার একপাশে সরে দাঁড়াল পিস্তলটা হাতে নিয়ে এবং দেখতে পেল, জানলার পাশে দাঁড়ানো লোকটা হাত তুলল এবং তার হাত থেকে একটা টর্চের সরু আলোর রশ্মি বাইরের অন্ধকারে গিয়ে পড়ে তক্ষুনি নিবে গেল।

বোধহয় টর্চের আলো ফেলে ঘরের লোকটি বাইরে তার অপেক্ষমাণ দলের লোকদের কোন সংবাদ জানাচ্ছে। আর দেরি করা এখানে উচিত হবে না। যদি ওরা দলবল নিয়ে এখন বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে তো মুস্কিল হবে। সুব্রত দ্রুত সতর্ক পদবিক্ষেপে দরজার পাশ থেকে সরে এগিয়ে গেল। বাড়ির পিছনের যে দরজা দিয়ে একটু আগে পালিয়ে গেছে, সেই দরজা দিয়ে বাড়ির বাইরে

BanglaBook.org

এসে পড়লো এবং দ্রুতপদে শশাংকর নির্দেশমতই মাঠের মধ্য দিয়ে অন্ধকারে ছুটতে শুরু করল।

নির্দিষ্ট পুলটার কাছে এসে দেখল ও শশাংক পুলের রেলিঙে ভর দিয়ে একাকী দাঁড়িয়ে আছে।

এসেছেন? শশাংক সুব্রতর পদশব্দে ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি গাড়িটা এদিকে নিয়ে আসি।

সুব্রত ডাইনের রাস্তা ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল। শশাংক দাঁড়িয়ে রইলো সেখানেই।

অনেকটা পথ দ্রুতপদে হেঁটে আসবার পর সুব্রত দূরে দেখতে পেল কিরীটীর কালো রঙের ক্যাডিলাক্ গাড়িখানা রাস্তার একপাশে তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

এবার ও সতর্ক হয়ে রিভলবারটা হাতের মধ্যে শক্তভাবে মুঠো করে ধরে চারিদিকে শিকারী বিড়ালের মত সতর্কদৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে এগুতে লাগল।

অপ্রশস্ত রাস্তা, গোড়ালী পর্যন্ত ডুবে যাওয়া ধুলো, জনহীন। আশেপাশে কোন ঘরবাড়ি নেই। গাড়িটার পিছনে এসে সুব্রত দাঁড়ায়, তারপর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গাড়ির পিছনের কাচের ভিতর দিয়ে সন্তর্পণে গাড়ির মধ্যে দৃষ্টিপাত করল।

ব্যাক সিটটা গাড়ির খালি। সামনের সিটে কেউ নেই—খালি।

কী আশ্চর্য! হীরা সিং তবে গেল কোথায়?

পাঞ্জাবী হীরা সিং দেহে যথেষ্ট শক্তি ধরে। এবং দীর্ঘদিন কিরীটীর সঙ্গে থেকে থেকে লোকটার এসব ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা ও সাবধানতা আছে। অতর্কিতে কারো পক্ষেই হঠাৎ তাকে ঘায়েল করা তো সম্ভবপর নয়। তবে? সন্তর্পণে সুব্রত আর একবার গাড়ির মধ্যে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিল। না, কাউকে গাড়ির মধ্যে ও দেখতে পাচ্ছে না। তবু আর একবার পিছনের কাচের ভিতর দিয়ে গাড়ির ভিতরটা দেখে নিয়ে সুব্রত গাড়ির গা ঘেঁষে ঘেঁষে একবারে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে পা টিপে টিপে বাঁ দিকটা প্রথমে দেখে ডান দিকে ফিরে এলো। দেখল ডান দিককার দরজার কাচটা নামানো। এবং সেই দরজার ভিতর দিয়ে গাড়ির মধ্যে এবারে দৃষ্টিপাত করতেই ও দেখলে গাড়ির সামনের সিটে কে একজন মুখ হাত পা বাঁধা অবস্থায় অসহায়ের মত পড়ে আছে। মুহূর্তে সমস্ত ব্যাপারটা সুব্রতর কাছে যেন জলের মতই পরিষ্কার হয়ে যায়।

সুব্রত আর ইতস্তত মাত্র না করে চকিতে গাড়ির সামনের দরজাটা খুলে ফেলে গাড়ির মধ্যে টর্চের আলো ফেলল। হ্যাঁ—তার অনুমানই সত্য।

হাত পা মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে সিটের উপরে হীরা সিংই।

তাড়াতাড়ি সুব্রত হীরা সিংয়ের হাতের বাঁধন পকেট থেকে একটা ছুরি বের করে কেটে দিল। মুখটা বাঁধা হয়েছিল ওরই মাথার পাগড়ী দিয়ে শক্ত করে। সেটাও খুলে দিল।

কিন্তু আশ্চর্য, হীরা সিংয়ের তবু কোন সাড়াশব্দ নেই। লোকটা মরেনি তো! সুব্রত হীরা সিংয়ের নাকের কাছে হাত নিল, না, নিশ্বাস নিচ্ছে। তবে? একটা মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ! তবে কি—হ্যাঁ, ভুল নেই। সুব্রত বুঝতে পারে শত্রুপক্ষ হীরা সিংকে ক্লোরোফরম দিয়ে অজ্ঞান করেছে।

আর কালবিলম্ব না করে সুব্রত হীরা সিংয়ের অসাড় জ্ঞানহীন দেহটা গাঁজাকোলা করে অতি কষ্টে ব্যাক সিটে নিয়ে এসে ফেলল।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে সুব্রত তখনও হাঁপাচ্ছে।

তারপর গাড়িতে উঠে বসে যেমন স্টার্ট দিতে যাবে, সঙ্গে ক্লাচে পা-টা দাবিয়ে সুইচে হাত দেবে, সহসা ও দেখতে পেল কে একজন তীরের মত ছুটতে ছুটতে এদিকেই আসছে—আধো আলো আধো আঁধারে।

BanglaBook.org

সুব্রত গাড়ির ফ্রন্ট্ লাইটের সুইচটা টিপে দিল, অন্ধকার ভেদ করে গাড়ির সুতীব্র ইলেকট্রিক আলো বহুদূর পর্যন্ত রাস্তার উপরে ছড়িয়ে পড়ল।

সেই তীব্র আলোয় সুব্রত স্পষ্টই দেখতে পেলে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে আসছে আর কেউ নয়—শশাংক।

আর তার পিছনে পিছনে কারা ছুটে আসছে যেন শশাংককে অনুসরণ করে।

সহসা একটা পিস্তলের গুলির শব্দ চারিদিকে সচকিত করে ছড়িয়ে পড়ল—দুড়ুম্!...

সুব্রত কিছু না ভেবেই টুপ্ করে সুইচ্ বোর্ডে হাত বাড়িয়ে সামনের আলোটা দিল নিবিয়ে।

॥ ১০ ॥

সুব্রত গাড়ির ড্যাস্ বোর্ডের সুইচ টিপে হেড্ লাইট দুটো নিবিয়ে দেবার পূর্বেই একটা ঠুং করে শব্দ ওর কানে এসেছিল।

এবং মুহূর্তের জন্য গাড়ির ঐ বিরাট বডিটাও যেন একটু কেঁপে ওঠে।

আচমকা অভাবনীয় কোন গুরুতর পরিস্থিতিতেও নার্ভ না হারানোটাই ছিল সুব্রতর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এবং সেজন্য সে অনেক সময় ইতিপূর্বে অনেক ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেও আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে।

আজও সুব্রত হক্‌চকিয়ে গাড়ির আলোটা নিবিয়ে দেয়নি; মুহূর্তে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল বলেই গাড়ির আলো সে নিবিয়ে দিয়েছিল। এবং নিবিয়ে দিয়েই সুব্রত কান খাড়া করেছিল, গুলির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কোন চীৎকার শোনা যায় কিনা? কিন্তু না, কোন শব্দই আর শোনা গেল না। সুব্রতর বুঝতে তখন বাকী থাকে না গুলিটা গাড়ির বডিতেই কোথায়ও লেগেছে।

সাহসে ভর করে পরমুহূর্তেই সুব্রত গাড়ির দরজা খুলে রাস্তায় নেমে পড়ল।

অন্ধকারের বুকে আবার আর একটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল এবং এবারে ঠুং করে একটা তীব্র শব্দ হতেই বিদ্যুৎবেগে সে মাটির বুকে শুয়ে পড়ল।

এবারে সুব্রত বুঝতে পারে গুলিটা লেগেছে গাড়ির মাডগার্ডে, তারই ঐ শব্দ। তারপর আর কোন শব্দ নেই, চারিদিক নিস্তব্ধ।

একটুক্ষণ মাটিতে পড়ে থেকে সুব্রত আবার একসময় উঠে দাঁড়াল এবং সামনের অস্পষ্ট অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, কিছুই দেখা যায় না।

যে কয়মুহূর্ত সুব্রত আত্মরক্ষার জন্য মাটির বুকে শুয়েছিল তার মধ্যেই সুব্রত মনে মনে অত্যন্ত দ্রুত বর্তমান সমগ্র পরিস্থিতিটা চিন্তা করে নিয়েছে। শত্রুপক্ষ শশাংককেই লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে কোন ভুল নেই কিন্তু নিশ্চয়ই শশাংকের গায়ে সে গুলি লাগেনি। অন্ধকারে লক্ষ্য ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু শশাংক গেল কোথায়, অস্পষ্ট অন্ধকারে কিছু ছাই দেখাও যায় না সামনে।

সুব্রত রাস্তার কিনার ঘেঁষে এগুতে লাগল।

পূর্বাকাশে বিদায়ী রাতের শেষ আঁধারটুকু আগত দিনের আলোর ছোঁয়ায় ধূসর তখন। ভোরের আলো ফুট্‌তে আর খুব বেশী দেরি নেই। সুব্রত রাস্তার ধারে বড় একটা শিমুল গাছের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। সামনে আবছা ভোরের আলোয় যতদূর দৃষ্টি যায়, কাউকেই সে দেখতে পেলে না। শশাংক বা আততায়ীদের কোন চিহ্নই নেই। শূন্য রাস্তাটা সামনে পিছনে।

BanglaBook.org

হঠাৎ কার স্পর্শে সুব্রত চম্‌কে ফিরে তাকাতেই দেখে পিছনে দাঁড়িয়ে শশাংক। শশাংকর দুই ঠোঁটের উপরে তার ডান হাতের তর্জনী।

সুব্রতবাবু! চাপা গলায় শশাংক প্রশ্ন করে।

কে? শশাংকবাবু—কোথায় ছিলেন?

এই গাছটার আড়ালে। কিন্তু আর দেরি নয়, শিগ্‌গীর চলুন, পালাতে হবে।

আর একটু অপেক্ষা করুন, ভাল করে ভোর হতে দিন। দিনের আলো ফুটে উঠ্‌তে আর খুব বেশী দেরি নেই। সুব্রত বলে।

কিন্তু আর দেরি করা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত হবে না। আমরা যত তাড়াতাড়ি এখান হতে সরে পড়তে পারি ততই ভাল। শশাংক বলে।

বেশ, তবে চলুন। সুব্রত আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাস্তার এদিক হতে ওদিক, যতদূর দৃষ্টি চলে ভাল করে দেখে নিতে নিতে কথাটা বললে।

হীরা সিংয়ের লুপ্ত জ্ঞান তখনও ফেরেনি। আগে সুব্রত ও পরে শশাংক দু'জনে এসে গাড়ির ফ্রন্ট্ সিটে উঠে বসল।

ড্রাইভার কই? শশাংক প্রশ্ন করে।

আছে। সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় সুব্রত।

গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে সুব্রত বললে, কোন্ দিকে যাবো এখন বলুন?

এখন সোজা আমাদের কলকাতায় যাওয়া হবে না। ওদের দলে অনেক লোক। তাছাড়া 'নেক্‌ড়ের থাবার' মত দুর্ধর্ষ শয়তান আর দ্বিতীয় কেউ বোধ হয় নেই।

তাহলে এখন কি করবেন? সুব্রত জিজ্ঞাসা করে।

আপাততঃ চন্দননগরেই আমার চেনা একজন লোকের বাড়ি আছে। আমার বসন্ত কাকা—সেখানে আপনি আমাকে নামিয়ে দিয়ে যান। পরে একসময় আমি একাই কলকাতায় ফিরে যাবো। শশাংক বলে।

সুব্রতর গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে। অনেক রাস্তা ঘুরে ঘুরে শশাংকর নির্দেশমতই সুব্রত বলতে গেলে শহরের অন্য এক প্রান্তে গঙ্গার ধারে একটা নির্জন দোতলা বাড়ির গেটের সামনে এসে গাড়ি থামাল। আশেপাশে জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই, নির্জন একেবারে জায়গাটা। গেটটা খোলাই ছিল, সুব্রত সোজা গাড়ি চালিয়ে গেট দিয়ে বাড়ির মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল।

ছোট ছোট নুড়ি-ঢালা নাতিপ্রশস্ত রাস্তা। দু'ধারে সযত্নবর্ধিত মরসুমী ফুল ও নানাজাতীয় পাতাবাহারের সমারোহ। একটা উড়ে মালী ঝারি নিয়ে ফুলগাছের গোড়ায় জল সেচন করছিল, গাড়ির শব্দে মালীটা মুখ তুলে তাকাল।

শশাংক চীৎকার করে ডাকলে, মালী—এই মালী?

মালী ঝারিটা একপাশে নামিয়ে রেখে এগিয়ে এল, কাকে চান বাবু?

কত্তাবাবু আছেন রে বাড়িতে?

আছেন আজ্ঞে।

এ কার বাড়ি শশাংকবাবু? সুব্রত প্রশ্ন করে।

কোন আত্মীয় নয়। কাকার জানাশুনা, এঁকেও কাকা ডাকি। চলুন, ভিতরে যাওয়া যাক্।

গাড়িবারান্দার নীচে এসে সুব্রত গাড়ি থামাল।

মালী বাইরের ঘরের দরজা খুলে দিলে। মস্ত বড় ঘরটা। পুরাতন আমলের আসবাবপত্রে

BanglaBook.org

ঘরটি সুসজ্জিত। শশাংককে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে সুব্রত ফিরে দাঁড়াল।

চলে যাচ্ছেন নাকি সুব্রতবাবু?

না। হীরা সিংয়ের জ্ঞান ফিরে এলো কিনা দেখি।

শশাংক ভিতরে চলে গেল।

সুব্রত আবার গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ আগেই বোধহয় হীরা সিংয়ের লুপ্ত জ্ঞান ফিরে এসেছে, তবে ক্লোরোফরমের নেশার ঘোরটা তখনও ভাল করে কাটেনি। চোখ দুটো বুজিয়েই হীরা সিং গাড়ির গদিতে গা এলিয়ে পড়েছিল। সুব্রত এগিয়ে এসে মৃদুস্বরে ডাকলে, হীরা সিং?

উঁ! হীরা সিং ক্লান্ত চোখের পাতা মেলে কোনমতে চাইল।

না না—তোমায় উঠতে হবে না। তুমি আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকো। আমি আসছি।

নিশ্চিন্ত হয়ে সুব্রত ফিরে গেল। শশাংক তখন ঘরের মধ্যে চুপ করে একটা গদি মোড়া চেয়ারের উপরে একাকী বসে গালে হাত দিয়ে কি যেন ভাবছে। ঘরে আর কেউ নেই।

শশাংকবাবু? মৃদুস্বরে সুব্রত ডাকে, একা ঘরে বসে যে?

অ্যাঁ! শশাংক চমকে ওঠে।

দেখা হয়নি বসন্তবাবুর সঙ্গে?

না।

তা'হলে এখন কি করবেন ঠিক করেছেন?

দেখি, বসন্তকাকার সঙ্গে দেখা করি। আপাততঃ এখানেই দু-চারদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকবো ভাবছি। আপনি কি বলেন?

আমি আর কি বলবো, আপনি যা ভালো বোঝেন তাই করুন।

এমন সময় দরজার বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল এবং একটু পরেই খোলা দরজা-পথে একজন ভদ্রলোককে ঘরের মধ্যে আসতে দেখা গেল। ভদ্রলোক এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

ভদ্রলোকের বয়স ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যে হবে। গায়ের রঙ আবলুশ কাঠের মত কালো। লম্বায় পাঁচ ফুটের বেশী হবে না। একজোড়া পাকানো গোঁফ। পরিধানে রাইডিং ব্রীচেস্, নমস্কার। আপনি?

বসন্তকাকা আছেন! শশাংকই কথা বলে। সুব্রত কোন কথা না বললেও আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

কিন্তু আপনাকে তো চিনলাম না! শশাংক আবার বলে।

না, আমাকে আপনি চিনবেন না। আমার নাম ভানুদেব, আমি বসন্তবাবুর ভাইপো।

ও! তা বসন্তকাকা এখনও ঘুম থেকে ওঠেননি?

তা তো বলতে পারি না। কিন্তু ভেতরে সংবাদ দেননি? ভানুদেব প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ দিয়েছি, মালীই তো ভেতরে গেল সংবাদ দিতে।

Oh! I see! তা—

এমন সময় ঘরের বাইরে আবার চটি জুতোর শব্দ শোনা গেল।

ঐ যে কাকা আসছেন বোধহয়! বললে ভানুদেব।

সত্যিই বসন্তবাবু, শশাংকর তথাকথিত কাকা এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। শশাংক বসন্তবাবুকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে উঠে দাঁড়াল, বসন্তকাকা!

BanglaBook.org

পরিধানে স্লিপিং পায়জামা ও কিমানো চাপানো।—কে, আরে এ কি শশাংক যে! তারপর কি সংবাদ? হঠাৎ কাকাবাবুকে মনে পড়লো বুঝি! কিন্তু এত সকালে কোথা থেকে আসছো? প্রশ্ন করলেন বসন্তবাবু।

শশাংক এগিয়ে গিয়ে বসন্তবাবুর পায়ের ধুলো নিল, তারপর বললে, কলকাতা থেকেই আসছি কাকা, ইনি আমার বন্ধু সুব্রত রায়।

নমস্কার! হাত তুলে সুব্রতকে অভিবাদন জানালেন বসন্তবাবু।

সুব্রতও প্রতি-নমস্কার জানায়। সুব্রত দেখছিল বসন্তবাবুকে। বয়স পঞ্চান্নের ঊর্ধ্বে নিশ্চয়ই। মাথার এক-তৃতীয়াংশ চুল প্রায় পেকে গেছে, মাথায় সাদা-কালো মিশানো ঘন চুল বিস্রস্ত, মুখে বয়সের বলিরেখা, কিন্তু দেহ এখনও বেশ মজবুত। দীর্ঘ লম্বা চেহারা।

বসুন, বসুন সুব্রতবাবু। শশাংক, বস। বলতে বলতে বসন্তবাবু একটা সোফার উপরে এগিয়ে গিয়ে বসলেন। তারপর এত সকালে কলকাতা থেকে হঠাৎ—কি ব্যাপার বল তো শশাংক? বসন্তবাবু প্রশ্ন করেন।

এই এলাম, মানে—শশাংক ইতস্ততঃ করতে থাকে।

সুব্রত কোন কথা বলে না। চুপ করেই থাকে।

ভৃত্য ট্রেতে করে চা নিয়ে এমন সময় সেই ঘরে এসে ঢুকল।

বসন্তবাবু বললেন, ভানু, বঙ্কিমকে বল তো আমাকে একটা সিগার দিয়ে যেতে।

ভানু ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল, বোধ হয় বঙ্কিমকে কথাটা বলতেই।

তারপর, মাই ডিয়ার চাইল্ড, হোয়াটস্ দি বিগ নিউজ্? বলতে বলতে হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে বললেন, হ্যাঁ ভাল কথা, তোমার কাকা ডাঃ অজয় মিত্র শুনলাম—

হ্যাঁ। সিংগাপুরে তিনি হঠাৎ দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

হ্যাঁ শুনেছি, কিন্তু ব্যাপার কি বল তো?

শশাংক চুপ করে থাকে।

তারপর সংবাদপত্রে দেখলাম, ক্রিশ্চানা জাহাজ ডুবেছে, মিঃ দিগেন সান্যাল—ডাঃ মিত্রের বন্ধু অ্যাটর্নী তিনি—তাঁর সংবাদ কি? অনেকদিন তাঁর সঙ্গেও দেখা হয়নি। শুনেছিলাম ডাঃ মিত্রের কিছুদিন পরে তিনিও সিঙ্গাপুরে নাকি গেছেন।

হ্যাঁ। কিন্তু ক্রিশ্চানা জাহাজের accident-এর কথাটা হয়ত আপনি শোনেননি।

না, কি ব্যাপার বল তো?

মিঃ সান্যাল শেষ ইভ্যাকুইদের সঙ্গে সেই জাহাজেই আসছিলেন।

বল কি!

হ্যাঁ কাকাবাবু, মিঃ সান্যাল সেই জাহাজেই ছিলেন।

অ্যাঁ, বল কি শংকু? তা'হলে কি—বাকী কথাটা তিনি আর সমাপ্ত করলেন না।

না, ঠিক জানি না তবে এখন পর্যন্ত তাঁর কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি।

বসন্তবাবু কিছুক্ষণ এরপর যেন গুম হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, তা'হলে মিঃ সান্যাল ক্রিশ্চানা জাহাজেই যাত্রী ছিলেন?

হ্যাঁ। তাঁর যে শেষ চিঠি পাই, তাতে তিনি লিখেছিলেন, ক্রিশ্চানা জাহাজেই আসছেন। শশাংক মৃদুস্বরে বললে।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ। কারও মুখে কোন কথা নেই।

BanglaBook.org

সুব্রত ভাবছিল শশাংকর কাকাবাবুটি যেই হোন না কেন, অনেক সংবাদই রাখেন অথচ সেটা প্রকাশ করতে চাইছেন না—কেন। না জানার ব্যাপারটা একটা ভান মাত্র নয় তো! কেন যেন তার মনে হয় ক্রিশ্চানা জাহাজের সংবাদটা শশাংকর বলবার আগেই জানতেন বসন্তবাবু।

কাকাবাবু? শশাংক আবার মৃদুস্বরে ডাকে।

অ্যাঁ! বসন্ত শশাংকর মুখের দিকে তাকাল।

একটা বিশেষ বিপদে পড়েই আপনার এখানে আমি এসেছি।

বিপদ! কি ব্যাপার শশাংক?

শশাংক খুব সংক্ষেপে তখন গত দু'দিনকার ব্যাপার বসন্তবাবুকে খুলে বললে।

সমস্ত শুনে বসন্তবাবু শুধালেন, বল কি? তা'হলে এখন কি করবে ঠিক করেছো?

আপনার এখানেই কয়েকটা দিন আত্মগোপন করে থাকবো ভাবছি।

তাতে কি কোন সুবিধা হবে?

বিপক্ষদল তাতে করে হয়ত সহজে এখানকার সন্ধান পাবে না। শশাংকবাবু বোধহয় তাই ভাবছেন। কথাটা বললে সুব্রত।

তাই যদি হয় তো—ও যতদিন খুশি এখানে থাকুক। আমার অবিশ্যি কোনই তাতে আপত্তি নেই মিঃ রায়। আমার দ্বারা শশাংকর কোন উপকার যদি হয়, স্বচ্ছন্দে আমি সেটা করতে রাজী আছি। কিন্তু আপনি কি সত্যিই মনে করেন তাতে ওর সুবিধা হবে সত্যিকারের! বসন্তবাবু বললেন।

এমন সময় বঙ্কিম এসে ঘরে প্রবেশ করল, হাতে তার গোটা দুই চুরুট ও দেশলাই।

একটা চুরোট আনতে তোর এত দেরি হয় হতভাগা? গর্জে উঠলেন বসন্তবাবু।

আজ্ঞে কর্তা আপনি তো চাননি, আমি ভাবলাম, হয়ত এখুনি আপনি চুরোট চাইবেন, তাই নিজে থেকে নিয়ে এলাম। কুণ্ঠিত কণ্ঠে ভৃত্য বঙ্কিম জবাব দেয়।

কেন, ভানুদেব তোকে বলেনি?

আজ্ঞে না তো! দাদাবাবুর সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি।

এমন সময় একটা চুরোট ও দেশলাই নিয়ে ভানুদেবও এসে ঘরে প্রবেশ করল, এবং বঙ্কিমকে লক্ষ্য করে বলল, কোথায় ছিলি রে হতভাগা? খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান, শেষ পর্যন্ত আমাকেই চুরোট নিয়ে আসতে হলো?

আজ্ঞে আমি তো লাইব্রেরী ঘরে সব ঝাড়াপোঁছা করছিলাম দাদাবাবু। বঙ্কিম জবাব দেয়।

এ কি, আপনারা কেউ এখনো চা খাননি? এতক্ষণ সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। যা ব্যাটা, হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে আর এক কেটলী গরম জল নিয়ে আয়। ভানুদেব বঙ্কিমের দিকে তাকিয়ে রুক্ষভাবে কথাগুলো বলে।

বঙ্কিম তখুনি আবার চলে গেল কেটলীটা তুলে নিয়ে।

॥ ১১ ॥

ভৃত্য বঙ্কিম নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেল, বোধহয় আবার কেটলী ভরে গরম জল আনতেই।

ঘটনাটা সামান্যই, কারো মনে হয়ত এতটুকু রেখাপাতও করেনি, কিন্তু সুব্রতর সদাজাগ্রত অনুসন্ধিৎসু মন ঘটনাটা অত সহজভাবে কেন যেন নিতে পারে না। তার যেন মনে হয় বঙ্কিম

BanglaBook.org

মিথ্যা বলেনি। বরং ভানুদেবই মিথ্যা কথা বলে দোষটা বঙ্কিমের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করল। কিন্তু কেন?

শশাংককে সুব্রত যেন এখনও ভাল করে বুঝে উঠতে পারছে না। লোকটা আসলে সরল সাদাসিদে প্রকৃতির, না ভীরু, না সত্যিই অসাধারণ বুদ্ধি মানুষটার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। না, এখনো তার সঙ্গে মন খুলে মিশছে না—

আর একটা কথা—বসন্তবাবুকে শশাংক কাকাবাবু বলে ও পরিচিত বলে পরিচয় দিলেও, আসলে লোকটা যে বিশেষ ঝানু প্রকৃতির তা সামান্য পরিচয়ের মধ্যে দিয়েই সুব্রত যে বুঝতে পারেনি তা নয়।

কেন যেন সুব্রতর মনে হচ্ছিল শশাংক বসন্তবাবু সবাই যে রহস্য দিয়ে মোড়া—সব কিছুর মধ্যেই যেন একটা রহস্য আছে এবং এখন পর্যন্ত শশাংক তাকে সব কিছু খোলাখুলি ভাবে না বললেও, অনেকগুলো ঘটনা পর পর তার মনের মধ্যে বেশ রেখাপাত করেছিল। ডাঃ অজয় মিত্র—শশাংকর কাকা, তাঁর বন্ধু অ্যাটর্নী দিগেন সান্যাল, তাঁর সহকারী সুনীল কর, মৃত বলদেববাবু, অরিন্দম সরকার এবং সর্বোপরি 'নেকড়ের থাবা'। এবং সব কিছুর মূলে মনে হচ্ছে আছে ডাঃ অজয় মিত্রের ফাংগাসের উপর এক রিসার্চ গবেষণার ব্যাপার। এবং যে গবেষণার কপির কিছু অংশ বর্তমানে শশাংকর করায়ত্ত হলেও বোঝা যাচ্ছে তার কিছু অংশটা উপরি-উক্তদের মধ্যে কারো দখলে। কিন্তু এ সব কিছুকেও ছাপিয়ে উঠছে যে প্রশ্নটি বর্তমানে সুব্রতর মনে সেটা কোন একটি বিশেষ ব্যক্তির অবয়ব ও মুখাকৃতির সঙ্গে পুলিসের গোপন ফাইলে দেখা আর একজনের অবয়ব ও মুখাকৃতির অপূর্ব ও নিখুঁত সামঞ্জস্য। হুবহু একই চেহারার দু'জন ব্যক্তি থাকতে পারে কিনা! এবং তাই যদি থাকে তা'হলে সে ক্ষেত্রে কি উপায়ে এই রহস্যের কিনারা করা যেতে পারে? সুব্রতর সমস্ত চিন্তা যেন তাকেই কেন্দ্র করে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল ঐ সময়।

ইতিমধ্যে একসময় পুনরায় ভৃত্য বঙ্কিম কেটলীতে করে গরম চা নিয়ে এল।

ভানুদেবই সকলের কাপে চা ও দুধ ঢেলে দিয়ে এক বাটি কিউব সুগার এগিয়ে দিয়ে বলল, এই নিন চিনি।

নিঃশব্দে সকলে এক এক কাপ চা টেনে নিয়ে চিনি মিশিয়ে নিলেন নিজ নিজ প্রয়োজন মত।

শশাংকর কাকা বসন্তবাবুই প্রথমে কথা বললেন, তা'হলে শশাংক, তুমি এখানে কয়েকটা দিন থাকবেই ঠিক করলে তো?

হ্যাঁ কাকাবাবু।

বেশ, তা থাক। আমি দিন দুয়েকের জন্য অবিশ্যি আজই দুপুরে কলকাতা যাবো, কতকগুলো জরুরী কাজ আছে, সেগুলো শেষ করতে। মিঃ রায়, আপনিও কি থাকবেন ওর সঙ্গে এখানেই?

সুব্রত নিজের চিন্তায় ডুবে ছিল, বসন্তবাবুর কথায় চম্‌কে উঠে বলে, আজ্ঞে কি বললেন?

বলছিলাম আপনিও কি শশাংকর সঙ্গে এখানেই থাকবেন?

না। আমি এখুনি কলকাতায় ফিরে যাবো।

তা বেশ। যাবার আগে এখানেই গরীবের কুটিরে যাহোক চাট্টি কিছু আহার করে একেবারে গেলে সুখী হবো মিঃ রায়। বিনীত কণ্ঠে বসন্তবাবু বললেন।

সুব্রত হেসে ফেলে, সে একদিন হবে'খন বসন্তবাবু। আজ আমার এখুনি ফিরে যেতে হবে। বলতে বলতে সুব্রত সত্যি সত্যিই উঠে দাঁড়ায় এবং বলে, আচ্ছা আসি তা'হলে নমস্কার। চলি শশাংকবাবু।

BanglaBook.org

শশাংক চুপ করেই থাকে, কোন জবাব দেয় না।

ধীর মন্থরপদে সুব্রত ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

ক্লোরোফরমের নেশা হীরা সিংয়ের তখনও ভাল করে কাটেনি। তাই হীরা সিংকে গাড়ির পিছনে বসতে বলে নিজে গিয়ে সুব্রত স্টিয়ারিংয়ে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

চন্দননগরে ইতিপূর্বে সুব্রত আরো দু'একবার কার্যোপলক্ষে আসা-যাওয়া করেছে, জায়গাটা সুব্রতর অপরিচিত নয়। কিন্তু কলকাতায় ফিরে যাবার নাম করে বিদায় নিয়ে এলেও সুব্রতর তখুনি ফিরে যাবার কোন মতলবই ছিল না। সুব্রতর মনে পড়ল গঙ্গার একেবারে খুব নিকটেই শহরের প্রান্তে একটি পুরোনো দিনের হোটেল আছে, হোটেলের মালিক একজন ইন্দোফ্রেঞ্চ। নাম তার মঁসিয়ে লা।

সুব্রত সোজা মঁসিয়ে লার হোটেলের দিকে গাড়ি চালাল।

মঁসিয়ে লা হোটেলেই সেসময় ছিলেন। সুব্রতকে দেখে সাদর আহ্বান জানালেন, হ্যালো মিঃ রায়, গুড্ মর্ণিং! গুড্ মর্ণিং! ...তারপর কি সংবাদ? হঠাৎ এত সকালে চন্দননগরে? কোন বিশেষ কাজ ছিল নাকি?

হ্যাঁ। একটা জরুরী কাজে এদিকে আসতে হলো। দু-চার দিনের জন্য আমাকে একখানা নিরিবিলি ঘর দিতে পারেন?

নিশ্চয়। আসুন।

সুব্রতকে সঙ্গে করে দোতলার একটা ঘরে নিয়ে গেলেন মঁসিয়ে লা। ঘরটি বেশ ভালই এবং পরিচ্ছন্ন। চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে একটা চেয়ারে বসতে বসতে সুব্রত বললে, ধন্যবাদ! এবারে বেশ ভাল করে দু কাপ কফি চাই, এক কাপ খুবই স্ট্রং—একটা লাইট। আমার ড্রাইভার নীচে গাড়িতে আছে, স্ট্রং কাপটা তাকে পাঠিয়ে দেবেন। অন্যটা আমার ঘরে, এখানে পাঠিয়ে দিন।

দোতলায় দক্ষিণ দিকে ছোট একখানা ঘরে মঁসিয়ে লা সুব্রতর থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

মঁসিয়ে লা ঘর থেকে চলে যেতেই সুব্রত উঠে এসে জানলাটার সামনে দাঁড়াল। চোখে পড়ল জানলা খুলতেই গঙ্গার দৃশ্যটি বড় চমৎকার। এখানে গঙ্গা যেন একটু নিরালা। কলকাতার মত অত স্টীমার লঞ্চ ও নৌকার ভিড় নেই।

শীতের গঙ্গা শান্ত ধীর, যেন একখানা সুবিস্তীর্ণ গৈরিক চাদর টান-টান করে বিছিয়ে রাখা হয়েছে। মাঝে মাঝে বারো দাঁড়ের দু-একখানা মালবোঝাই নৌকা পাল তুলে ভেসে চলেছে দেখা যায় এদিক ওদিক।

খোলা জানলাপথে ঝিরঝির করে গঙ্গাবক্ষের শীতল বায়ু বহে আসে। জাগরণক্লান্ত চোখে মুখে যেন বুলিয়ে দেয় শান্তির প্রলেপ। দু-চোখের পাতায় ঘুম জড়িয়ে আসে।

হোটেলের বয় কফির ট্রে হাতে ঘরে এসে প্রবেশ করল।

সুব্রত বললে, রেখে যাও।

কাপে কফি ঢেলে পান করতে করতে সুব্রতর মনের মধ্যে আবার আগেকার চিন্তাটাই দানা বেঁধে উঠতে থাকে।

চন্দননগর ত্যাগ করে সুব্রতর এখন যাওয়া চলতে পারে না। হীরা সিংকে দিয়ে গাড়িটা পাঠিয়ে দিতে হবে। মঁসিয়ে লার একটা অস্টিন টুরার গাড়ি আছে, একান্ত প্রয়োজন হলে সেটাই সে মঁসিয়ের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে পারবে। গাড়ির জন্য বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না।

BanglaBook.org

সুব্রত শশাংকর কথাই ভাবতে থাকে। শশাংক আচম্‌কা এমনি বসন্তের আশ্রয়ে গিয়ে ভুল করলো কিনা তাই বা কে জানে! সে তার কাকা ডাঃ অজয় মিত্রের বন্ধু সুনীল করের দৃষ্টান্ত দেখে বোধ হয় এখন কাউকেই আর বিশ্বাস করতে পারছে না। সুব্রতর কাছে যতটুকু মুখ খুলেছে, সেও একান্ত দায়ে পড়েই। এটা বুঝতেও সুব্রতর কষ্ট হয় না।

এখনো সে নিজেকে একটা রহস্যের কালো কাপড়ে যেন ঢেকে রেখেছে। তাছাড়া ঐ 'নেকড়ের থাবা' নামটা সুব্রতর একেবারে অপরিচিত নয়। দু-চারজন পুলিস বন্ধুর মুখেই শুনেছে সুব্রত যে, 'নেকড়ের থাবা' একটা সম্প্রদায় বা দল। যাদের এ দুনিয়ায় কোনপ্রকার শয়তানী বা দুষ্কর্মই বাধে না। নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে এরা সামান্য মাত্রও দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করে অন্যের বুকে ছুরি বসাতে পারে, এবং ঐ দলের যে কর্তা, বহুদিন হতে তার নাম পুলিসের গোপন ফাইলে থাকলেও আজ পর্যন্ত তাকে ধরতে বা ছুঁতে তো পারেইনি, এমন কি লোকটার আসল ও সত্যিকারের Identity-টা পর্যন্ত জানা যায়নি। এত দিনে কি তাহলে সেই দলটির মুখোমুখি সুব্রতকেই দাঁড়াতে হলো!

নানা চিন্তা সুব্রতর মাথার মধ্যে এসে ভিড় করতে থাকে।

ওদিকে বসন্ত-ভবনে দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর শশাংক বেশ একটা লম্বা টানা নিদ্রা দিল।

গত রাত্রির জাগরণে ও দৌড়ঝাঁপ করে শরীরে অনেকখানি ক্লান্তিই জমা হয়ে উঠেছিল, দীর্ঘ নিদ্রায় সে ক্লান্তিটা এখন অনেকটা দূর হলো। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিল শশাংক।

ইতিমধ্যে শীতের বেলা ঝিমিয়ে এসেছে, পড়ন্ত আলো জানাচ্ছে সূর্যাস্তের আসন্ন ইঙ্গিত। শশাংক শয্যার উপর উঠে বসল। এবার এক কাপ চা হলে মন্দ হতো না।

কাকাবাবু সেই দুপুরেই কলকাতায় চলে গেছেন, ভানুদেব একাই আছেন বাড়িতে। শশাংক ঘর থেকে বের হয়ে বঙ্কিমকে ডেকে এক কাপ চা দিতে বলল।

কিছুক্ষণ পরে বঙ্কিম চা এনে দিলে চা পান করতে করতে শশাংক ভাবতে থাকে, এখন সে কি করবে? এখানেই দু-চার দিন থাকবে, না কলকাতাতেই ফিরে যাবে! কিন্তু সেখানে ফিরে যাওয়া মানেই তো আবার সেই দুর্ধর্ষ নেকড়ের থাবার দলের সম্মুখীন হওয়া।

রাত্রি ন'টা হবে। কলকাতা থেকে এদিকে শীতের প্রকোপটা যেন একটু বেশীই বলে মনে হয়। এই একটু আগেই আহার-পর্ব শেষ হয়েছে।

উপরে এসে শশাংক তার নির্দিষ্ট দোতলার ঘরে ঢুকে সুইচ্ টিপে আলোটা জ্বালল। হঠাৎ আলো জ্বালতেই নজরে পড়ল তার গঙ্গার দিক্‌কার জানলাটা খোলা অথচ জানলাটা তো শশাংক বন্ধ করেই গিয়েছিল নীচে যাবার সময়! খোলা জানলাপথে শীতরাত্রির ঠাণ্ডা হাড়-কাঁপানো হাওয়া হু হু করে এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে!

বেশ একটু আশ্চর্য হয়েই শশাংক এগিয়ে যায় জানলাটা বন্ধ করতে। ঠিক এমন সময় খুট্ করে একটা মৃদু শব্দ ও সেই সঙ্গে ঘরের বৈদ্যুতিক বাতিটা নিবে গেল ও নিশ্ছিদ্র আঁধারে ঘরখানি অবলুপ্ত হয়ে গেল মুহূর্তে।

চম্‌কে শশাংক ফিরে দাঁড়ায়। এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভারী চাপা একটা কণ্ঠস্বর শোনা যায়, ব্যস্ত হবেন না মিঃ মিত্র। আলোটা আমিই নিবিয়ে দিলাম। আপনার ঘরের ঠিক নীচেই বাগানে মেহেদীর ঝাড়ের কাছে একজোড়া অনুসন্ধানী দৃষ্টি এদিকে বোধ হয় এখনও তাকিয়ে আছে।

BanglaBook.org

শশাংকর মনে হয় গলার স্বরটা বেশ ভারী-ভারী। আবার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, শশাংকবাবু—আপনি বোধহয় ভয় পেয়েছেন! ভয় পাবেন না—আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী, আপনাকে অবশ্যম্ভাবী একটা গুরুতর বিপদ থেকে রক্ষা করতেই এইভাবে বিনানুমতিতেই এখানে আসতে কতকটা আমি বাধ্য হয়েছি।

আপনি! কেবল একটি মাত্র শব্দই উচ্চারিত হয় শশাংকর কণ্ঠ থেকে।

অন্ধকারে মৃদু হাসির একটা শব্দ পাওয়া গেল, জানতে চান আমি কে? তাই না? কিন্তু এই মুহূর্তে আমার পরিচয় আপনাকে আমি দিতে পারছি না বলে দুঃখিত। তবে এইটুকু আপনি জেনে রাখুন ও আমার কথায় বিশ্বাস করুন, আমি যেই হই না কেন—আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী। আপনার মঙ্গলই চাই আমি।

কিন্তু—

কথাটা আমার বিশ্বাস করতে পারছেন না শশাংকবাবু, না?

না—মানে—

শুনুন। যে জন্যে আমি বিশেষ করে এসেছি। এই মুহূর্তে এখুনি আপনাকে যেমন করেই হোক এ বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র কোথাও চলে যেতে হবে। যে মূল্যবান কাগজগুলো এখন আপনার হাতে আছে যেমন করেই হোক সেগুলো আপনাকে রক্ষা করতেই হবে। আর সর্বদা একটা কথা মনে রাখবেন—যারা আপনার কাছ থেকে ঐ কাগজগুলো নেবার চেষ্টা করেছে, তারা আপনার চাইতে ঢের বেশী বুদ্ধিমান ও কৌশলী ও চতুর। তাছাড়া তাদের অসাধ্য কিছুই নেই। হ্যাঁ আর একটা কথা, হাঁটাপথে কিন্তু যাবেন না, জলপথে যাবেন। আমার যতদূর মনে হয়, জলপথে বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই। বিপদে ধৈর্য হারাবেন না কিছুতেই। তাছাড়া মনে রাখবেন ডাঃ মিত্রের সমস্ত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা আপনার হাতে। আচ্ছা শুভরাত্রি।

অন্ধকারে যেন গলার শব্দটা কোথায় হারিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিলীয়মান পায়ের শব্দও পাওয়া গেল একটা। শশাংক শুধু বিস্মিতই নয়, বিমূঢ়!

কি হবে আর আলো জ্বেলে! সত্যিই যদি আগন্তুকের কথাগুলো সত্যি হয়, তা'হলে যারা এখনো হয়ত বাগানের মধ্যে লুকিয়ে আছে, তাদের সুবিধাই হবে ঘরে আলো জ্বালা থাকলে।

কিন্তু কে এই অচেনা আগন্তুক! ওর কথাবার্তায় স্পষ্টই তো বোঝা গেল, শশাংকর সমস্ত সংবাদই সে রাখে। সত্যি হয়ত তার সতর্কবাণী মিথ্যা নয়। একান্ত অস্থির পদে শশাংক ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করে।

কি করা উচিত এখন! পালাবে সে নাকি! না এও কোন বিপক্ষ দলেরই চক্রান্ত তাকে বিপদের বেড়াজালের মধ্যে কৌশলে টেনে নিয়ে যাবার! সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।... শশাংকর চিন্তাজাল ছিন্ন করে সহসা এমন সময় অতর্কিতে রাত্রির নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ হয়ে গেল। দুম্ দুম্ করে পর পর দু'টো পিস্তলের আওয়াজ শোনা গেল এবং সেই সঙ্গে শোনা গেল একটা আর্ত করুণ চীৎকার।

BanglaBook.org

॥ ১২ ॥

বাইরের হিমঝরা অন্ধকার রাতকে তীক্ষ্ণ ধারালো একটা শব্দের চীৎকার চিরে দিয়ে, পিস্তলের গুলির আওয়াজটা নিস্তব্ধতার অতল সমুদ্রে আবার তলিয়ে গেল যেন।

বিমূঢ় শশাংক আচমকা একটা বৈদ্যুতিক শক্ খাওয়ার মত কয়েকটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো অন্ধকার ঘরের মধ্যে। আর ঠিক সেই সময় ওর কানে এলো বাইরে থেকে ভানুদেবের গলার স্বর, বঙ্কিম! এই বঙ্কিম!

ওদিকে ততক্ষণে বাইরের সিঁড়ি ও বারান্দার আলোটা জ্বলে উঠেছে।

কয়েকটা দ্রুত পদশব্দ শোনা যায়। আর দেরি করা উচিত নয়। মুহূর্তে শশাংক তার বর্তমান পরিস্থিতিটা চিন্তা করে নিল। আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। এবং কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শশাংক ক্ষিপ্রহাতে সামনের আলনা থেকে গায়ের গরম কোটটা গায়ে চাপিয়ে, জুতোটা পায়ে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল। বারান্দা বা সিঁড়িতে সে তখনও কাউকে দেখতে পেল না।

নীচের বারান্দার এদিকটা অন্ধকার। দ্রুতপদে অন্ধকার বারান্দাটা অতিক্রম করে শশাংক পিছনের দরজা দিয়ে একেবারে বাড়ির পশ্চাৎদিকে এসে পড়ল।

অন্ধকার রাত্রি। সামনেই কাঁচা অপ্রশস্ত একটা সড়ক। দু'পাশ ঘন আগাছায় ভরে উঠেছে। শশাংক সতর্ক অথচ দ্রুতপদে সেই পথটা ধরেই সামনের দিকে অন্ধের মত এগিয়ে চলে এবং একটু যেতেই একেবারে গঙ্গার কিনারা পাওয়া গেল।

গঙ্গায় তখন ভাঁটা শুরু হয়েছে, নরম পলিমাটি জাগিয়ে জল অনেকটা নীচের দিকে নেমে গেছে। নরম কাদার ওপর দিয়েই গঙ্গার ধার ঘেঁষে শশাংক অগ্রসর হয়।

সুব্রতর কেন যেন ধারণা হয়েছিল, সামনে যে রাত্রিটা ঘনিয়ে আসছে সেটা একেবারে নির্বিবাদে কাটবে না। শশাংকর মাথার উপরে বিপদের কালো মেঘ একটা ঘনিয়ে যে আসছে সেটা যেন তার মনই বার বার বলছিল। তাই আহারাদি সেরে রাত ন'টা বাজবার আগেই হোটেল থেকে বের হয়ে সুব্রত সেই রাত্রে বসন্ত-ভবনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল।

বসন্ত-ভবনের সামনে এসে দেখল লোহার গেটটা খোলা। গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে সুব্রত যেমন নীচের বারান্দায় এসে উঠেছে সেও শুনতে পায় পিস্তলের আওয়াজ ও সেই সঙ্গে আর্ত চীৎকার একটা।... কিন্তু অন্ধকারে আচমকা পিস্তলের আওয়াজটা ঠিক কোন্ দিক থেকে যে এল সুব্রত ঠাহর করে উঠতে পারে না প্রথমটায় এবং সেই সঙ্গে মানুষের কণ্ঠের সেই আর্ত চীৎকারটাও বুঝতে পারে না ঠিক কোন্ দিক থেকে এল।

সুব্রত অন্ধকার বারান্দায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ওদিকে ভানুদেবের গলা শোনা যাচ্ছে, বেটা পাজী হতভাগা উল্লুক!... এতক্ষণে নিদ্রা ভাঙল! কালঘুম ঘুমোচ্ছিলি বেটা, না!... যা, দৌড়ে গিয়ে আমার ঘর থেকে বড় টর্চবাতিটা নিয়ে আয়। বাগানটা একবার দেখতে হবে।

উপরে কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না! কে যেন মনে হচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসছে! চট্ করে সুব্রত একপাশে সরে দাঁড়াল।

সত্যিই! কে যেন সিঁড়ি দিয়ে অত্যন্ত দ্রুতপদে নামছে। অন্ধকারে সিঁড়িপথে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি।... এত দ্রুত ও ক্ষিপ্রপদে নেমে আসছে যে মনে হয় ভর করেছে!

কাছাকাছি আসতেই অন্ধকারেও সুব্রতর চিনতে কষ্ট হয় না, লোকটা শশাংক।... কোথায় যাচ্ছে শশাংক এ সময়?... অমন করে উঠি-কি-পড়ি করে ছুটে পালাচ্ছে কেন ও? সুব্রত কিছুটা দূরত্ব বাঁচিয়েই শশাংককে অনুসরণ করে। স্পষ্ট ও শুনতে পাচ্ছে পায়ের শব্দ। তাই অন্ধকারে দেখতে কিছু না পেলেও ভুল হয় না ওর।

BanglaBook.org

ঠিক পদশব্দ অনুসরণ করে চলে। কিন্তু কিছুদূর অনুসরণ করে আর তো সে পদশব্দ শোনা যাচ্ছে না! উঃ! কি অন্ধকার! নীরন্ধ্র অন্ধকারে পৃথিবী যেন একেবারে মুছে গেছে। এক হাতের মধ্যেও দৃষ্টি চলে না। নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে শুধু ভাঁটার গঙ্গার কলকল ছলছল স্রোতধ্বনি যেন ক্লান্ত নিশীথিনীর শিথিল নূপুরনিক্কণ তুলে চলেছে একটানা।

নরম কাদার ওপর দিয়ে অনেকটা পথ দ্রুত হেঁটে এসে, শশাংক হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছনে একটা স্পষ্ট পদশব্দ শুনতে পেয়েছে ও। নিশ্চয় কেউ তাকে অনুসরণ করছিল। কিন্তু কই এখন তো আর পদশব্দ শোনা যাচ্ছে না!

তবে কি তার শোনবার ভুল? কেউ তাকে অনুসরণ করেনি? মিথ্যে সে মনে করছে কেউ তাকে অনুসরণ করছে? থমথমে একটা স্তব্ধতা চারিদিককার হিমশীতল অন্ধকারে।

গঙ্গাবক্ষ হতে বয়ে আসে ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়া।। অদূরে একটা ছপ্ ছপ্ শব্দ শোনা গেল। নৌকার দাঁড়টানার শব্দ। শব্দটা এদিকেই এগিয়ে আসছে না! হ্যাঁ, তাই তো!

শশাংক আরো একটু জলের দিকে নেবে গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকাল। হ্যাঁ, সত্যিই একটা নৌকা এদিকেই আসছে। নৌকার ভিতরের আলোটা ক্ষীণ মৃদু মৃদু কাঁপছে। অন্ধকারের বুকে যেন একটা আলোর ফুলকি দুলছে।

নৌকাটা আরও কাছে এলো। আলোটা আরো স্পষ্ট হয়।

মাঝি! ও মাঝি!... শশাংক জলের মধ্যে নেবে গিয়ে ডাকে।

নিশ্চয়ই কোন মহাজনী নৌকা। কলকাতার দিকেই চলেছে। অনায়াসেই কিছু বকশিশ দিয়ে ঐ নৌকায় চেপে কলকাতায় পৌঁছে যাওয়া যাবে। তারপর কলকাতায় একবার পৌঁছালে, অনেক পথ খোলা আছে এগুবার জন্যে।

শশাংক আরো একটু জলের দিকে নেমে গিয়ে এবার বেশ জোর গলায় ডাকল, মাঝি! অ নৌকার মাঝি! আমায় তুলে নেবে? একবারটি পারে ভিড়াও না।

কে গো, কে ডাকে? নৌকা থেকে এবার সাড়া আসে ভারী গলায়।

মাঝি, এদিকে! এই যে পাড়ে!

নৌকাটা আরো কাছে এল, কে? কোথায়?

এই—এই যে আমি—আর একটু এগিয়ে এসো।

দাঁড়াও গো, যাচ্ছি।

জল ভেঙে শশাংক গিয়ে নৌকার সামনে দাঁড়াল। ছোট সাইজের একটা পানসী নৌকা, কোন মাল নেই—একেবারে খালি। দু-তিনজন লোক নৌকার পাটাতনে দাঁড়িয়ে।

মাঝি, কোথায় চলেছ তোমরা? কোন্ দিকে?

কলকাতায় যাব বাবু। মাল নিয়ে এসেছিলাম এদিকে। ফিরে চলেছি। মাঝি জবাব দেয়।

আমায় কলকাতায় পৌঁছে দেবে? যা চাও ভাড়া দেবো!

নেব না কেন! আসেন না খালি নৌকাই তো নিয়ে যাচ্ছি। মাঝি জবাব দেয়।

কত নেবে?

যা হয় কিছু ধরে দেবেন বাবু। এমনিই তো ফিরে যাচ্ছিলাম।

মাঝি নৌকাটাকে আরো একটু কিনারে নিয়ে আসে। শশাংক কোনমতে উঠে পড়ে নৌকায়।

লগির ধাক্কায় নৌকাটা আবার গভীর জলে চলে যায়। তরতর করে ভেসে চলে। পাল তুলে দেওয়া হয়।

BanglaBook.org

এক সময় মাঝি প্রশ্ন করে, তামুক ইচ্ছা করেন কি বাবু?

না, তামাক আমি খাই না।

তা এদিকে কোথায় এসেছিলেন বাবু?

সে আর বলো না দুর্ভোগের কথা। একদল বন্ধু মিলে চন্দননগরে এসেছিলাম পিক্‌নিকে। সন্ধ্যার আগে নদীর ধার দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে অনেকটা চলে গিয়েছিলাম। ফিরতে রাত্রি হয়ে গেল। ফিরে দেখি বন্ধুরা চলে গেছে নৌকা ছেড়ে।

আহা! দেখুন তো বাবু খামকা কষ্টটা হলো আপনার।

হ্যাঁ, দুর্ভোগ আর কি। শশাংক জবাব দেয়।

খোলা গঙ্গাবক্ষের শীতল হাওয়ায় শশাংকর কেমন শীত-শীত করছিল। শশাংক মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে।

মাঝি বলে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় নিশ্চয়ই শীত করছে বাবু। যান না ভিতরে গিয়ে বসুন—ছইয়ের মধ্যে গরম হবে।

শশাংক মাঝির প্রস্তাবটা অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তেই গ্রহণ করে। মুহূর্তমাত্রও আর দেরি না করে ভিতরে গিয়ে ঢোকে। ঢুকে দেখলো একটা লোক কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে সেখানে।

শশাংক ভাবছিল ঃ ঘটনাস্রোত তাকে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে কোন্ অজানার আবর্তে! তিনটে দিন ধরে মাথার উপর দিয়ে কি ঝড়টাই না বয়ে চলেছে! বেশী করে মনে পড়েছে বলদেব কাকাকেই; এই বিপদে একমাত্র তিনিই তাকে সৎ পরামর্শ দিতে পারতেন, কিন্তু শত্রুহস্তে তিনিও আজ নিষ্ঠুরভাবে নিহত। হয়ত বলদেব কাকা এ সম্পর্কে অনেক কথাই জানতেন। মৃত্যুর আগের দিন সকালে আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাসায় বলদেব কাকা যখন দেখা করতে এসেছিলেন, তখন বিশেষ কোন কথাই হলো না। কথা ছিল এতটুকু কোন প্রয়োজন হলেই যেন সে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে। কোন প্রকার ইতস্ততঃ বা সংকোচ না করে। হঠাৎ মনে পড়ে সঙ্গের লেফাপাটার কথা। যে জন্য এত বিভ্রাট! এত হুজ্জোত!

শশাংক একবার বুক-পকেটে হাত বুলিয়ে দেখে নেয়, না, লেফাপাটা ঠিকই আছে। আঃ! একটা স্বস্তি বোধ করে ও। ছইয়ের মধ্যে পার্টিশন তুলে দুটো খুপরির মত। মাঝখানে একটা দরজা। তারই সামনেরটায় বসে শশাংক। চারিদিক ঢাকা জায়গায় এখন আর ততটা শীত-শীত বোধ হয় না। তবে বেড়ার ফাঁকে-ফাঁকে খোলা গঙ্গাবক্ষের হিমশীতল হাওয়া মধ্যে মধ্যে ছুঁচের মত যেন এসে গায়ে বেঁধে। নতুন করে আবার শশাংকর সুব্রতর কথা মনে পড়ে।

সুব্রতকে সে কেবল এড়িয়ে চলছে। হয়ত সুব্রতবাবু সত্যিই তার হিতাকাঙ্ক্ষী—গত আটচল্লিশ ঘণ্টা সুব্রতবাবু তার পাশে পাশে না থাকলে, তার যে কি বিপদ হতে পারত না, ভাবতেও শশাংকর গা'টা শিউরে ওঠে। আশ্চর্য! কেন যে শশাংক সুব্রতবাবুকে বিশ্বাস করতে পারছে না এবং সব কথা সুব্রতবাবুকে অকপটে খুলে বলার মধ্যে শঙ্কাটাই বা কোথায়, তাও বুঝে উঠতে পারে না। অথচ—

॥ ১৩ ॥

শশাংকবাবু?

হঠাৎ এমন সময় একটা অপরিচিত কণ্ঠস্বরে শশাংকর ঘন চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল।

BanglaBook.org

কে? চম্‌কে ফিরে তাকাল পশ্চাতে শশাংক।

অরিন্দম সরকারকে নিশ্চয়ই এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাননি শশাংকবাবু? পরিপূর্ণ ব্যঙ্গে কথাগুলো উচ্চারিত হলো।

নৌকায় ছইয়ের মধ্যে ঢুকেই যে দেখেছিল ও একপাশে কে একজন একটা কলো ভারী মোটা কম্বলে আপাদমস্তক ঢেকে নিঃসাড়ে পড়েছিল, সেই কম্বলটা ঠেলেই হঠাৎ যে কখন সেখানে শ্রীযুক্ত অরিন্দম সরকারের অচিন্তনীয় আবির্ভাব ঘটেছে তা শশাংক বুঝতেও পারেনি। এবং শুধু তাই নয়, নিজের চিন্তায় ও ঘটনার সংঘাতে সে এত আত্মসমাহিত ছিল যে আচমকা কম্বলের তলা থেকে ঐভাবে অরিন্দমের আবির্ভাবে কয়েকটা মুহূর্তের জন্য যেন ও বোবাই হয়ে যায়। মুখ দিয়ে একটা কথাও সরে না ওর।

কেবল বিস্মিত বিমূঢ় শশাংক অরিন্দমের মুখের দিকে বোকার মতই তাকিয়ে থাকে।

নৌকার ছইয়ের মধ্যে একটা কালিপড়া ধুমোদ্‌গীরণকারী আলো জ্বলছে, তারই আবছা আলোয় অরিন্দম সরকারের দু'চোখের দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়েছে। রাতের অন্ধকারে যেন শার্দুলের চোখের মত জ্বলছে তার চোখ দু'টো একটা বন্য ক্ষুধায়। পুরু ওষ্ঠে চাপা হাসি। দু'হাতের ওপরে ভর দিয়ে ঝুঁকে বসেছে অরিন্দম সরকার।

শশাংকবাবু! বুঝতে পারছি, নিশ্চয়ই একেবারে অবাক হয়ে গেছেন এই অবস্থায় নৌকার মধ্যে আমায় দেখে; তাই না? আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অনুমান করেই আগে থাকতে জাল পেতেই রেখেছিলম, স্থলপথে ও জলপথে দু'জায়গাতেই। কারণ ভেবেছিলাম হাঁটা বা জলপথে যে কোন একটায় আপনাকে ফিরতে হবেই। যাহোক, শ্রমটা একেবারে ব্যর্থ যায়নি দেখছি, আর অনুমানও ভুল হয়নি। কিন্তু যাক্, বাজে কথা থাক। আমার শেষ offer আপনাকে দিচ্ছি, এখনো আমাকে বিশ্বাস করুন। আমার সঙ্গে হাতে হাত মিলান। বিশ্বাস করুন আমাকে, আমি সত্যি আপনার ভালটাই চাই। আসুন—আমার হাতের সঙ্গে যদি হাত মেলান তো আধাআধি বখরা। তাছাড়া এও ভেবে দেখুন, আপনার কাকা ডাঃ মিত্র আর বেঁচে নেই—তাঁর একস্‌পেরিমেন্টের কপির যে অংশটা আপনার কাছে আছে, সেটা বাকি অংশ ছাড়া আপনার কোন কাজেই আর লাগছে না অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি অন্য অংশটি পাচ্ছেন। এবং সেই অংশ ছাড়া আপনার অংশের কপিরও কোন মূল্যই নেই। অবশ্য আপনার কাকা ডাঃ মিত্র বেঁচে থাকলে আজ অন্য কথা ছিল। তাছাড়া শুধু এই দিকটাই নয়—এর আরো একটা দিক ভাবেননি হয়ত আপনি। ঐ কপির জন্য প্রতি মুহূর্তে আপনার জীবন বিপন্ন হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরো বেশী করে হবে। যে কোন মুহূর্তে আপনার জীবনের ওপর আচম্‌কা চরম দুর্ঘটনা এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত আসতে পারে। 'নেকড়ের থাবা'র দল যখন একবার আপনার পিছনে লেগেছে, নিশ্চয় জানবেন তারা এর শেষ না দেখে ছাড়বে না। তা'ছাড়া অত বড় একটা দুধর্ষ দলের সঙ্গে আপনি একা একা কতদিন এমনি করে প্রতি মুহূর্তে জীবনকে বিপন্ন করে যুঝবেন? তাই বলছিলাম আসুন সামঞ্জস্য রেখে একটা মিট্‌মাট করে ফেলা যাক। আমার পূর্ব প্রস্তাবে যদি না রাজী থাকেন তবে আসুন আপনাকে নগদ ২৫ হাজার টাকাই দিচ্ছি, আপনার কপিটা আমাকে দিন। কি বলেন, রাজী?

না। এতক্ষণে শশাংক কথা বলে।

রাজী নন?

না।

বেশ। আরো না হয় টাকার অংশটা কিছু বাড়িয়ে দেওয়া যাবে, ত্রিশ হাজারই দেবো, এবারে রাজী তো?

BanglaBook.org

না।

পঁয়ত্রিশ?

না।

চল্লিশ?

না।

পঁয়তাল্লিশ?

না।

তাতেও না? বেশ ? পঞ্চাশ হাজারই পাবেন।

লক্ষ টাকায়ও দেবো না! কঠিন দৃঢ় কণ্ঠে এবারে শশাংক জবাব দেয়।

কয়েকটা মুহূর্ত অতঃপর অরিন্দম সরকার শশাংকর মুখের দিকে যেন অতীব বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। মৃদু শান্ত কণ্ঠে বলে, লক্ষ টাকার বিনিময়েও দেবেন না?

না।

মিথ্যে বোকার মত গোঁয়ার্তুমি করবেন না শশাংকবাবু, আমি আবার বলছি, এখনো ভাল করে ভেবে দেখুন আমার অফার—পঞ্চাশ হাজার টাকা ছেলে-খেলা নয়।

আপনি ভুল করছেন মিঃ সরকার। টাকার অভাব আমার নেই। শশাংক জবাব দেয়।

টাকার অভাব আজ আপনার নেই বটে, কাল যে হবে না কে বলতে পারে? তাছাড়া যে কাগজটার কোন মূল্যই নেই, তার বিনিময়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাচ্ছেন তাও একবার ভেবে দেখেছেন কি?

বললাম তো আপনাকে মিঃ সরকার, লক্ষ টাকার বিনিময়েও আমি রাজী নই।

বেশ। ভেবেছিলাম ভদ্র সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে আমরা পরস্পরের নিকট হতে বিদায় নিয়ে যাবো। তা যখন আপনার ইচ্ছা নয়...বাঁকা পথেই তাহ'লে আসুন—বলতে বলতে চকিতে অরিন্দম সরকার তার ডান হাতটা সামনের দিকে তুলে ধরে উদ্ধত ভঙ্গীতে।

মৃদু হ্যারিকেনের আলোয় অরিন্দম সরকারের হাতের পিস্তলটা ঝক্ ঝক্ করে ওঠে যেন মৃত্যুক্ষুধায়।

এবার লক্ষ্মী সুবোধ ছেলের মত বের করুন দেখি আপনার সেই একস্‌পেরিমেন্টের কপিটা চট্‌পট্!

শশাংক উদ্ধত পিস্তলের সামনে স্থাণুর মতই যেন বসে থাকে। একটি শব্দও কণ্ঠ হতে বের হয় না। ঘটনার আকস্মিকতায় ও যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ সেই মুহূর্তে ঠং করে একটা শব্দ শোনা যায় ও সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে অরিন্দম সরকার নৌকার পাটাতনের উপরে লুটিয়ে পড়ে।

তারপরই অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কে একজন পশ্চাৎ দিক হতে জ্ঞানহীন অরিন্দম সরকারের নাকের উপরে একটা উগ্র অথচ মিষ্ট গন্ধযুক্ত রুমাল চেপে ধরে। এত আচমকা পর পর ব্যাপার দুটো ঘটে যায় যে প্রথমটায় শশাংক যেন একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়ে। এবং পরমুহূর্তেই বলতে গেলে শশাংকর বিহ্বলতা কাটতেই ও চেয়ে দেখে অরিন্দমের আক্রমণকারী আর কেউ নয়, স্বয়ং সুব্রত।

বিস্মিত বিহ্বলকণ্ঠে শশাংক প্রশ্ন করে, একি সুব্রতবাবু আপনি!

চুপ!...আস্তে! এটা শত্রুপক্ষের নৌকা। এখুনি এই মুহূর্তে আমাদের এ নৌকা ছেড়ে পালাতে হবে। ভাল কথা, আপনি সাঁতার জানেন তো? চাপা সতর্ক কণ্ঠে সুব্রত প্রশ্ন করে।

BanglaBook.org

জানি, কিন্তু খুব ভাল নয়।

তাতেই চলবে। অরিন্দমকে ক্লোরোফরম্ দিয়েছি, ঘণ্টা দুয়েকের আগে ওর জ্ঞান ফিরবে না। আসুন পিছনের ঐ ঝাঁপ তুলে আমাদের নৌকার বাইরে যেতে হবে। Hurry up! বলতে বলতে সুব্রত ঝাঁপটা তুলে এগিয়ে যায়।

কলের পুতুলের মতই শশাংক সুব্রতর নির্দেশ মেনে তার পিছনে পিছনে ঝাঁপের তলা দিয়ে নৌকার পশ্চাতে এসে অন্ধকারে দাঁড়াল নীচু হয়ে।

সামনেই কয়েকটা বস্তা জড়ো করে রাখায় তার ওদিকে হালে বসে মাঝি অন্ধকারে ওদের দেখতে পায় না। তাছাড়া পরম নিশ্চিন্ততায় তার বোধ হয় ততক্ষণে গঙ্গার হাওয়ায় দু'চোখে ঘুমও এসে গিয়েছিল। হালটা ধরে স্বাভাবিক ধরনেই সে বসে থাকে। এদিককার ব্যাপার কিছুই সে টেরই পায় না।

ওদিকে ততক্ষণে চুপি চুপি অন্ধকারে নৌকার পাশে ঝুলানো তক্তাটার পাশ দিয়ে দড়ি ধরে ঝুলে প্রথমে সুব্রত তারপর শশাংক জলের মধ্যে নেমে পড়ে। নৌকা তখন চলেছে প্রায় মাঝগঙ্গা দিয়ে। আশেপাশে ঘোর অন্ধকার, কিছুই প্রায় চোখে পড়ে না।

মাথার উপরে অন্ধকার পটভূমিকায় হাজার তারকার মৃদু আলোর স্পন্দন। গঙ্গার কালো জলে তারই ছায়া কাঁপছে দুলছে। নৌকার মধ্যে কেউই ওদের লক্ষ্য করে না। আপন মনেই নিশ্চিন্তে তারা নৌকা বেয়ে চলে।

এদিকে শীতের রাত্রে ঠাণ্ডা জলে হাত পা যেন অবশ হয়ে আসে ক্রমশঃ শশাংকর। নিঃশব্দে দু'জনে অন্ধকারে গঙ্গার জলে সাঁতার কেটে চলে। নৌকাটা এগিয়ে যায়—ওরা পিছিয়ে পড়ে।

আর কত দূর সুব্রতবাবু? মৃদু কণ্ঠে শুধায় শশাংক কোনমতে মাথাটা তুলে।

ঐ তো পাড় দেখা যাচ্ছে। চলুন হাত টেনে চলুন। উৎসাহ দেয় সুব্রত।

সহসা ঐ সময় অগ্রগামী নৌকাটায় একটা অস্পষ্ট কোলাহল শোনা গেল।

আরে ও মিঞা—সর্বনাশ হয়েছে, লোকটা পাইলেছে! আর ওদিকে কর্তা বোধ হয় খুন হয়েছেন! একটা উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

সর্বনাশ! ওরা টের পেয়েছে! চলুন, জোরে হাত টানুন! সুব্রত শশাংককে বলে।

সুব্রত আরো দ্রুত সাঁতরে চলে।

কিন্তু অনভ্যস্ত শশাংক সত্যিই আর পারছে না। একে ঠাণ্ডায় হাত পা জমে আসছে তার উপরে অন্ধকারে আশেপাশে কিছুই যে সে দেখতে পাচ্ছে না।

কিন্তু আমি যে আর পারছি না সুব্রতবাবু। ক্লান্ত শশাংক জবাব দেয়।

নৌকার গোলমাল আরো বাড়ছে তখন। আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

কোন্ দিকে গেল হুমুন্দির পো!...পূর্বের গলাটা আবার শোনা গেল।

একটা তীব্র জোরালো টর্চের আলো অন্ধকার গঙ্গাবক্ষকে আলোকিত করে তোলে।

ডুব দিন! ডুব দিন! সুব্রত চাপা সতর্ক কণ্ঠে বলে।

কিন্তু সুব্রতর কথা শেষ হবার আগেই, টর্চের জোরালো অনুসন্ধানী আলোক রশ্মির মধ্যে শশাংক ধরা পড়ে। এবং পরক্ষণেই আলোটা নিবে যায়। পাড় আরি সামান্যই দূরে। তবে এখনো পায়ের তলে জমি পাওয়া যায়নি।

সহসা নিস্তব্ধ গঙ্গাবক্ষকে বিদীর্ণ করে প্রচণ্ড শব্দে একটা বন্দুকের গুলির আওয়াজ জেগে ওঠেঃ গুড়ুম!

BanglaBook.org

শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ভেসে যায় গঙ্গাবক্ষে।

আবার শব্দ ঃ গুড়ুম!

একটা আর্ত চীৎকার, বাবা গো!...

এ কি! এ যে শশাংকবাবুর গলা! তবে কি!—

জলের মধ্যে একটা আলোড়ন।

আলোড়নটা লক্ষ্য করে সুব্রত সঙ্গে সঙ্গে টুপ করে জলের তলে ডুব দেয়।

॥ ১৪ ॥

শশাংকর গলার শব্দ ও জলের বুকে আলোড়নের শব্দটা লক্ষ্য করেই সুব্রত জলে ডুব দিয়েছিল।

সাঁতারে অত্যন্ত পটু সে।

জলের মধ্যে খানিকটা এদিক ওদিক আন্দাজ করে ডুবে ডুবে খুঁজতেই সুব্রত হাতে কিসের যেন একটা স্পর্শ পায়। এবং পরক্ষণেই বুঝতে পারে সেটা কি। ক্লান্ত আহত নিমজ্জমান শশাংকর গায়ে কোটের কলারটা ধরে ফেলে।

এদিকে নৌকাটা এদিকেই চলে আসছে। আর বেশী দেরি করলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। পায়ের নীচে মাটিও ঠেকছে।

মুহূর্ত-মধ্যে সুব্রত নিজের কর্তব্য ঠিক করে নেয়, বাঁ হাত দিয়ে শশাংককে টেনে ধরে, ডান হাত দিয়ে পট্‌পট্ করে শশাংকর গায়ে কোটের বোতামগুলো খুলে ফেলে। এবং তাড়াতাড়ি হাতটা চালিয়ে বুক-পকেটের মধ্যে যেখানে জলসিক্ত লেফাপাটা ছিল, সেটা টেনে বের করে নেয় এবং শশাংককে জোরে আরো একটু ডাঙার দিকে টেনে এনে সেখানেই কাদার উপর ফেলে দিয়ে উঠে পড়ে। পিচ্ছিল কর্দমাক্ত তট।

নৌকাটা পাড়ের দিকে আরো এগিয়ে এসেছে। সুব্রত তখন মাটির উপরেই শুয়ে পড়ে দ্রুত গড়িয়ে গড়িয়েই সামনের দিকে চলে যায় যতটা পারে।

আবার ওদিকে গঙ্গাবক্ষে টর্চের সন্ধানী আলোর রশ্মিটা পড়েছে। আলোটার লক্ষ্য তখনও জলের মধ্যে। নিশ্চয়ই আহতের সন্ধান করছে ওরা।

গড়িয়ে গড়িয়ে আনেকটা এসে এবারে সুব্রত মাথাটা তোলে। সামনেই একটা ঘন শিয়ালকাঁটার ঝোপ।

সুব্রত কতকটা যেন একবারে মরীয়া হয়েই ঝোপের মধ্যে দেহটাকে ক্ষত-বিক্ষত করে ঢুকিয়ে দেয়। ততক্ষণে নৌকাটা এসে পাড়ের কাছে থেমেছে ও স্পষ্ট দেখতে পায়।

নৌকার পাটাতন থেকে চার-পাঁচজন লোক ঝপ্ ঝপ্ করে হাঁটুজলের মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। এবং তাদের উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর শোনা গেল, পেয়েছি মাঝি, হুমুন্দির পো পালাতে পারে নাই।

তাহ'লে আহত জ্ঞানহীন শশাংককে ওরা পেয়েছে। নিশ্চয়ই এবারে ওরা সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যাবে, সুব্রতর কথা ভাববে না।

সত্যই তাই হলো, শশংকর জ্ঞানহীন জল-সিক্ত দেহটা সকলে মিলে তুলে বহন করে নৌকায় নিয়ে গেল। তাড়াতাড়িতে সুব্রত বুঝতে পারেনি, শশাংকর কোথায় গুলি লেগেছে। ক্ষতস্থানটা মারাত্মক হয়েছে কিনা তাই বা কে বলতে পারে। জীবনে বেঁচে আছে কি না তাই বা কে জানে! কিন্তু ও সব কথা এখন ভেবেও কোন লাভ নেই।

BanglaBook.org

ওদিকে নৌকাটা ততক্ষণ আবার চলতে শুরু করেছে। আরামের ও স্বস্তির একটা নিশ্বাস নেয় সুব্রত যেন এতক্ষণে। নৌকার আলোটা গঙ্গার স্রোতের সঙ্গে দুলতে দুলতে ক্রমে দূরে আরো দূরে মিলিয়ে গেল।

আরো একটা কথা মনে হয় সুব্রতর ঐ সঙ্গে, নিশ্চয়ই ওরা জানতে পারেনি একটু আগের ঘটনার সঙ্গে সুব্রতর কোন যোগাযোগ ছিল। তা যদি হতো তাহলে এভাবে ওরা নিশ্চিন্তে শশাংককেই কেবল একা তুলে নিয়েই নিশ্চেষ্ট থাকতো না। সুব্রতর খোঁজ করতোই।

সুব্রত যে নিঃশব্দে সাঁতরে গিয়ে অন্ধকারে নৌকার মধ্যে উঠেছিল ওরা কেউই তাহলে এখনো জানতে পারেনি। এবং রিভলভারের বাঁটটা দিয়ে পিছন দিক হতে অরিন্দম সরকারের মাথায় আঘাত হানবার আগে পর্যন্ত অরিন্দমও জানতে পারেনি সুব্রতর অস্তিত্ব।

এ এক পক্ষে ভালই হলো।

মনে মনে সুব্রত একটু আগেকার আগাগোড়া সমগ্র ঘটনাটার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দেয়।

শেষ পর্যন্ত অমনি জানাজানি হয়ে গেলে ব্যাপারটা কতদূর গড়াতো তাই বা কে জানে। এবং শশাংকর মত গোঁয়ার একরোখা ছেলে যে সুব্রতর হাতে নিঃশঙ্কচিত্তে লেফাপাটা তুলে দিতো না এ বিষয়েও সুব্রত স্থির নিশ্চিন্ত।

শশাংক যদি বেঁচে থাকে তাহলে শত্রুপক্ষীয় লোকেরা শশাংকর সেবা-শুশ্রূষা ভাল করেই করবে। তারপর হয়ত দেখবে তার কাছে তাদের অভীষ্ট বস্তুটি নেই। তখনকার কথা সুব্রতর না ভাবলেও চলবে। ব্যাপার যখন তারা জানে না তখন ব্যাপারটা ধারণাও করতে পারবে না। অবিশ্যি অরিন্দমের জ্ঞান ফিরে এলে সে হয়ত এত সহজে সব মীমাংসা মেনে নেবে না। কিন্তু সে যাই হোক শশাংকর লেফাপাটা তার জিম্মায় রইল। সেটা তো আর ওরা পাচ্ছে না।

ভিজা জামা কাপড়ে উন্মুক্ত গঙ্গার হাওয়ায় কাঁপুনি লাগছে সুব্রতর। সুব্রত হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে শিয়ালকাঁটার ঝোপ থেকে বের হয়ে এসে গঙ্গার কিনারা ধরে এবার হাঁটতে শুরু করল সামনের দিকে। ঝোপের মধ্যে ঢুকবার সময় কাঁটায় হাত পা অনেক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। জ্বালা করছে।

চিন্তা অসংখ্য। একটার পর একটা কেবলই মাথার মধ্যে এসে ঘুরপাক খাচ্ছে। নৌকাটা কলকাতার দিকে পৌঁছবার আগেই সুব্রতকে কলকাতায় গিয়ে পৌঁছতে হবে তা সে যেমন করে হোক।

খানিকটা নদীর পাড় ধরে হেঁটে সুব্রত গিয়ে রাস্তায় উঠে চন্দননগর শহরের দিকে দ্রুতগতিতে হেঁটে চলে। রাত্রি প্রায় তিনটের সময় সুব্রত ক্লান্ত ঘর্মাক্ত হয়ে চন্দননগরের সেই হোটেলে এসে পৌঁছায়। তাড়াতাড়ি জামা কাপড় বদলিয়ে মঁসিয়ে লা'র গাড়িতে উঠে বসে স্টার্ট দেয়। পাকা সড়কে পড়ে সুব্রত গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দেয়। হু হু শব্দে গাড়ি কলকাতা অভিমুখে ছুটে চলে।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। বিলীয়মান রাত্রির শেষ মুহূর্তে জেগে উঠেছে অপূর্ব এক আলো-ছায়ার লুকোচুরি খেলা পূর্ব আকাশ জুড়ে। নির্জন রাস্তা যেন ঘুমন্ত অজগরের মত প্রসারিত সম্মুখে।

গাড়ির গতি বেড়ে চলে।

শশাংকর আঘাতটা তেমন খুব বেশী একটা কিছু হয়নি, বাঁ দিককার কাঁধের 'ডেলটয়েড' মাস্‌লে সামান্য একটু উণ্ড হয়েছে মাত্র গুলিতে। ভীত পরিশ্রান্ত শশাংক ঐ সামান্য আঘাতেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

BanglaBook.org

শশাংকর লুপ্ত জ্ঞান যখন ফিরে এল, নৌকা তখন ভাটির টানে ও অনুকূল বাতাসে কলকাতার মাইল দুয়েকের মধ্যে এসে গিয়েছে।

ক্লান্ত শশাংক চোখ মেলে তাকাল। কিন্তু প্রথমে ব্যাপারটা কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারে না।

কিসের সন্ধানে যেন এদিক ওদিক তাকায়। মাথাটার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করছে। স্মৃতিশক্তি এখনো এলোমেলো। চোখের পাতা আবার বুজে এল শশাংকর।

ভোর হতে যদিও আর খুব বেশী দেরি নেই, কিন্তু গঙ্গাবক্ষে শীতের ঘন কুয়াশা নেমে আসায় চারিদিক অস্পষ্ট ছায়াঘেরা। ধীরে ধীরে নৌকা এগিয়ে চলেছে মন্থর গতিতে কুঠীঘাটার দিকে। আর কিছুক্ষণ ঐভাবে চোখ বুজে পড়ে থাকবার পর আবার একসময় শশাংক চোখ মেলে তাকাতেই, অরিন্দম সরকারের গলাটা ওর কানে আসে, ওঠবার চেষ্টা করো না শশাংকবাবু!

শশাংক আদপেই ওঠবার কোন চেষ্টা করেনি, ওঠবার ক্ষমতাও ছিল না তার তখন। মাথার মধ্যে তখনো যেন সব ধোঁয়ার মত পাক দিয়ে ফিরছে।

কোথায় সে! একটু একটু করে অস্পষ্টভাবে সব মনের পাতায় ভেসে ওঠে। চন্দননগরের বসন্ত কাকার বাড়ি থেকে পলায়ন, গঙ্গার ধার দিয়ে হেঁটে এসে নৌকাতে ওঠা। অরিন্দম সরকার। হ্যাঁ, মনে পড়ছে সব।

অরিন্দম সরকার। চকিতে একবার অরিন্দম সরকারের অলক্ষ্যেই শশাংক জামার যে পকেটে লেফাপাটা ছিল, সেখান হাত বুলোতে গিয়ে বুঝতে পারে, গায়ে তার সে জামাটা নেই। সর্বনাশ! তবে কি লেফাপাটা ওদের হাতে পড়েছে নাকি! মাথাটা ঘুরে ওঠে শশাংকর।

অরিন্দম সরকার আবার কথা বলে, শোন শশাংকবাবু! এখনো বলছি, সেই একস্‌পেরিমেন্টের কপিটা পেলেই তোমাকে আমরা ছেড়ে দেবো। প্রাণের মায়া যদি কর তো এখনো বল সেটা কোথায় আছে? কোথায় রেখে এসেছো?

অরিন্দম সরকারের কথাগুলো শুনে এবারে শশাংকই যেন কেমন তাজ্জব বনে যায়। অরিন্দম সরকার কি এসব বলছে! লেফাপাটা ওরা তা'হলে পায়নি নাকি!

আশা করি আমার কথা তোমার কানে যাচ্ছে শশাংকবাবু! অরিন্দম আবার বলে।

কিন্তু হতভম্ব শশাংক তখন ভাবছে যে, লেফাপাটা ওদের হাতেই যদি না পড়লো, তবে গেল কোথায় সেটা! তবে কি গঙ্গার জলেই পড়ে গেল! সর্বনাশ! তাহলে এত শ্রম সব ব্যর্থ হল।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার শশাংকর মনে হয়, না! তাই বা কি করে হবে! সেটা তো কোটের বুক-পকেটেই ছিল!

সেখান থেকে তো সেটা পড়ে যেতে পারে না কোনমতেই! তবে? তবে গেল কোথায় সেটা! সম্ভব অসম্ভব নানা চিন্তা শশাংকর মনের মধ্যে ভিড় জমাতে থাকে। তবু একটা কারণে শশাংকর মনটা কতকটা যেন নিশ্চিন্ত হয়। শেষ পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে লেফাপাটা এদের হাতে পড়েনি। এরা সেটা পায়নি। কিন্তু সেটা তারও হাতে তো নেই! এবং সে কোনমতেই ভেবে ঠিক করে উঠতে পারছে না, সেটা তবে কোথায় গেল!

তবে লেফাপাটা বর্তমানে যেখানেই থাক না কেন, এদের কাছে শশাংক মুখ খুলবে না। অন্তত ওরা জানুক লেফাপাটা এখনো শশাংকর হেপাজতেই আছে।

ঐ সঙ্গে আরও একটা কথা মনে হয়, সুব্রতবাবুই বা কোথায়! তাকে নৌকার মধ্যে দেখছে না কেন! তবে কি সুব্রতবাবুর সংবাদ এরা এখনো পায়নি! নিশ্চয়ই সুব্রতবাবুকে এরা ধরতে পারেনি, না হলে তাকেও এখানেই দেখা যেত ওর পাশেই।

BanglaBook.org

সুব্রতবাবু নিশ্চয়ই তাহলে এদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় একটা কথা—আচ্ছা সুব্রতবাবুই লেফাপাটা নিয়ে যাননি তো! হতেও পারে। আঃ, তাই যদি হয়ে থাকে—

তাই যদি হয় তো এবার আর শশাংক সুব্রতবাবুকে অবিশ্বাস করবে না। নিঃশঙ্কচিত্তে সে তাঁর সকল পরামর্শ নেবে।

কিন্তু তা যেন হলো, এখন এদের হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যায়ই বা কি উপায়ে!

বেশ, আমার প্রস্তাবে যখন তুমি কোনমতেই রাজী নও তখন তার ফল ভোগ কর। বলতে বলতে হঠাৎ অরিন্দম সরকার তার পাশের লোকটিকে একটা চোখের ইঙ্গিত করল। সঙ্গে সঙ্গে সে ও অরিন্দম সরকার দু'জনে মিলে আগে একটা দড়ি দিয়ে শশাংকর হাত পা বেঁধে ফেলল, তারপর একটা রুমাল দিয়ে শশাংকর মুখটাও বেশ ভাল করে বেঁধে দিল। সম্পূর্ণভাবে শশাংক এখন এদের হাতে বন্দী। এমন কি চীৎকার করে কাউকে ডাকবারও উপায় এরা তার আর রাখল না।

শশাংককে ঐভাবে বন্দী অবস্থায় ফেলে রেখে অরিন্দম সরকার উঠে বাইরে গেল।

নৌকার বাইরে তার গলা শোনা গেল। সে যেন কাকে বলছে, বাগবাজারের ঘাটে নৌকা লাগাবে সোনাউল্লা। বিছানার সঙ্গে লোকটাকে বেশ করে জড়িয়ে ঢেকে নেবে, তারপর তিনজনে মিলে ধরে সাবধানে বিছানাটা লরিতে তুলে দেবে। কুয়াশা কাটতে এখনো ঘণ্টাখানেক দেরি। এত সকালে কারো চোখে পড়লেও কেউ কিছু বুঝতে পারবে না।

শশাংক বুঝতে পারে তাকে কোথাও চালান দেবার ব্যবস্থাই হচ্ছে নির্বিঘ্নে, সকলের অলক্ষ্যে। বিছানার মধ্যে জড়িয়ে। চমৎকার ব্যবস্থা! কোথায় নিয়ে যাবে তাকে এরা তাই বা কে জানে!

যা হবার তা হবে। শশাংক আর সত্যিই ভাবতে পারে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকা এসে নির্দিষ্ট ঘাটে ভিড়ল। এবং প্ল্যান্ মাফিক ওরা শশাংককে বিছানার সঙ্গে জড়িয়ে বেঁধে কাঁধের উপরে তুলে নিল। ঘাটের অনতিদূরে একটা ত্রিপল ঢাকা লরি দাঁড়িয়েছিল। ওরা শশাংককে বয়ে এনে লরির মধ্যে তুলে আবার বিছানা থেকে বের করে লরির পাটাতনের উপরে শুইয়ে দিল।

লরি চলতে শুরু করল।

দীর্ঘ পথ একটানা ছুটে এসে লরিটা এক জায়গায় থামল। এবং একটু পরেই জনতিনেক লোক এসে শশাংককে ধরে লরি থেকে নামাল। শশাংক এবার দেখলো তাকে বয়ে নিয়ে লোকগুলো একটা বাগানবাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল।

শশাংক তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চারিদিকে তাকায়। কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। কোথায় এ বাগান বাড়ি! আর কারই বা বাড়িটা কে জানে!

চারিদিকে বুনো আগাছা। সঙ্কীর্ণ পায়ে চলার পথ। দু'পাশে ঘন সন্নিবেশিত আম, কাঁঠাল, লিচু ও জাম গাছ। দিনের বেলাতেও কেমন যেন একটা চারিদিকে ছায়াচ্ছন্ন ছম্‌ছমে্ ভাব।

শিশির-ভেজা পাতার উপরে প্রথম সূর্যের আলো যেন পিছলিয়ে পড়ছে। ঝিরঝির করে শীতের হাওয়া বইছে।

মস্ত বড় বাড়িটা। তবে অযত্নে শ্রীহীন। বড় বড় দরজা জানালা সবই প্রায় বন্ধ। গাড়ি-বারান্দার এক কোণে একটা প্রাইভেট গাড়ি দাঁড়িয়ে। নম্বরটা ভাল করে তাড়াতাড়িতে সবটা

BanglaBook.org

দেখতে পারে না শশাংক। BLA 57...। মেরুন রংয়ের সেলুন বডি গাড়িটা ধূলায় ধূসারিত!

শশাংককে কাঁধে করে বয়ে এনে ওরা সেই বাড়ির মধ্যে একতলায় একটা হলঘরের মেঝেতে নামাল। ঘরের মধ্যে একটা চেয়ার। একপাশে একটা নেয়ারের পালঙ্ক। তার উপরে সতরঞ্চি পাতা, একটা দেওয়াল-আলমারি। ঘরের মধ্যে আর কোন আসবাবপত্র নেই।

লোকগুলো এবার শশাংকর পায়ের বাঁধন ও মুখের রুমাল খুলে সেই চেয়ারের উপরে তাকে বসিয়ে দিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল।

শশাংক ঝিম্ মেরে বোকার মতই চেয়ারটার উপরে বসে থাকে।

একটু পরে ঘরের বাইরে অস্পষ্ট একটা পদশব্দ শোনা যায়। এবং সঙ্গে সঙ্গেই অরিন্দম সরকার ও তার পশ্চাতে একজন আধা-বয়েসী বেঁটে মোটা লোক ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল। বেঁটে লোকটার মাথার সম্মুখভাগে চক্‌চকে মসৃণ একখানি টাক। পাকানো এক জোড়া গোঁফ। ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি। কাঁচায় পাকায় মেশানো। বর্তুলাকার দুটি চক্ষু। অক্ষি-গোলক দু'টি খরসন্ধানী। এই বেঁটে লোকটি কে? বসন্ত হলে শশাংককে না চেনার কথা নয়। পরিধানে দামী শান্তিপুরী ধুতি ও ভায়লার অ্যাশ কালারের পাঞ্জাবি। পায়ে সাদা জুতো।

বেঁটে লোকটি ঘরে ঢুকেই প্রথমে কয়েকটা মুহূর্ত যেন তার দু'চোখের তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে শশাংকর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে মৃদুস্বরে অরিন্দমকে লক্ষ্য করে বলল, হুঁ! এই ছোকরার নামই শশাংক মিত্তির! অজু মিত্তিরের ভাইপো!

হ্যাঁ। অরিন্দম সরকারের কণ্ঠে সুস্পষ্ট শ্রদ্ধা ও সমীহ। লোকটা কে! শশাংক ভাবে।

বেঁটে লোকটা এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে শশাংকর দিকে তাকিয়ে ভারী গলায় বললে, কি হে ছোকরা! তোমার এমন দুর্মতি হলো কেন?

জবাব না দিয়ে কেবল চেয়ে থাকে লোকটার মুখের দিকে একদৃষ্টে।

কি হে! সোজা কথায় মুখ খুলবে, না 'কালাচাঁদ' চালাতে হবে? লোকটা পূর্ববৎ ভারী কণ্ঠে আবার বলে ওঠে।

শশাংক তবু নিরুত্তর।

লোকটা বলে চলে, সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই এখানে তোমাদের মত বাঁদরামিকে টিট করবার জন্য মজুত আছে বুঝলে হে! তাই চাও, না—

ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলতেও বুঝি কেউ আপনাদের শিক্ষা দেয়নি? ক্রুদ্ধ রাগতকণ্ঠে শশাংক জবাব দেয়।

বটে! বটে! কি আমার পোস্তার মহারাজ এলেন রে! ওসব বোল-চাল সব উবে যাবে দাদু, কয়েকবার কালাচাঁদ পৃষ্ঠদেশে পড়লেই! শোন হে ছোকরা, সোজাসুজি বলছি এখনও ভাল চাও তো ভালয় ভালয় সেই কাগজগুলো দিয়ে দাও, নচেৎ আমরা জানি কি করে তোমাদের মত লোকের মুখ থেকে কথা বের করতে হয়।

শশাংক লোকটার কথার কোন জবাব দেয় না। চুপ করেই থাকে।

অরিন্দম সরকার আবার কথা বলে, কি শশাংকবাবু, এখনো ভাবছো কি? কেন মিথ্যে ঝামেলা বাড়াচ্ছো, কথা শোন যা বলছি। আর তাছাড়া এতে তোমার লাভ বই তো কোন ক্ষতিই নেই। টাকা আমরা দেবো। মিনিমাগনা কাগজগুলো আমরা তো আর কিছু চাইছি না তোমার কাছ থেকে হে।

তবু শশাংক চুপ করে থাকে।

BanglaBook.org

হুঁ। দেখছি সোজা আঙুলে ঘি বের হবে না হে অরিন্দম। নীচের সেই ঘরে আপাততঃ বন্দী করে কিছু কালাচাঁদ সেবন করাও, দেখবে সুড়সুড় করে কথা বের হয়ে আসবে। যাও—

বেঁটে লোকটা ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল অরিন্দমকে নির্দেশ দিয়ে। কিছুক্ষণ পরেই দু'জন ষণ্ডা গুণ্ডা গোছের লোক ঘরে এসে ঢুকল এবং দু'দিক থেকে শশাংককে প্রায় চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে এলো অন্য একটা অন্ধকার ঘরে। তারপর শুরু হলো অমানুষিক নির্যাতন শশাংকর দেহের উপর।

চামড়ার চাবুকের উপর্যুপরি আঘাতে জর্জরিত ক্ষতবিক্ষত শশাংক নীচের অন্ধকার ঘরের ধূলিমলিন মেঝের উপরে চোখ বুজে পড়ে আছে অজ্ঞানের মতই।

সর্বাঙ্গে অসহ্য ব্যথা। মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করছে। চারিপাশে নিকষ কালো অন্ধকার—অন্ধকারে দৃষ্টি যেন অন্ধ হয়ে গেছে। অসহ্য ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় গলা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তবু শশাংক মুখ খোলেনি, একটি কথাও বলেনি।

হঠাৎ কার চাপা কণ্ঠস্বর শোনা যায় অন্ধকারে, শশাংক!

কে? আশ্চর্য! এ যে সেই চন্দননগরের শোনা কণ্ঠস্বর!

অন্ধকারেই কে যেন সস্নেহে ওর শরীর স্পর্শ করে, ভয় নেই শশাংক। আমি তোমার বন্ধু।

শশাংকর এবার আর বুঝতে কষ্ট হয় না। হ্যাঁ, এই সেই পরিচিত বন্ধুর কণ্ঠস্বরই যে তাকে সেদিন চন্দননগরে অন্ধকার ঘরের মধ্যে সাবধান করে গিয়েছিল।

আশার বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে যায় শশাংকর অন্ধকার মনের কোণে।

ওঠো, আমার হাত ধরে উঠে দাঁড়াও।

॥ ১৫ ॥

বেত্রাঘাত জর্জরিত দেহ। বিষের মতই বেদনা। উঠবারও তখন ক্ষমতা যেন আর নেই শশাংকর। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে চোখের দৃষ্টিই যে কেবল অন্ধ হয়ে গিয়েছে তা নয়, শ্বাসও যেন বুকের মধ্যে আটকে গেছে।

আবার সেই অন্ধকারের মধ্যে স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, উঠতে পারছো না শশাংক?

না। আমাকে একটু টেনে তুলবেন?

নিশ্চয়ই।

অন্ধকারেই একটি হাত এগিয়ে আসে। অনুভবে পরম আশ্বাসে সেই হাতটি চেপে ধরে শশাংক।

আগন্তুকই শশাংককে সস্নেহে হাত ধরে টেনে তোলে। এবং অন্ধকারে অন্ধের মত তারই মৃদু আকর্ষণে শশাংক উঠে দাঁড়িয়ে কোনমতে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। কোথায় কোন্ পথ দিয়ে যে চলেছে কিছুই শশাংক বুঝতে পারে না। অনেকটা পথ পার হয়ে শশাংক আগন্তুকের হাত ধরে অবশেষে একটা সরু অপরিসর অন্ধকার গলিপথের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। একটা অস্পষ্ট আলোর আভাস সামনে থেকে পাওয়া যায়।

কোথা থেকে যেন শীতের ঠাণ্ডা বাতাস এসে চোখে মুখে মৃদু পরশ দিয়ে যায়। বন্ধ-ঘরের অন্ধকারে প্রাণটা যেন এতক্ষণ হাঁপিয়ে পড়েছিল, বাইরের মুক্ত ঠাণ্ডা বায়ুতে অনেকটা ক্লান্তি কেটে যায়।

BanglaBook.org

আগন্তুক হাতটা শশাংকর ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শশাংক তার খুব কাছেই দণ্ডায়মান, রহস্যময় সেই আগন্তুককে বোধ হয় দেখবার চেষ্টা করে কিন্তু ভাল কিছুই দেখতে পায় না, আবছা আলো-অন্ধকার।

আগন্তুকের গলা আবার শোনা গেল।

সামনের সোজা পথ ধরে এগিয়ে যাও, রাস্তাটা বরাবর একেবারে বাড়ির পিছনে একটা বাগানের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। আরো কিছুটা এগিয়ে গেলে বাগানের দক্ষিণ কোণে দেখবে প্রাচীরের কতকটা অংশ ভাঙা। বাগানের ওদিকে মাঠ। মাঠ ধরে খানিকটা হেঁটে গিয়েই রেল লাইন ধরে সোজা পূর্বমুখো হাঁটবে। মাইলখানেক হেঁটে গেলেই ডায়মণ্ডহারবার রেলওয়ে স্টেশন পাবে। যাও। আর দেরি করো না।

শশাংক তবু দাঁড়িয়ে থাকে। এক পাও অগ্রসর হয় না।

কি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন এখনও? দেরি করো না আর, যাও। হ্যাঁ, ভাল কথা যত তাড়াতাড়ি পারো সুব্রতবাবুর সঙ্গে দেখা করো গিয়ে। আর তার পরামর্শ নিতে কোন দ্বিধা করো না। মনে থাকবে তো আমার কথা!

কিছু যদি মনে না করেন, আপনি কে? শশাংক প্রশ্নটা আর না করে কিছুতেই থাকতে পারে না।

আমার পরিচয় দেওয়ার সময় এখনো আসেনি। সময় এলেই পরিচয় পাবে, ব্যস্ত হয়ো না।

কিন্তু—, শশাংক ইতস্ততঃ করতে থাকে।

আচ্ছা আমি চলি। বলেই আচম্‌কা যেন শশাংকর ব্যগ্র প্রশ্নটাকে ঐখানেই শেষ করে দিয়ে আগন্তুক চলে গেল। শশাংক শুনতে পেল—আগন্তুকের পদশব্দ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। শশাংক এবারে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে অগ্রসর হলো আগন্তুক-নির্দিষ্ট পথেই। কিন্তু মনের মধ্যে তখন তার কেবলমাত্র একটি চিন্তাই আবর্ত রচনা করে ফিরতে থাকে। কে এই লোকটি! বার-বার দু'বার তাকে সতর্ক করে বিপদের মধ্যে থেকে উদ্ধার করে গেল এমন নিঃস্বার্থভাবে! এবং শুধু তাই নয়, কেন এমনি করে আত্মগোপন করে থাকছে!

আশ্চর্য! পরিচয় দিতেও চায় না! কিন্তু কেন? এই শত্রুপুরীতেই বা লোকটি এল কি করে? এবং জানলেই বা কি করে ও এখানেই বন্দী হয়ে আছে এই অন্ধকার কুঠরীর মধ্যে অসহায় ভাবে?

পথ চলতে চলতে শশাংক ঐ কথাগুলোই ভাবতে থাকে।

সর্বাঙ্গে অসহ্য ব্যথা। দু'দিনের অনাহার। পথ চলতেও কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সব কষ্টই যেন তুচ্ছ হয়ে যায় মুক্তির আনন্দের কাছে। যাহোক, সেই আগন্তুকের নির্দেশমতই শশাংক গলিপথ অতিক্রম করে অন্ধকারে।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে শশাংক বাগানের মধ্যে পড়ল।

দ্বিপ্রহরের দিকে বোধ হয় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, বাগানের মধ্যকার ঘন আগাছা সিক্ত পিচ্ছিল। এখনো মাঝে মাঝে শীতের অকাল বর্ষণসিক্ত জল-কণাবাহী হিম হাওয়া এসে ঝাপটা দিয়ে যাচ্ছে। হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে তোলে।

সন্তর্পণে শশাংক এগিয়ে চলে, মাঝে মাঝে পশ্চাতের দিকে তাকায়, কেউ আবার অনুসরণ করছে না তো?

BanglaBook.org

শত্রুপুরীর অন্ধকূপে আবার ফিরে যেতে ও রাজী নয়। কিন্তু ঘুরেফিরে কেবলই অচেনা বন্ধুটির কথাই মনে পড়ে। কে লোকটি! কি ওর পরিচয়! আশ্চর্য লোকটির গতিবিধি! কেমন করেই বা ও জানল, শশাংক এই নির্জন বাগানবাড়িতে শত্রুহস্তে নিপীড়িত, বন্দী! লোকটা তা'হলে কি ছায়ার মত বরাবরই তাকে সর্বত্র অনুসরণ করে আসছে! নইলে সব কিছু তার জানতেই বা পারে সে কি করে! যাহোক, সর্বাগ্রে এখন এখান থেকে তাকে পালাতে হবে। লোকটির নির্দেশমত এগিয়ে এসে শশাংক দেখে, সত্যিই বাগানের প্রাচীরের নির্দিষ্ট স্থানটি ভাঙা। সেই ভগ্ন প্রাচীরের পথ দিয়ে বের হয়ে শশাংক একটা খোলা মাঠের মধ্যে এসে পড়লো। মাঠের ভিজে মাটির উপর দিয়ে শশাংক দ্রুত হেঁটে চলে। সুব্রতবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। উনিও তাই বলে গেলেন। এবারে অকপটে সবই স্বীকার করবে সুব্রতর কাছে। ছিন্ন মেঘের ফাঁকে দেখা দিয়েছে এক ফালি চাঁদ। ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় চারিদিকে যেন ঈষৎ ছায়া আলোয় কেমন বিষণ্ণ-করুণ বলে মনে হয়। শশাংক দ্রুত হেঁটে চলে।

জানবারও উপায় নেই রাত্রি কয়টা হবে এখন। ঐ দূরে আকাশের এক প্রান্তে জ্বলজ্বল করছে নিঃসঙ্গ কালপুরুষ। কোথায় দূর গ্রাম-প্রান্তে কুকুরের ডাক শোনা যায়। নিশীথিনীর বুকে একটা বেদনার আর্তনাদের মত।

শশাংক স্টেশনে এসে যখন পৌঁছল, রাত্রি তখন বোধ করি শেষ হবার আর খুব বেশী দেরি নেই। পূর্বাকাশের প্রান্তে বিলীয়মান অন্ধকারে তারারই অবশ্যম্ভাবী ইশারা।

স্টেশনটাও যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। ইলেকট্রিক বাতিগুলো এবারে যেন নিবে গেলেই ভাল হয়। আজ রাত্রের মত তাদের কাজ ফুরিয়েছে। ওজন করবার যন্ত্রটার কাছে তিনজন কুলি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

টি-স্টলে কাউণ্টারের সাদা পাথরের টেবিলটার উপরে দিব্যি আরামে শয্যা বিছিয়ে কে একজন কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

শশাংক এসে একটা খালি বেঞ্চের উপর ঝুপ করে বসে পড়ল। ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর অবসন্ন। পিপাসায় গলা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। শশাংক এক সময় লম্বা হয়ে বেঞ্চটার উপরেই শুয়ে পড়ে। ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে আসে।

শশাংকর ঘুম যখন ভাঙল বেলা তখন অনেকখানি হয়েছে। সূর্যকিরণে চারিদিক ঝলমল করছে। স্টেশনে অনেক যাত্রী ইতিমধ্যেই ভিড় করেছে। সর্বত্রই যাত্রীদের গোলমাল। চায়ের স্টলে খরিদ্দারের বেশ ভীড়।

শশাংক চায়ের স্টলের দিকে এগিয়ে যায় প্রথমটা ভুলক্রমে। তারপরে হঠাৎ মনে পড়ে যায় সঙ্গে একটি কপর্দকও নেই। সেই সঙ্গেই মনে পড়ে শূন্য পকেটে এখন সে কি করেই বা কলকাতায় ফিরবে?

হতাশ চিত্তে শশাংক আবার-ফিরে এসে পূর্বের সেই বেঞ্চটার ওপরেই বসে পড়ে। কি করবে এখন সে? হেঁটে ডায়মণ্ডহারবার থেকে কলকাতায় পৌঁছানো—ভাবতেও হাত-পা অবশ হয়ে আসে। কিন্তু এই অচেনা অজানা জায়গায় কেই বা তাকে অর্থসাহায্য করবে? আর কার কাছেই বা সে হাত পাতবে?

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পেটের বত্রিশ নাড়ী পাক দিচ্ছে। কলকাতায় পৌঁছানোর কথা পরে, কিন্তু তার আগে পেটে যে কিছু পড়া একান্ত প্রয়োজন।

BanglaBook.org

হঠাৎ এমন সময় অত্যন্ত পরিচিত একটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

আরে! শশাংকবাবু না?

চম্‌কে শশাংক মুখ তুলেই দেখলে, সামনেই দাঁড়িয়ে সুব্রত।

সুব্রতবাবু! শশাংক সুব্রতকে ঐ সময় দেখে যেন সত্যিই হাতে স্বর্গ পায়।

সেই মাঠ থেকে শুরু করে, স্টেশন পর্যন্ত আপনাকে কি খোঁজাটাই না খুঁজছি ঘণ্টাখানেক ধরে! হঠাৎ যে কোন্ পথে ডুব দিলেন!

আমাকে খুঁজছেন? কিন্তু কি করে আপনি জানলেন যে এখানে আমি আসবো? পরিপূর্ণ বিস্ময়ের সঙ্গেই শশাংক প্রশ্ন করে।

সুব্রত মৃদু হেসে বলে, সেও এক আশ্চর্য ব্যাপার! নিজের বাড়িতে ঘরের মধ্যে শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম, এমন সময় কে এক অপরিচিত ব্যক্তি ফোনে আমাকে ডেকে আপনার সম্পর্কে সংবাদ দেন।

অপরিচিত ব্যক্তি?

হ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে সুব্রতর কথা শুনে শশাংকর মনে হয়, এ আর কেউ নয়, এ তবে নিশ্চয়ই সেই অচেনা পরিচয়-দানে অনিচ্ছুক বন্ধু! যার সাহায্যে শত্রুপুরী হতে মুক্তি পেয়েছে গত রাত্রে। মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দেয় আবার শশাংক সেই অচেনা বন্ধুকে।

তা সে-সব কথা এখন থাক। সুব্রত বলে, আপনার নিশ্চয়ই এখন পর্যন্ত চা পান হয়নি? আসুন, আমারও প্রচণ্ড চায়ের পিপাসা পেয়েছে, ঐ স্টল থেকেই চলুন চা পান করে নেওয়া যাক। আপত্তি নেই তো?

না। আপত্তি আর কি, চলুন! শশাংক উঠে দাঁড়ায়।

দুজনে এসে চায়ের স্টলের সামনে দুটো টিনের চেয়ার টেনে নিয়ে বসল এবং সুব্রতই দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিল।

॥ ১৬ ॥

চা পানের পর শশাংকর শরীর ও মনের ক্লান্তিটা যেন অনেকটা কেটে যায়।

স্টেশনের বাইরেই সুব্রতর গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। দু'জনে এসে গাড়িতে উঠে বসে। সুব্রত গাড়িতে স্টার্ট দেয়। কলকাতার কাছাকাছি এসে সুব্রত প্রশ্ন করে, আপনি কি আপনার আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাসাতেই যাবেন এখন? সেদিকেই যাব কি?

হ্যাঁ সুব্রতবাবু, তাই চলুন।

সুব্রত গাড়ি চালাতে থাকে।

সুব্রতবাবু!

সুব্রত নিঃশব্দে গাড়ি চালাচ্ছিল। হঠাৎ শশাংকর ডাকে পার্শ্বে উপবিষ্ট শশাংকর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, বলুন?

আমার ভয়ানক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে—শশাংক বলে।

ক্ষতি!

হ্যাঁ।

BanglaBook.org

কি বলুন তো?

এক্সপেরিমেন্টের কপিটা আমি হারিয়ে ফেলেছি।

তাই নাকি! কি করে হারালেন?

সুব্রত আড়চোখে শশাংকর চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকায়।

বোধ হয় নৌকা থেকে সে-রাত্রে আপনার সঙ্গে যখন গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলাম তখন কোন এক সময় খোয়া গেছে। আমার এত কষ্ট সবই ব্যর্থ হয়ে গেল সুব্রতবাবু। শশাংকর কণ্ঠে একটা হতাশার সুর।

সুব্রত একবার ভাবলে, সব কথা অকপটে শশাংককে খুলে এখুনি বলে দেয়, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবে বর্তমানে ব্যাপারটা হয়ত শশাংকর কাছে গোপন রাখাই ভাল হবে। পরে সময় এলে আসল ব্যাপারটা শশাংককে খুলে বললেই চলবে।

তাই ব্যাপারটাকে যেন লঘু করে দেবার জন্যই সহজ সুরে বলে, যা ঘটে গেছে তার জন্য দুঃখ করে কি লাভ শশাংকবাবু, ওসব কথা এখন আর নাই বা ভাবলেন।

কিন্তু আপনাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না, এ ক্ষতি আমার কাছে কতখানি! উঃ, কি যে আমার আপসোস হচ্ছে!

ওসব কথা এখন থাক শশাংকবাবু। সুব্রত বলে।

তবে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত সুব্রতবাবু, ওদের হাতে সে কাগজগুলি যায়নি। ওদের ধারণা এখনো আমার কাছেই সেগুলো আছে। কতকটা যেন নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে শশাংক কথাগুলো বলে।

এও একদিক দিয়ে ভাল। আচ্ছা মিঃ মিত্র, আমার ব্যাপারটা ওদের দলের লোকেরা শেষ পর্যন্ত জানতে পেরেছিল কি?

বোধ হয় না। কারণ সে সম্পর্কে কোন কিছু আভাসই ওদের কথাবার্তার মধ্যে আমি পাইনি। শশাংক বলে।

ইতিমধ্যে একসময় সুব্রতর গাড়ি শশাংকর বাড়ি স্মৃতিকুটীরের লৌহফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

গাড়ি থামিয়ে শশাংককে নামিয়ে দিয়ে সুব্রত বললে, যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে আর মাথা খারাপ করবেন না শশাংকবাবু। যান, গিয়ে এবারে স্নান করে কিছু খেয়ে আপনি বিশ্রাম নিন। সন্ধ্যার দিকে আমিই আপনার এখানে আসবো। অনেক কথা আছে এবং আলোচনাও আছে আপনার সঙ্গে মিঃ মিত্র। আচ্ছা নমস্কার—চলি। সুব্রত বিদায় নিয়ে চলে গেল।

শশাংক বাড়ির মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে। সত্যিই সে ক্লান্ত। বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন।

বৃদ্ধ ভৃত্য স্বরূপদা বাইরের ঘরেই ছিল, শশাংকর পায়ের শব্দে চোখ তুলে তাকায়, কে, খোকন?

হ্যাঁ স্বরূপদা, আমি।

কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে তোর! কোথায় ছিলি এ কদিন? আজ একটু আগে চন্দননগর থেকে বসন্ত কাকা এসেছিলেন তোর খোঁজে।

কে! বসন্ত কাকা?

BanglaBook.org

হ্যাঁ।

কোথায় তিনি?

এই তো চলে গেলেন। বলে গেলেন তুই ফিরে এলে গর্চা রোডের বাসায় ফোনে একটা সংবাদ দিতে তাঁকে।

আচ্ছা সে হবে'খন। বড্ড খিদে পেয়েছে স্বরূপদা। জলদি করে কিছু খাবার তৈরী করো দেখি।

হ্যাঁ, ভাল কথা, তোর শোবার ঘরের টেবিলের ওপরে একটা চিঠি আছে খোকন।

চিঠি?

হ্যাঁ, কাল বিকালের ডাকে এসেছে। তুই স্নান করে নে, ততক্ষণ আমি লুচি ভেজে আনছি।

স্বরূপদা চলে গেল।

একটু বেশ বিস্মিত হয়েই শশাংক শয়নকক্ষে এসে প্রবেশ করে। টেবিলের উপর থেকে চিঠিটা তুলে নিল। চিঠির খামের উপর ইংরেজীতে টাইপ করে শশাংকর নাম ঠিকানা লেখা। চিন্তিত শশাংক চিঠিটা খুলে ফেলে। কার চিঠি!

প্রথমেই শশাংক চিঠির তলদেশে নামটার উপরে চোখ বুলায়। দিগেন সান্যাল। অ্যাঁ! তা'হলে দিগেন সান্যাল জাহাজডুবিতে মারা যাননি! এখনো বেঁচেই আছেন! গভীর আগ্রহে শশাংক চিঠিতে মনোনিবেশ করে। ছোট সংক্ষিপ্ত চিঠি ঃ

শশাংক,

এ-যাত্রায় কোন মতে বেঁচে গেছি। সাক্ষাতে সব কথা হবে। আগামী শনিবার ২২শে শ্যামপুকুর স্ট্রীটের বাসায় সন্ধ্যার পরে এসো, রাত্রে আমার এখানেই তোমার আহারের নিমন্ত্রণ রইলো। অবশ্য এসো।

শুভার্থী—দিগেন সান্যাল।

শনিবার ২২শে, মানে আজই। কিন্তু সুব্রতবাবুরও সন্ধ্যায় আসবার কথা। সুব্রতবাবুকেও সব বলে সঙ্গে নিয়ে যাবে কি! না একাই যাবে—কি করা উচিত?...

॥ ১৭ ॥

এদিকে সেই পুরাতন বাগানবাড়িতে—চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেছে—একটা পুরো রাত ও দিন। সন্ধ্যার আবছা আঁধার নেমে এসেছে ইতিমধ্যে অল্পে অল্পে সমস্ত পৃথিবীর ওপর।

ওরা শশাংককে বাগান বাড়ির একটা ঘরে বেত্রাঘাতে জর্জরিত অবস্থায় ফেলে রেখে বোধহয় পরম নিশ্চিন্তই ছিল। ঘুণাক্ষরেও তারা ভাবেনি খাঁচার পাখী ইতিমধ্যে কখন এক সময় খাঁচা ফেলে উড়ে গেছে, দূরে বহুদুরে আপাততঃ তাদের নাগালের বাইরে। এবং তা যদি জানতে পারত তবে এই চব্বিশ ঘণ্টা সময় নিশ্চয়ই তারা নিশ্চিন্ত থাকতো না। অবিশ্যি ওরা ধারণাই বা করবে কি করে যে জলের মাছকে একবার বঁড়শী গেঁথে ডাঙ্গায় এনে তোলা হয়েছে—সেই ডাঙ্গার মাছ আবার নাগালের বাইরে জলে ডুব দেবে পালিয়ে গিয়ে!

নীচের তলায় সেই অন্ধকার ঘরের একটিমাত্র দরজায় প্রকাণ্ড একটা মজবুত জার্মান তালা ঝুলিয়ে অরিন্দম সরকার দলের 'গোদা হাতী' নামে পরিচিত ব্রজলালকে বন্ধ দরজার সামনে

BanglaBook.org

পাহারায় বসিয়ে পরম নিশ্চিন্তে ওপরের একটা ঘরে গিয়ে দীর্ঘ একটা নিদ্রার আয়োজন করেছিল সেদিন।

ব্রজলাল—গোদা হাতী!

লোকটার বাড়ি পূর্ববঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে। সমুদ্র সেখানে আজ দূরে সরে গেছে—কিন্তু এখনো লোনা স্বাদ সেখানকার জলে। নিবিড় অরণ্য ও লোনামাটির চড়া—মাঝে মাঝে দু-এক ঘর দুর্ধর্ষ লোকের বসবাস এখনো খুঁজলে যে পাওয়া যায় না তা নয়।

অনেককাল আগে সমুদ্রের ধারে ধারে যখন একটু একটু করে সবে উপনিবেশ গড়ে উঠছে; জলপথে পর্তুগীজ দস্যুরা নাও ভাসিয়ে অবাধে ডাকাতি ও লুঠ করে বেড়াচ্ছে, রক্তে আদিম মানুষের পশুবৃত্তি ঘর বাঁধার চাইতে ঘর ভাঙার নেশাতেই মত্ত, সে সময় যে যাযাবরের দল একদা ঘর বাঁধলেও এখানে ওখানে কোনো চরের মাটিতে বসবাস শুরু করেছিল তাদের মধ্যেই এমন দু'চারজন ছিল বাসা বাধলেও সেই বাসায় মন বসাতে পারেনি, এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে। ব্রজলালের পূর্বপুরুষরা তাদেরই একজন।

ব্রজলালও তাই পিতৃপুরুষের রক্তের নেশায় ঘর ছেড়ে বের হয়ে এসেছিল তার প্রথম যৌবনেই।

তার শরীরে ছিল আদিম নৃশংস বন্য মগের রক্ত। বিশাল চেহারা। তামাটে গায়ের রং। চোখের তারা ধূম্র নীল। মাথার চুল পিঙ্গলবর্ণের। ছোট ছোট লোমে গা পিঠ ও বুক ভর্তি ভাল্লুকের মত। দেহের প্রতিটি মাংসপেশীতে সে দুর্মদ শক্তি ধরতো। মোটা মোটা পায়ের গোছা—যখন সে থপ্ থপ্ করে গজেন্দ্র গমনে হাঁটতো—থলথল করে দুলতো কাঁপতো। মনে হতো দূর থেকে দেখলে তাকে যেন ঠিক একটা হাতীই দুলে দুলে চলছে। দৈহিক গঠন ও আসুরিক শক্তির জন্যই দলের লোকেরা তাকে 'গোদা হাতী' আখ্যা দিয়েছিল।

ব্রজলাল খুব কম কথা বলতো। বেশীর ভাগ সময়েই হাসতো—এবং হাসলে চোখের পাতা দু'টো যেত বুজে, আর মূলোর মত মোটা মোটা ধারালো দাঁতগুলো পুরু লাল ওষ্ঠের ফাঁকে বিকশিত হয়ে উঠত। দেখলে মনে হতো যেন একটা বন্য বরাহ হাসছে বুঝি।

শত্রুপক্ষকে কাবু করবার জন্য বা আয়ত্ত করবার জন্যও যে কোন হাতিয়ার ব্যবহার করাকে অন্তরের সঙ্গেই ঘৃণা করতো ব্রজলাল। দুইটি বাহুই ছিল তার একমাত্র অস্ত্র। শালপ্রাংশুর মত পেশল দীর্ঘ হাত দু'টো দেখলে অতি বড় সাহসীরও হৃদকম্প হতো।

গোদা হাতী—ব্রজলাল কি ভাবে কবে যে ঐ দলে এসে ভিড়েছিল তা কেউ জানত না, একমাত্র দলপতি ছাড়া।

দলের কেউ সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করলেও ব্রজলালের কাছ থেকে কোন জবাব পাওয়া যেত না। কেবল দেখতো ব্রজলাল চোখ বুজে নিঃশব্দে দন্ত বিকশিত করে হেসে চলেছে। আর কেউ দ্বিতীয় প্রশ্ন করতো না।

ব্রজলালের একটা বিশেষ গুণ ছিল যে, তার প্রতি কোন কাজের আদেশ হলে নিঃশব্দে সে ঘাড় নেড়ে কাজের দায়িত্ব পালন করত। সেদিনও অরিন্দমের নির্দেশমত বন্ধ দরজাটার সামনে এসে একটা ছোট টুল পেতে তার বিশাল দেহখানি নিয়ে নিঃশব্দে পাহারা দিতে বসেছিল ব্রজলাল।

অরিন্দমের ধারণা ছিল শশাংক যত চতুরই হোক না কেন, ব্রজলালের চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে পারবে না। কিন্তু অরিন্দম একটা ভুল করেছিল, ব্রজলালের যে আরো একটি বিশেষ গুণ ছিল সেটার বিষয় একবারও না চিন্তা করে। বসে, দাঁড়িয়ে, শুয়ে যে কোন অবস্থাতেই ব্রজলাল

BanglaBook.org

অদ্ভুত আরামে ও নিশ্চিন্তে যত্র তত্র ঘুমাতে পারত এবং ঘুমালে আর সহজে ঘুম ভাঙত না। এবং সে রাত্রেও দরজার বাইরে বসে বসেই ব্রজলাল নির্বিঘ্নে ঘুমাতে শুরু করে দিল। ঘরের মধ্যে বন্দী, সে আর পালাবে কোন্ পথে। অতএব নিশ্চিন্ত সে।

শশাংকর পলায়নের সংবাদ না রেখে পরম নিশ্চিন্তে ব্রজলাল, গোদা হাতী যখন ঘরের দরজার পাশে বাইরে বসে নাক ডাকাচ্ছে সেই সময় ঐ বাড়িরই উপরের তলায় একটা ঘরে।

মুখে মুখোশ-আঁটা যে বেঁটে লোকটিকে পরশু রাত্রে ডাঃ অজয় মিত্রের নারকেলডাঙ্গার বাড়ির লাইব্রেরী ঘরে দেখা গিয়েছিল সেই লোকটিই ঐ সময় উপরের ঘরে আপন মনে পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত পায়চারি করছিল। আজ তার মুখে কোন মুখোশ না থাকায় দেখা যাচ্ছিল মুখখানির রেখায় রেখায় একটা হিংস্র কুটিল ভাব। দু চোখে শাণিত দৃষ্টি। এবং লোকটির চোখে মুখে বোঝা যাচ্ছিল বেশ দুশ্চিন্তার একটা ছায়া ঘনিয়ে উঠেছে সেখানে।

লোকটার চিন্তার কারণ সত্যিই ঘটেছিল। কেননা শেষ পর্যন্ত শশাংকর কাছে সেই কাগজগুলোর কোন হদিসই পাওয়া যায়নি। এত প্রহারের পরও যখন কোন কথা বললে না এবং ওর সর্বাঙ্গে অনুসন্ধান করেও ওর কাছে কিছুর সন্ধান পাওয়া গেল না—তখন কাগজগুলো সম্পর্কে সে বেশ একটু চিন্তিতই হয়ে ওঠে।

ব্যাপার কি? কোথায়ই বা গেল কাগজগুলো? আর যেতেই বা পারে কোথায়? চন্দননগর থেকে যা শেষ সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল, তাতেও স্পষ্টই জানা গেছে বসন্তর বাড়ি থেকে শশাংক যখন পালিয়ে আসে কাগজগুলো তখন ওর সঙ্গেই ছিল জামার পকেটে কোথায়ও।

তবে?

এমন সময় বাইরের দরজায় টুক টুক করে শব্দ শোনা যায় অত্যন্ত মৃদু।

কে? চম্‌কে ফিরে দাঁড়াল দরজার দিকে লোকটি।

আবার শব্দ পূর্বের মত টুক টুক করে দরজার গায়ে শোনা যায়।

এবার বেঁটে লোকটা এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দেয় হাতে গুলিভর্তি পিস্তলটা চেপে ধরে।

কে? আগন্তুককে দেখেই কিন্তু বেঁটে লোকটির বিস্ময়ের যেন অবধি থাকে না। বলে, এ কি? আপনি!

আগন্তুক আর কেউ নয়, সেই ক্রিশ্চানা জাহাজের হীরা সিং।

ঘরের মধ্যে ধীরপদে প্রবেশ করে মৃদু হাসির সঙ্গে হীরা সিং নিঃশব্দে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানায়। এবং বেঁটে লোকটির ওষ্ঠ কুঞ্চন ও প্রসারণ দেখে অক্লেশেই অনুমানে বলে, হ্যাঁ দাশবাবু, আমিই।

অবিশ্যি দাশবাবু জানতো না যে হীরা সিং লোকটা বদ্ধ কালা, কিছুই সে শুনতে পায় না। বেঁটে লোকটি দলে দাশবাবু নামেই পরিচিত। ইতিপূর্বে দু-একবার দাশের হীরা সিংয়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বা আলাপ-পরিচয় হলেও সে জানতে পারেনি যে হীরা সিং লোকটা কালা এবং যাকে বলে বদ্ধ কালা!

কারণ কালা হলেও অন্যের মুখের দিকে স্থিরভাবে হীরা সিং তাকিয়ে তার ওষ্ঠের গতি দেখেই সব কথা বুঝতে পারত দীর্ঘকালের অভ্যাসের দরুন।

সেই জন্যেই দাশের মত দলের অন্যান্য সকলেই কেউ কোন দিন জানতে পারেনি যে হীরা সিং কালা!

আপনি তা'হলে জাহাজডুবিতে—

BanglaBook.org

কথাটা শেষ করল হীরা সিং, না জলে ডুবে মরিনি—দেখতেই তো পাচ্ছেন। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললে, কিন্তু এদিককার সংবাদ কি? S.O.S. পেয়েছিলেন নিশ্চয়ই সময়মত? মানে সংকেতটা পেয়েছিলেন আমাদের নিশ্চয়ই?

হীরা সিংয়ের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে ধীর শান্ত কণ্ঠে দাশ প্রত্যুত্তর দেয়, হ্যাঁ।

সব ঠিক তো? পুনরায় প্রশ্নোচ্চারিত হয়।

॥ ১৮ ॥

দাশবাবু তখন ভাবছে এইবার নিশ্চয়ই হীরা সিং তাকে আসল কথাটাই জিজ্ঞাসা করবে।

যে সাংকেতিক সংবাদটা সে পাঠিয়েছিল তার কি ব্যবস্থা করা হলো বা কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে এবং তখন সে তার কি জবাব দেবে। মনের মধ্যে একটা অস্বস্তিবোধ দাশবাবুকে পীড়ন করতে থাকে।

যা হোক একটা ঢোঁক গিলে দাশ জবাব দেয়, হ্যাঁ।

তারপরই সম্পূর্ণ প্রসঙ্গান্তরে চলে আসে দাশ, জিজ্ঞাসা করে, দিগেন সান্যালের খবর কি জানেন কিছু মিঃ সিং?

খুব বেশী জানি না তবে যতদূর আমার মনে হয় তিনি হয়ত আজও জীবিতই আছেন।

বলেন কি! ব্যাটা তাহলে জাহাজডুবিতে মরেনি?

মনে তো হয় না। আর শুধু সে কেন—অনেকেই মরেনি। কারণ জাহাজডুবি হবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই একটা সাবমেরিন এসে অনেককে বাঁচিয়ে ছিল। কে বলতে পারে তাদের মধ্যে একজন দিগেন সান্যাল ছিল কিনা? কিন্তু সে কথা যাক। অজয় মিত্রের এক্সপেরিমেন্টের কপিটা পাওয়া গেছে তো তার নারকেলডাঙ্গার সেফ থেকে?

না। কোনমতে জবাব দেয় দাশ।

সে কি! পাওয়া যায়নি?

না।

কেন? হীরা সিং দাশের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

আমাদের সেখানে পৌঁছাবার আগেই শশাংক সেখানে গিয়ে সেটা সরিয়ে ফেলেছিল।

মুহূর্তে নিরাশার কালো ছায়া নেমে আসে হীরা সিংয়ের সমস্ত মুখে। কিছুক্ষণ সে কেমন যেন গুম্ হয়ে থাকে—একটি কথাও বলে না। দাশের বুকের ভিতরটাও একটা অজানা আতংকে কেন জানি দুরদুর করতে থাকে। হীরা সিংকে দাশ বেশ ভাল করেই জানে। জগতে এমন কোন নিষ্ঠুর বা নৃশংস কাজ নেই যা হীরা সিং করতে পারে না। মানুষের দেহে পিশাচ বললেও লোকটাকে অত্যুক্তি হয় না।

হঠাৎ হীরা সিং আবার কথা বললে, কিন্তু আমি তো ঠিক সময়ই আপনাদের খবরটা পৌঁছে দিয়েছি। তবু কাজটা হাসিল করতে পারা গেল না কেন? একটু থেমে কথাটা শেষ করে ঃ এর জন্য দোষী কে মিঃ দাশ?

মানে—

আমার কথাটা বুঝতে না পারার ভান করে নিশ্চয়ই কচি খোকার মত অজুহাত দেবার কোন একটা চেষ্টা করবেন না আপনি মিঃ দাশ। সমস্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ পূর্বাহ্নে পেয়েও একটা

BanglaBook.org

প্রয়োজনীয় কাগজ সরাতে পারলেন না ঠিক সময়ে আপনারা এতগুলো লোক মিলে। আপনারা কি মনে করেন এটা ক্ষমার যোগ্য?

কিন্তু—

থামুন! আপনারা যে কি ক্ষতি করেছেন—আপনাদের ধারণারও অতীত। প্রায় তীরের কাছে এসে আপনারা ভরাডুবি করেছেন।

কিন্তু আপনি সব কথা না শুনেই মিঃ সিং—

থামুন! লজ্জা করছে না আপনাদের কথাটা বলতে? একটা ছোকরা—সে কিনা এতগুলো লোককে আপনাদের অনায়াসে বোকা বানিয়ে চলে গেল!

কিন্তু সত্যি বলছি আমরা চেষ্টার ত্রুটি—

থাক্। আর বোকামি করবেন না। কিন্তু তারপর কি করেছেন? কি তার জন্য step নিয়েছেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

শশাংককে আমরা এনে আটক করে রেখেছি।

দাশের শেষের কথায় মনে হলো হীরা সিং যেন অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায়?

এই বাড়িতেই। কিন্তু তার বডি সার্চ করেও তার কাছে কিছু পাওয়া গেল না।

তাকে স্বীকার করাবার চেষ্টা করা হয়েছিল?

হ্যাঁ। কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়নি।

ফল হয়নি! হয় সে স্বীকার করবে, নচেৎ—কথাটা শেষ করে না সিং, শুধু একটু থেমে বলে, আমি এখনি একবার বের হচ্ছি। রাত্রি আটটা নাগাদ ফিরবো। তারপর আমি নিজেই একবার চেষ্টা করব।

মিঃ সিং ঘর হতে বের হয়ে যায়।

হীরা সিং চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ ধরে একই ভাবে সেই ঘরের মধ্যে গুম্ হয়ে বসেছিল দাশ। পাশের ঘরে অরিন্দম সরকার এখনো ঘুমাচ্ছে।

রাত্রি আটটায় নয়—প্রায় বারোটার সময় একটা গাড়ির শব্দ শুনে দাশ উঠে জানলাপথে উঁকি দিয়ে দেখলো, কালো রংয়ের একটি সেলুন বডি গাড়ি গেট্ দিয়ে এসে গাড়িবারান্দার নীচে দাঁড়াল।

জানলা থেকেই স্পষ্ট ওদিকটা দেখা যায়। গাড়ি থেকে টর্চ জ্বেলে পর পর তিনজন নামল। সিঁড়িতে কিছুক্ষণ পরেই পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। কারা উপরে আসছে। এতক্ষণ মিঃ দাশ ঘরের আলোও জ্বালায়নি। উঠে তাড়াতাড়ি একটা মোমবাতি জ্বালাল।

প্রথমে হীরা সিং—তার পিছনে আর দুজন। একজনের চেহারা মাঝারি গোছের—পরিধানে কালো সার্জের সুট্। অন্যজন খুব ঢ্যাঙা নয়, বেঁটেও নয়—মাঝামাঝি হবে। তবে দেখলেই মনে হয় লোকটি শরীরে প্রচুর শক্তি রাখে। শেষোক্তর মুখে একখানা কালো রবারের পাতলা মুখোশ আঁটা।

লোকটার পরিধানে লংস্ ও বুশ শার্ট। পায়ে ভারী রেপ্ সোলের দামী জুতো। মুখে একটা পাইপ। মুখোসের ছিদ্রপথে দু'টি চক্ষু দেখা যায়—দৃষ্টি যেন অন্তর পর্যন্ত ভেদ করে যায়। ধারালো ইস্পাতের মতই শাণিত সে দৃষ্টি।

BanglaBook.org

ঘরের মধ্যে মাত্র বসবার মত একখানা চেয়ার ছিল। মুখোশধারী সেই একটিমাত্র চেয়ারটাই টেনে নিয়ে উপবেশন করলো।

কথা বললে হীরা সিংই, শশাংককে এখানে নিয়ে আসুন মিঃ দাশ!

মুখোশধারী এবারে কথা বলে, ব্রজলাল কোথায়?

দাশ জবাব দেয়, শশাংককে পাহারা দিচ্ছে।

তাকেও ডাকবেন মিঃ দাশ। মুখোশধারী বলে।

দাশ সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে নীচে চলে গেল।

ব্রজলাল তখনও তেমন করে পাহারা দিচ্ছিল। মিঃ দাশের পায়ের শব্দে চোখ তুলে তাকাল।

চাবি কই দরজার? দাশ শুধায় ব্রজলালকে ডেকে।

সরকার মশাইয়ের কাছে। ব্রজলাল জবাব দেয়।

অরিন্দমকে ওপর থেকে ডেকে আনো ব্রজ!

ব্রজলাল উপরে চলে গেল। একটু পরেই ব্রজলালের সঙ্গে সঙ্গে অরিন্দম সরকার নীচে নেমে এলো চাবি নিয়ে এবং তালা খোলা হলো।

ঘর অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। অরিন্দমের হাতে ছিল একটা শক্তিশালী টর্চবাতি। টর্চের আলো ঘরের মধ্যে প্রতিফলিত হলো—কিন্তু এ কি! ঘর খালি! জনমানুষের চিহ্ন পর্যন্ত নেই ঘরের মধ্যে কোথাও!

একটা অস্ফুট বিস্ময়সূচক শব্দ অরিন্দমের কণ্ঠ চিরে নির্গত হয়!

কি হলো? ততক্ষণে মিঃ দাশও অরিন্দমের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে ঢুকে।

নেই! অস্ফুট কণ্ঠে অরিন্দম বলে।

নেই! সে কি? কোথায় গেল?

বোকার মতই ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে তাকাতে অরিন্দম বললে, বুঝতে পারছি না তো!

পরক্ষণেই দক্ষিণ দিকের খোলা জানলাটার প্রতি ওদের নজর পড়লো।

বুঝতে আর কিছুই কারও বাকী থাকে না তখন ব্যাপারটা কি ঘটেছে।

॥ ১৯ ॥

কিছুক্ষণ দু'জনেই যেন ঘরের মধ্যে অন্ধকারে বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে থাকে। কারও মুখে কোন কথা নেই।

এখন উপায়? কথা বলে দাশই প্রথমে।

অরিন্দম সরকারও যে কি জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারে না।

ব্রজলাল এতক্ষণ বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের দু'জনের কথাবার্তা বোধ হয় ওর কানে গিয়েছিল, এক পা এক পা করে ব্রজলাল এসে ঘরে প্রবেশ করল। অন্ধকার ঘরটার মধ্যে একমাত্র টর্চের সুতীব্র আলোটা যতখানি জায়গা আলোকিত করেছিল বাদবাকী আশেপাশের সব কিছু অন্ধকারে অবলুপ্ত। ব্রজলাল যে ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা দু'জনেই টের পেয়েছিল সেটা, কারণ ব্রজলালের পায়ের ভারী থপ্ থপ্ শব্দ ওদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে ফাঁকি দিতে পারেনি।

কি করতা, সোনার পাখী উইড়া গ্যাছে বুঝি? চিবিয়ে চিবিয়ে কথা কয়টা বলে ব্রজলাল।

থাম্, মেলা ফ্যাচফ্যাচ করিস না গোদা! খিঁচিয়ে ওঠে মিঃ দাশ।

BanglaBook.org

তা চটেন ক্যান করতা? হেয়ায় চটনের কি হইল?

বেটা কুম্ভকর্ণের সেকেণ্ড এডিশন্—পাহারা দিচ্ছিলে! না নাক ডাকাচ্ছিলে!

কোন্ শোত্তুরে কয় ব্রজলাল অঘোরে নিদ্রে দেন?

না—তা দেবেন কেন! ঘর থেকে একটা জলজ্যান্ত লোক উধাও হয়ে গেল—

পাখী উইড়াই বা যাইবো কেমনে? তীর ছোঁড়েন করতা—তীর ছোঁড়েন! হালার পাখী যেহানেই থাহুক্ ছট্‌ফটাইয়া মরবে—মরবে। হেরায় হক্ কথা কইয়া থুই! হঃ দেখবেন!

এতক্ষণে অরিন্দম সরকার আবার কথা বলে, সত্যি, আশ্চর্য!

কিন্তু কর্তা বা ঐ বেটা হীরা সিং যদি শোনে শশাংক মিত্তির পালিয়েছে তো কাউকেই আমাদের রেহাই দেবে না।

সেই তো হয়েছে মুস্কিল!

সিং মশাই আসছেন বুঝি? প্রশ্ন করে ব্রজলাল।

হ্যাঁ। শুধু সিং মশাই নন্—স্বয়ং কর্তাও এসেছেন!

আরে আরে হেয়ায় কন কি? করতা আসছেন! ব্রজলাল বলে ওঠে।

কিন্তু ব্রজলালের উক্তিতে দু'জনের একজনও এতটুকু উৎসাহও যেন পায় না।

দু'জনের মাথার মধ্যে তখন দুশ্চিন্তার জাল বুনছে। আসন্ন বিপদ থেকে মুক্তির জন্য অন্ধকার পথ হাতড়ে মরছে। কিন্তু এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে এমনি করে ঠায় দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটালেও আলোর সন্ধান পাওয়া যাবে না। এবং যে শত্রু খাঁচা থেকে একবার পালিয়েছে, তাকে ধরা আর অত সহজ হবে না।

ব্রজলালই আবার কথা বলে, কি হোইবো আর খাড়াইয়া থাইকা! চলেন করতার কাছে গিয়া নিবেদন করেন গে। করতাই যা হয় একটা উপায় কইরা লইবো দেখবেন।

আবার মিঃ দাশ খিঁচিয়ে ওঠে, দেখ্ গোদা, সব সময় তোর উপদেশ ভাল লাগে না বলছি! এখান থেকে সরে পড়্ তো!

খুব একটা কইলেন তো—আমি সইড়া পড়লে আপনাগো ঐ সঙ্গে সইড়া পরনের সুবিধাটা হয়। সেটি হইবো না। চলেন করতার কাছে চলেন—যা কইবার সেখানেই কইবেন। চলেন—

যেমন হাতীর মত মোটা, তেমনি বুদ্ধিও সূক্ষ্ম! জবাব দেয় অরিন্দম সরকার।

তা চটলে হইবো কি!

অরিন্দম রেগে উঠে কি যেন বলতে যাচ্ছিল—দাশ তাকে বাধা দিল, ও গাড়োলের ওপরে রাগ করে কি হবে সরকার! তার চাইতে চল ওপরে গিয়ে সব খুলেই বলা যাক। কপালে যা আছে হবে, চল।

হ তাই চলেন, ব্রজ বলে।

অগত্যা তখন সকলে দোতলার সিঁড়ির দিকেই অগ্রসর হয়।

কিন্তু ওদের মুখে শশাংকর পলায়নের সংবাদ পেয়ে হীরা সিং যেন মুহূর্তে দপ করে জ্বলে উঠল। রাগে তার চোখের তারা দুটো যেন অঙ্গারখণ্ডের মতই জ্বলতে থাকে।

মুখোশধারী এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি—এবারে সে শান্ত নির্বিকার কণ্ঠে ডেকে ওঠে, ব্রজলাল?

আইজ্ঞা করতা! ব্রজলাল থপ থপ করে এগিয়ে এলো।

অরিন্দমকে নিয়ে তুই শশাংকর বাড়ির দিকে যা। অরিন্দম শশাংক সম্পর্কে সব কিছু জানে।

BanglaBook.org

এবং একটু থেমে আবার বলে, অরিন্দম শশাংককে আবার ধরে আনতে পারে ভাল—নচেৎ—বাকী কথাগুলো শেষ না করেই মুখোশধারী অরিন্দম সরকারের দিকে তাকাল। তারপর নিঃশব্দে জামার পকেট থেকে একটা বিচিত্র বস্তু বের করলো বক্তা।

জিনিসটা দেখতে অনেকটা হাতের পাঞ্জার মত। পাঁচটা আঙুল—আঙুলের মাথায় ধারালো ইস্পাতের নখর লাগানো।

অরিন্দম শিউরে ওঠে জিনিসটা দেখে। দলের সকলেই জানে বস্তুটি কি এবং কি সাংঘাতিক! দলের সকলেই জানে ওর নাম 'নেকড়ের বাঘনখ'। তীব্র বিষ মাখানো ঐ ইস্পাতের নখরগুলোতে। দেহের কোথায়ও একবার সে বিষ প্রবিষ্ট হলে মৃত্যু অনিবার্য।

হ্যাঁ, এইটা তোর কাছে রাখ্—বলতে বলতে এগিয়ে দিল জিনিসটা।

ব্রজলালও সঙ্গে সঙ্গে সেটা লুফে নিল সন্তর্পণে। মুখোশধারী আবার শান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে, সরকার শশাংককে ধরিয়ে দিতে পারে ভালই—নচেৎ ঐ 'বাঘনখ' ওর শাস্তি।

অরিন্দমের অজ্ঞাতেই একটা আর্ত চীৎকার বের হয়ে আসে, না—না!

Shut up you fool! হঠাৎ বাঘের মত গর্জন করে ওঠে মুখোশধারী।

ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হলো। বক্তা বলেন, লজ্জা করে না তোমার অরিন্দম, মেয়েমানুষের মত নাকিকান্না শুরু করতে? যাও এখান থেকে—clear out! Out!

অরিন্দম সরকার ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। পিছনে পিছনে হাতীর মত থপথপ করতে করতে হেলেদুলে চলে গেল ঘর থেকে ব্রজলাল তাকে অনুসরণ করে।

আবার কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে জমাট অখণ্ড স্তব্ধতা। বোধকরি সূচ পতনের শব্দও শোনা যাবে। কারো মুখে কোন কথা নেই।

পাইপটায় একটা মৃদু টান দিয়ে মুখোশধারী একবার ডাকলে, মিঃ সিং?

Yes!

সময় আমাদের হাতে খুবই অল্প—এবং যুদ্ধের দরুন আবহাওয়াও খুব খারাপ। আজ মাসের বাইশে, সামনের মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে transaction complete করে ফেলতে হবে জাপানী কনসালের সঙ্গে।

জাপানী কনসাল কি এখনো এখানে আছে?

সে নেই—কিন্তু তার প্রতিনিধি আছে এখনও এই কলকাতাতেই।

বল কি!

হ্যাঁ—তার হাতে আমাদের কাগজপত্র পৌঁছে দিলেই টাকা আমাদের হাতে এসে যাবে। এই রকম বন্দোবস্তই আছে কনসালের সঙ্গে।

কিন্তু—

যেমন করেই হোক এক্সপেরিমেন্টের কপি এই বারোদিন সময়ের মধ্যে আমাদের হস্তগত করতেই হবে এবং সেটা ওদের হাতে তুলে দিতে হবে।

মুখোশধারীর কথাটা শেষ হলো না—বাইরে থপ্ থপ্ পায়ের শব্দ পাওয়া গেল—

মুখোশধারী আহ্বান জানাল, ভিতরে আয় ব্রজলাল।

ব্রজলাল এসে ঘরে প্রবেশ করে আবার।

তাহলে ওকে শেষ করে ফেলতেই হবে তো? ব্রজলাল জিজ্ঞাসা করে।

হ্যাঁ। দুষ্ট ব্রণ—

হীরা সিং চম্‌কে তাকায়, কাকে? সরকারকে নাকি?

BanglaBook.org

হ্যাঁ! এরপর আর ওর দলে থাকা চলে না এবং দলে যখন ওর থাকা চলবে না—he must be removed and removed for ever!

কিন্তু—

জানি মিঃ সিং তুমি কি বলবে বা বলতে চাইছো! তুমি তো আমাদের দলের নিয়মকানুন সবই জান!

লোকটা বিশ্বাসী এবং কর্মঠ। ওকে দিয়ে—

না মিঃ সিং, একবার যার অকর্মণ্যতা প্রকাশ পায়, সে আমার বিশ্বাস হারায়। তাকে আর দলে আমি রাখি না। ব্রজলাল, যা!

ব্রজলাল বেরিয়ে গেল।

কাজে নিষ্ঠার অভাবের ক্ষমা নেই মিঃ সিং কোন দিনই আমার কাছে! এত বড় একটা জরুরী প্রয়োজনীয় কর্তব্য মাথার ওপরে ঝুলছে, অথচ কি করে ও নাকে তেল দিয়ে ঘুমোয়?

দোষ কি একা অরিন্দমেরই? দাশ কি একেবারেই নির্দোষ? তোমার মিঃ দাশ?

দাশ!

হ্যাঁ। যদিও শশাংকর পাহারায় ব্রজলালকে রেখে এসে অরিন্দম অপরাধ করেছে, কিন্তু—মিঃ দাশ, তিনি তো ব্রজলালের ঘুমের ব্যাপারটা সবই জানতেন, তিনি কেন অন্য সতর্কতা অবলম্বন করলেন না! তাঁর কি উচিত ছিল না, নিজেই এক্ষেত্রে পাহারা দেওয়া!

কিন্তু দাশের দোষ কি? সে যখন জানত অরিন্দম শশাংকর ভার নিয়েছে—

Exactly—আমি নিশ্চিন্তই ছিলাম! এতক্ষণে কথা বললো মিঃ দাশ।

দাশের কথায় মিঃ সিংয়ের ওষ্ঠপুটে বিচিত্র একটুখানি হাসি ফুটে ওঠে নিঃশব্দে।

কিন্তু আপাততঃ এসব কথা থাক, মিঃ সিং। ক্রিশ্চানা জাহাজডুবিতে যাদের আমরা সলিল গর্ভে সমাধিস্থ ভেবেছিলাম—তাদের মধ্যে অনেকেই বেঁচে আছে আজো!

আমি জানি, মিঃ সিং জবাব দেয়, কারণ যে সাবমেরিন ডুবন্ত যাত্রীদের মধ্যে অনেককে রক্ষা করেছিল আমিও সেই সাবমেরিনের সাহায্যেই প্রাণে বেঁচে যাই। সাবমেরিনটি বঙ্গোপসাগরের মধ্যে এসে আমাদের একটা জাহাজে তুলে দেয়। সেই জাহাজেই আমরা ডায়মণ্ডহারবারে এসে নামি।

কারা কারা নেমেছিল জাহাজ থেকে জান?

বলতে পারি না। মাঝরাত্রে জাহাজ থেকে আমাদের নামানো হয়। রাতটা বেশ অন্ধকার ছিল। কেউ কারো মুখ দেখতে পারিনি ভাল করে। তাছাড়া যুদ্ধের দরুন black out ছিল।

হুঁ। মুখোশধারী কি যেন ভাবতে থাকে। হঠাৎ একসময় আবার প্রশ্ন করে, কবে তোমরা জাহাজ থেকে ডায়মণ্ডহারবারে নেমেছিলে সিং?

দিন দু'য়েক হবে।

জাহাজটা ডুবেছিল ঠিক কোথায়?

ডায়মণ্ডহারবার থেকে মাত্র দুই দিনের পথ, বলতে থাকে সিং, যে রাত্রে জাহাজডুবি হয় রাত তখন বোধ করি সাড়ে আটটা নয়টা হবে। রাত্রি এগারটার মধ্যে সাবমেরিন এসে আমাদের রেস্‌কিউ করে। এবং রাত্রি দুটো নাগাদ হবে আমরা জাহাজে স্থান পাই সাবমেরিন থেকে। পরের পরদিন রাত গোটা বারোর সময় ডায়মণ্ডহারবারে নামি জাহাজ থেকে।

ভাল কথা, ললিতের কোন সংবাদ জান মিঃ সিং?

BanglaBook.org

না, জাহাজ যখন জখম করে তখন কিছুই আমি টের পাইনি। কেবিনে ছিলাম। অবিশ্যি ললিতই এসে আমাকে সংবাদ দিল।

আর একটা কথা, অজয় মিত্রের মৃত্যুর পর তার কেস্ থেকে যেসব তার এক্সপেরিমেন্ট সম্পর্কে জরুরী চিঠিপত্রগুলো সরানো হয়েছিল, যা সিংগাপুরে ললিত তোমার হাতে তুলে দেয় আমাকে দেবার জন্য—সেগুলো তোমার কাছেই আছে তো?

না। সেগুলো বাঁচাতে পারিনি। জাহাজ জখম হবার পর আর নিজের কাছে রাখতে সাহস হলো না। জলে ফেলে দিই।

সে কি!

বাঁচবারই আশা ছিল না তা কাগজপত্র! মৃদু হাসলো মিঃ সিং।

ললিত বলেনি যে তার মধ্যে অনেক মুল্যবান সংবাদ আছে?

হ্যাঁ বলেছিল, তবে don't worry—সে-সব আমার বেশ ভাল করে দেখা আছে। সব তার experiment সম্পর্কে higher mathematicsয়ের ব্যাপার। তোমার সাধ্যও ছিল না তার মধ্যে মাথা গলাতে পারা। তা ছাড়া ওসব higher mathematicsয়ের অঙ্ক দিয়েই বা কি হবে আমাদের। আমাদের প্রয়োজন experiment-এর copyটা। If we get it—we get everything!

কিন্তু ললিত?

সে নিশ্চয়ই বেঁচে থাকলে, এত দিনেও কি আর এসে দেখা দিত না?

সহসা এমন সময় বাইরে কার ভারী কণ্ঠস্বর শোনা গেল, মিঃ সিং, ললিত মরেনি। আপনার গুলি খেয়েও—

॥ ২০ ॥

কথাটা শেষ হলো না। কে যেন অকস্মাৎ ললিতকে গুলি করলো।

দুড়ুম করে একটা পিস্তলের আওয়াজ ও সেই সঙ্গে এক ঝলক আগুন খানিকটা ধোঁয়া ও মনুষ্যকণ্ঠের একটা অস্ফুট আর্ত চিৎকার শোনা গেল।

সমগ্র ব্যাপারটা যেমনি আকস্মিক তেমনি অচিন্তনীয়।

হতভাগ্য ললিতের রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ দেহটা হুমড়ি খেয়ে মাটিতে দড়াম্ করে পড়ে গেল।

মিনিট কয়েক বাদে মুখোশধারী ঘরের মধ্যে যেখানে নিদারুণ রক্তক্ষরণে ললিতের শেষ মুহূর্ত তখন ঘনিয়ে এসেছে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

অব্যর্থ গুলি একেবারে তার হৃৎপিণ্ড ভেদ করে গেছে।

ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে হীরা সিং ও দাশ।

মৃত্যুপথযাত্রী ললিতের মুখ দিয়ে একটি বাক্যও নির্গত হলো না। কথা বলবার মত সত্যিই আর তখন তার শক্তিই ছিল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই ললিতের শেষ নিঃশ্বাস বায়ুস্তরে মিলিয়ে গেল।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে প্রথম মুখোশধারীই, দাশ তুমি এখন যেতে পারো। আমি আর মিং সিং ললিতের মৃতদেহটার একটা ব্যবস্থা করে আসছি।

কাল কি মীর্জাপুরের আড্ডায় যেতে হবে? দাশ প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, কাল রাত দশটা নাগাদ আসবে, কথা আছে।

BanglaBook.org

দাশ নিঃশব্দে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। ক্রমে দাশের জুতোর শব্দ সিঁড়িতে মিলিয়ে গেল।

আবার ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ মৃত্যুর মত নিস্তব্ধতা। পাথরের মত ঠাণ্ডা জমাট। ভয়ঙ্কর মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে। বাইরে আকাশে বোধ হয় মেঘ করেছে, একটা থম্‌থমে ভাব সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে। বাতাসের লেশমাত্র নেই। চাপা গুমোট গরম।

রাত্রি কত হবে? কে জানে!

মিঃ সিং?

Yes !

আশা করি বুঝতে পারছো—এ ব্যাপারের একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া এখনই প্রয়োজন। এও বোধ করি বুঝতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না যে, ললিতের সঙ্গে আমার ইতিপূর্বে দেখা হয়েছে গত সন্ধ্যায়—এবং আমি সব কিছুই আগে তার মুখে শুনেছি in details এবং তোমার হাতের গুলিতে যখন ললিতের মৃত্যু হলো—

সবই শুনেছো যখন ললিতের মুখে—তখন আর পুনরুক্তির—

না, প্রয়োজন নেই! কিন্তু তাহলেও I am in dark মিঃ সিং, আমি জানতে চাই ললিতের জীবন কেন তুমি নিলে?

কেন? তুমি জানতে চাও, তাই না বোস সাহেব? হীরা সিং বললে।

হ্যাঁ।

এবং এই ব্যাপারের একটা মীমাংসার দরকার, এই তো?

অনুচিত কি!

সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি। বোস সাহেব ও হীরা সিং দু'জনেই যেমন চতুর তেমনি শক্তিশালী তেমনি ক্ষিপ্রগতি। পরস্পর বেশ ভাল ভাবেই জানে শক্তি বা ধূর্ততায় কেউ কারো চাইতে কম যায় না।

মিঃ সিং!

Yes Mr. Bose! I am ready!

বুঝতে পারছো বোধহয় এ জগতে জনার্দন বোস ও হীরা সিংয়ের বেঁচে থাকা একসঙ্গে সম্ভব নয় এবং উচিতও নয়!

বিদ্যুৎভরা মেঘ যেমন হঠাৎ গুরু গুরু গর্জন করে ওঠে— বোসের কণ্ঠস্বরটাও নিস্তব্ধ কক্ষের মধ্যে যেন তেমনিই গম্ গম্ করে উঠল।

হাঁ, বাত তো বিলকুল সাচ্‌ই হ্যায়। লেকেন তুম্ ভি ভুল না যানা বোস ম্যায় ভি হীরা সিং হুঁ!

হাঃ হাঃ করে হঠাৎ আচম্‌কা প্রচণ্ড একটা অট্টহাসি হেসে ওঠে বোস প্রত্যুত্তরে এবং সেই হাসির শব্দে হীরা সিংয়ের মত শয়তানও হঠাৎ যেন চম্‌কে ওঠে এবং ব্যাপারটা তার বুঝে ওঠবার পূর্বেই অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে লাফিয়ে পড়ে বোস হীরা সিংয়ের ওপরে এবং লোহার মত মুষ্টিতে কণ্ঠনালীটা টিপে ধরে তার।

হীরা সিংও অতর্কিত আক্রমণ করে বোসকে দু'হাতে এবং সেও বোসের গলা টিপে ধরে।

মানুষের আদিম জিঘাংসা। বন্য হিংসা। একের উপরে অন্যের আধিপত্য বিস্তারের আদিম লালসা।

পাঞ্জাবী হীরা সিং জানত না যে বোস যুজুৎসু প্যাঁচে পাকা ওস্তাদ একজন। অনায়াসেই একটা অদৃশ্য অথচ অমোঘ চকিত প্যাঁচ দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বোস হীরা সিংকে ধরাশায়ী করে

BanglaBook.org

তার বুকের উপরে চেপে বসল। হীরা সিংয়ের তখন নড়বারও আর ক্ষমতা নেই। তারপর চোখের পলকে জামার অভ্যন্তর হতে একটা তীক্ষ্ণ ছোরা বের করে হীরা সিংয়ের কণ্ঠনালীটা ছিঁড়ে দিল। ভল্ ভল্ করে তাজা রক্ত ছুটে এসে আশপাশ রাঙা হয়ে গেল।

একটা কাতর অব্যক্ত আর্তনাদ করে ওঠে হীরা সিং। মুখটা বিকৃত হয়ে ওঠে বারেকের জন্য মাত্র।

বোস যেন পাগল হয়ে উঠেছে। আহত নিস্তেজ হীরা সিং—, তবু উর্পযুপরি চার-পাঁচ বার ছোরা দিয়ে আঘাত করে সিংকে।

হীরা সিংয়ের সমস্ত দেহটা বারকয়েক আক্ষেপ করে স্থির হয়ে গেল।

রক্তমাখা হাতে বোস উঠে দাঁড়াল। মুখে বিচিত্র বন্য হিংস্র পরিতৃপ্তির হাসি। ঘর থেকে বের হয়ে বোস সোজা বাগানে চলে গেল।

বাগানের পুব দিকে একটা মস্ত বড় দীঘি। দীঘির চারপাশে ঘন বুনো আগাছা—আকাশে একফালি চাঁদ উঠেছে। তারই অল্প আলো অন্ধকারে বিচিত্র মায়া বিস্তার করেছে।

প্রথমেই দীঘির জলে হাত-পা ধুয়ে নিল বোস।

॥ ২১ ॥

ঘরের মধ্যে মোমবাতিটা প্রায় জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে এসেছে এবং প্রায় নিবন্ত বাতির শিখাটা মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহ দুটো তেমনি ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। ললিত কুণ্ডু ও হীরা সিং। একটু আগেও তাঁরা বেঁচে ছিল—প্রাণরসে ছিল ভরপুর। কোথায় হারিয়ে গেল তারা জীবনসমুদ্রের অতলান্ত সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যে। আর তারা সাড়া দেবে না।

মৃতদেহ দুটোর একটা যাহোক কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। এই বাগানবাড়ির মধ্যে এভাবে ফেলে রেখে যাওয়া চলবে না। পুলিসের নজরে পড়লে গোলমাল হবে। এবং জল অনেক দূর পর্যন্ত গড়াবে, যেটা মোটেই সুবিধার ব্যাপার হবে না।

কিন্তু কি ভাবে মৃতদেহ দুটোর ব্যবস্থা করা যায়! চিন্তার কুঞ্চন পড়ে জনার্দন বোসের কপালে।

হ্যাঁ, ঠিক। ঠিক হয়েছে—মৃতদেহ দুটো একটা একটা করে টেনে নিয়ে গিয়ে জনার্দন বোস যে ঘরটার মধ্যে শশাংককে বন্দী করে রাখা হয়েছিল সেই ঘরে রেখে দিয়ে এল। তারপর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

এবারে তবু কতকটা নিশ্চিন্ত।

গাড়িতে উঠে বোস চাবি টিপে স্টার্ট দিল। ইঞ্জিন গর্জন করে ওঠে। পরক্ষণে গাড়ি বাগানবাড়ি থেকে বের হয়ে বড় রাস্তার ওপর এসে পড়লো।

খোলা নির্জন রাস্তায় হু-হু শব্দে গাড়ি এবারে ছুটে চলে, রহস্যের একটি ভয়াবহ রক্তাক্ত পৃষ্ঠাকে পশ্চাতের অন্ধকারে ফেলে।

ব্রজলাল আর অরিন্দম সরকার।

অরিন্দম বোসের নির্দেশে ঘর থেকে বের হয়ে কোনমতে সিঁড়িগুলো অন্ধকারেই অতিক্রম করে নীচের অন্ধকার করিডোরে এসে দাঁড়াল। ব্রজলাল আসছে তার পিছনে পিছনে থপ্ থপ্ করে পা ফেলে ফেলে।

BanglaBook.org

মৃত্যু আসছে ভারী পায়ে নিশ্চিত অবধারিত যেন। হতভাগ্য অরিন্দম সরকার! এলোমেলো চিন্তার ঝড় বইছিলো তার মনের মধ্যে তখন। সমস্ত যেন আজ তার কাছে মিথ্যে হয়ে গেছে। কর্তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বুঝতে অরিন্দমের এতটুকুও কষ্ট হয়নি এবং দুর্দান্ত পর্তুগীজের বংশধর ব্রজলালকে চিনতেও তার বাকী নেই তো!

সঙ্গে বাঘনখর। এবং সে বাঘনখর যে ব্রজলালের কত অনিবার্য ও সাংঘাতিক, তার পরিচয় ইতিপূর্বে অরিন্দম অনেকবারই পেয়েছে।

অরিন্দমের নিজের গাড়ি নেই। আছে যে গাড়িখানা সেটাও কর্তারই দেওয়া কাজের সুবিধা হবে বলে। অন্ধকার বাগানের এক কোণে গাড়িখানা দাঁড় করানো ছিল। অরিন্দম এসে গাড়িতে উঠে বসল। পিছনের সীটে উঠে বসলো ব্রজলাল।

ব্রজলাল প্রশ্ন করে, কোথায় যাওয়া হবে এখন সরকার মশাই?

অরিন্দমের ইচ্ছা হলো জবাব দেয়, যমের দক্ষিণ দুয়ারে সোজা! কিন্তু মনে হলেও সে কথা মুখে বলে লাভ কি? তাই কেবল বললে, আপাততঃ কলকাতায়।

বেশ, চলেন!

অন্ধকারে হেড্ লাইট জ্বালিয়ে গাড়ি তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে। স্ট্রিয়ারিংয়ে বসে অরিন্দমের মনে হচ্ছিল সোজা গাড়িখানা টপ্ স্পীডে যেথায় খুশী চালিয়ে নিয়ে যায়। ধাক্কা লেগে গুঁড়িয়ে যাক গাড়িখানা! আসুক মৃত্যু! নিঃশব্দে শেষ হয়ে যাক এ জীবন! কিসেরই বা জীবন? কিই বা মূল্য আছে এর!

নির্জন রাস্তা! চলমান গাড়ির খোলা জানলাপথে তীব্র হাওয়ার ঝাপটা এসে নাকে চোখে মুখে লাগছে। রাস্তার দু'পাশের গাছপালাগুলো অন্ধকারে গাড়ির গতিবেগের বহু পশ্চাতে হারিয়ে যাচ্ছে।

শশাংককে যে আর মুঠোর মধ্যে পাওয়া যাবে না—এও যেমন নিশ্চিত তেমনি ব্রজলালের করায়ত্ত বাঘনখরে তার মৃত্যুর ব্যাপারটাও সুনিশ্চিত। এখন হোক বা দু'ঘণ্টা পরেই হোক বা চব্বিশ ঘণ্টা পরেই হোক, ব্রজলালের হাতে তাকে মৃত্যু বরণ করতে হচ্ছে এটাই সত্য।

দীর্ঘ পাঁচ বছর অরিন্দম এদের দলে এসে কাজ করছে এবং চুরি থেকে আরম্ভ করে খুন জখম জুয়াচুরি রাহাজানি কিছুই বাদ দেয়নি। কোন অন্যায় কাজেই সংকোচের বালাই এতটুকুও রাখেনি এই পাঁচ বছর অরিন্দম। অন্ধের মত যখন যা নির্দেশ পেয়েছে, ভালমন্দ বিচার না করেই পালন করে গেছে। কতবার কতভাবে করেছে জীবনকে বিপন্ন। এই কি তার প্রতিদান!

পশ্চাতের দিকে তাকায় অরিন্দম। রক্তের মধ্যে তো তার কই এই অসংযম বা হীন বৃত্তি ছিল না! তবে সে এ পথে এলো কেন?

সঙ্গ! সঙ্গই তাকে টেনে এনেছে এই পথে। আজ আর অনুশোচনায় কোন লাভ নেই। ফিরে যাবার পথও রুদ্ধ। কিন্তু কেন? হঠাৎ অরিন্দমের মনে হয়, কেন সে এমনি করে অন্যায় মৃত্যুকে মেনে নেবে এত সহজে বিনা প্রতিবাদে, কেন?

সে কি পুরুষ নয়? প্রতিরোধের কি তার কোন ক্ষমতাই নেই? বাঁচবার কোন চেষ্টাই কি সে করবে না?

হ্যাঁ করবে। শেষ চেষ্টা একবার করবে বৈকি।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ ১ ॥

অরিন্দম সরকার।

অরিন্দম ভাবছিল অনেক কথাই। এলোমেলো একটার পর একটা অনেক চিন্তাই তার মনের মধ্যে এসে জট পাকাচ্ছিল। ঠিক এতখানি সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে আর ইতিপূর্বে সে কখনো পড়েনি।

চলতে চলতে আচ্‌মকা যেখানে এই মুহূর্তটিতে সে এসে দাঁড়িয়েছে, পথের সেটা শেষ না হলেও পথ আর সামনে তার নেই। গভীর অন্ধকার, এক মহাশূন্য, নিরবলম্ব অনিশ্চয়তা মুখব্যাদান করে আছে। পশ্চাতে ফিরবার আর উপায় নেই।

হিংস্র একটা শিকারী কুকুরের মতই বোস যেন তার পিছনে পিছনে তাড়া করে আসছে। নৃশংস পর্তুগীজের বংশধর শয়তান ব্রজলাল, দানবীয় আসুরিক শক্তি তার দেহে, লোহার মত শক্ত দৃঢ় তার দেহের প্রতিটি পেশী। তার কাছ থেকে দয়ার প্রত্যাশাও মিথ্যা।

মৃত্যু। হ্যাঁ—নিশ্চিত অবধারিত মৃত্যুই তার ভবিতব্য। হয় ব্রজলাল অথবা বোসের হাতেই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কারণ শশাংককে আবার করায়ত্ত করা দুঃসাধ্যই নয়—অসম্ভব, এবং যার মাশুল মৃত্যু।

নেই। নিস্তার নেই। মুক্তি নেই।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অন্তরাত্মা অরিন্দমের আবার যেন আকুল স্বরে তীব্র চীৎকার করে ওঠে, না, না—মরতে সে পারবে না! মরতে সে পারবে না!

আদিম চিরন্তন মানুষের বাঁচবার স্পৃহা। সুনিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও বাঁচবার হাস্যকর আকাঙ্ক্ষা। শুধু বেদনাদায়কই নয়, চরম পরিহাসও বুঝি। মানুষ—প্রতিটি মানুষই বাঁচতে চায়। অবধারিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঁচতে চায় সে। মানুষের সহজাত ধর্ম, মানুষের চরমতম দুর্বলতা। মানুষের জীবনের সব চাইতে বড় পরিহাস।

সঙ্গে সঙ্গে অরিন্দমের দেহের প্রতিটি কোষ যেন বোস সাহেবের চরম নির্দেশের প্রতিবাদে সজাগ হয়ে ওঠে। শিরায় শিরায় জ্বলে ওঠে দুর্নিবার একটা বাঁচবার স্পৃহা। বাঁচতে তাকে হবেই। হ্যাঁ, সে বাঁচবে।

যে পথে আজ সে এসে দাঁড়িয়েছে—সে পথের শেষ হয় ফাঁসি, নয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা কারাবাস। এ তো তার জানাই ছিল। এ তো তার অজ্ঞাত থাকবার কথা নয়—স্বাভাবিক ভাবে এ পথের শেষ কোথায়! তবে?

সঙ্গে সঙ্গে মনের ভিতর আদিম স্বাভাবিক ইচ্ছাটা যেন প্রতিবাদ জানায়। তাই বলে এমনিভাবে অসহায়ের মত মৃত্যু!

চলমান গাড়িতে পিছনের সীটে বসে একসময় ঘুমকাতুরে ব্রজলালের চোখের পাতা দুটিতে ঢুলুনি এসে গিয়েছিল বুঝি!

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরও উত্তীর্ণপ্রায়। চারিদিকে একটা অদ্ভুত নিঃসীম স্তব্ধতা। একটা ঠাণ্ডা প্রবাহ

BanglaBook.org

যেন নিস্তব্ধ ধরিত্রীর বুক থেকে সর্পিল গতিতে উর্ধ্বে, মহাশূন্যে আকাশের দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে—কর্মক্লান্ত পৃথিবীর চাপা নিশ্বাসের মত। স্তব্ধ ঘুমন্ত পৃথিবীতে যেন চামর দোলাচ্ছে রাত্রির সুশীতল একটি বায়ুপ্রবাহ।

কি করে এই অবশ্যম্ভাবী ভয়ঙ্কর বিপদ হতে নিজেকে মুক্ত করা যেতে পারে, সেই চিন্তাই এখন আচ্ছন্ন করে ফেলে অরিন্দমকে। সামনে গাড়ি চালাতে চালাতে অরিন্দম সামনে গাড়ির আয়নায় পশ্চাতে উপবিষ্ট ব্রজলালের দিকে একবার তাকাল।

বসে বসেই ঘুমোচ্ছে ব্রজলাল। মাথাটা সামনের দিকে ঈষৎ ঝুলে পড়েছে। গোদা হাতীর আসুরিক শারীরিক শক্তির কথা অরিন্দমের অবিদিত নেই। শুধু দানবের মত শক্তিই নয় দেহে, অসাধারণ ক্ষিপ্র ও শিকারী বিড়ালের মত সতর্কও লোকটা। আচমকা চোখে ধুলো দিয়ে বা অতর্কিতে আঘাত হেনে ওকে ঘায়েল করে যে ওর হাত হতে নিস্তার পাওয়া যাবে তারও কোন সম্ভাবনা নেই।

তাছাড়া নিরস্ত্র সে—এ অবস্থায় অস্ত্রমুখেও যে ও বিপদকে এড়াতে পারবে তারও আশা নেই। তবু—তবু যেমন করেই হোক এ বিপদ হতে তাকে মুক্ত হতেই হবে।

কিন্তু কি করে? কি উপায়ে সে গোদা হাতীর লৌহকবল থেকে মুক্তি পাবে?

গাড়ি তখন মধ্যম গতিতে নয়া রাস্তা ধরে চলেছে। নির্জন নিস্তব্ধ রাস্তা যেন ঘুমন্ত বিরাট এক অজগরের মত গা এলিয়ে পড়ে আছে। দু'পাশের ইলেকট্রিক বাতিগুলো ব্ল্যাক আউটের দরুন কালো টিনের ঠুলির আবরণে ঢাকা। ঠুলির সন্ধিপথে সামান্য যা আলো বিকীর্ণ হচ্ছে তা এত অল্প যে ভাল করে রাস্তাটুকুও আলোকিত হয়নি। আবছা একটা আলো-আঁধারিতে কেমন অস্পষ্ট ও রহস্যময় মনে হয়।

রাস্তার দু'পাশে নানা আকারের কোঠাবাড়িগুলো। কোনটাতেই প্রাণের বিন্দুমাত্র সাড়া পর্যন্ত পাওয়া যায় না। এমনি গভীর সুষুপ্তিময় নিশীথে অরিন্দম কতবার এমন কত পথ ধরে আনাগোনা করেছে নির্ভয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে।

আজ তবে হঠাৎ কেন অকারণ আশঙ্কায় বুকের ভিতরটা হিম হয়ে আসছে? দেহের প্রতিটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতম স্নায়ু দিয়ে একটা ঠাণ্ডা শীতল প্রবাহ ছড়িয়ে যাচ্ছে দেহের প্রতিটি কোষে কোষে? সত্যিই কি অরিন্দম সরকার আজ প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পড়েছে?

হ্যাঁ, অস্বীকার করবার উপায় নেই—জৈবিক নিয়মে সত্যিই আজ দুর্ধর্ষ অরিন্দমকেও মৃত্যু-ভয় গ্রাস করেছে।

হঠাৎ কানে এলো ব্রজলালের কণ্ঠস্বর, হেয়ায় কোলকাতায় আইলাম নাকি সরকার মুশাই?

হুঁঃ। অন্যমনস্কভাবে অরিন্দম জবাব দেয়। বোধ হয় ওর নিজের অজ্ঞাতেই অ্যাকসিলারেটারে পায়ের চাপ পড়ে গাড়ির গতিবেগটা একটু দ্রুত হয়।

কলকাতায় আইলাম—য়্যাহন্ যাইবার লাগছেন কোথায়?

ব্রজলাল!

কি কন?

স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে গঙ্গার ধারে গেলে কেমন হয়? মৃতদেহটা না হয় আমার গঙ্গার জলেই ভাসিয়ে দিও! এ জন্মে যা পাপ করলাম—অন্ততঃ কিছুটা তার গতি হবে।

কি যে কন্ সরকারবাবু! তারপর একটু থেমে বলে, কি করবো কন্! কর্তার হুকুম পালন করতেই হইবো! তা আপনার গে হেহাই যদি শেষ বাসনা, তা চলেন—মা গঙ্গার কূলেই

BanglaBook.org

চলেন—কর্তব্য-কর্ম সম্পন্ন কইরা আসি। কিন্তুক সরকারবাবু, ও হালার শশাংককে ধরবার পারবেনই না। ওসব হাবিজাবিই বা কি ভাবতাছেন—তারথন্ চলেন না ক্যান্, ও হালার শশাংকরেই খুইজা পেরথমে বার করনের চেষ্টা করি। কর্তাও আপনারে তাই বললেন। হুম্‌দো পুরুষ আপনে—একটা পুঁচকে পোলারে খুইজা বার করবার পারবেন না, হেয়াই বা ভাবেন ক্যান্! চলেন না—আপনে তো জানেনই ও হালায় আছে কোনহানে না কোনহানে, ঐ হালার ইন্দুর বাচ্চারে চলেন গলা টিইপা আমাগো কর্তার থনে আইনা হাজির করি।

তুমি ক্ষেপেছো ব্রজলাল, যে মানুষ প্রাণ হাতে করে একবার আমাদের মুঠোর মধ্যে থেকে পালিয়েছে তাকে এত সহজে আর ধরতে পারবে!

হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে ব্রজলাল সরকারের কথায়, হেয়ায় কইছেন বড় জব্বর কথা! হালায় একবার যহন ফইস্কা গেছে—তা চেষ্টা করনের দোষটা কি, হালারে খুইজা পাইমু না ভাবেন ক্যন্? খুইজা পাইতেও তো পারি! চলেন—চলেন, আগে খুইজা দেহি!

বেশ, চল।

অরিন্দম গাড়ির মোড় ঘুরিয়ে বাঁ দিকে চলল।

আমহার্স্ট স্ট্রীটে শশাংকর বাড়ি। এবং শুধু শশাংকর বাড়িই নয়—সুব্রতরও। সুব্রতও সেখানেই থাকে।

সর্বাগ্রে সেখানেই একবার ঘুরে দেখে আসা যাক।

সত্যিই তো! লোকটা পালিয়ে যাবেই বা কোথায়?

কিন্তু সুব্রত—হঠাৎ মনে পড়ে সুব্রতর কথা। ওখান থেকে পলায়ন করবার পর সুব্রতর সঙ্গে শশাংকর যদি দেখা হয়ে থাকে। এবং শশাংকর মুখে সমস্ত কথা শুনবার পর—এক্ষেত্রে সেটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সুব্রত কি ছেলেমানুষের মত কাজ করবে?

শত্রুপক্ষ হলেও অরিন্দম শত্রুর শক্তি ও বুদ্ধিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে।

হোটেলে সেই প্রথম সাক্ষাতের দিনটিতে সুব্রতর সেই চোখের দৃষ্টি অরিন্দম কি ভুলতে পেরেছে!

সুব্রত কি এতক্ষণেও শশাংকর নিরাপত্তার একটা সুব্যবস্থা করেনি? নিশ্চয় করেছে। তবু জায়গাটা একবার দেখে আসলে ক্ষতি কি! আমহার্স্ট স্ট্রীট ও কৈলাস বোস স্ট্রীটের সন্ধিস্থলে এসে অরিন্দম গাড়িটা ব্রেক্ করে দাঁড় করাল।

ব্রজলাল প্রশ্ন করলে, কি হইল সরকার মশাই, গাড়ি থামল যে!

এখানে গাড়ি থাক। চল দু'জনে এবারে হেঁটে যাবো। একটু এগুলেই শশাংকর বাড়ি।

চলেন—ব্রজলাল গাড়ি থেকে নামল।

জনহীন রাস্তাটা। দু'পাশের বাড়িগুলো রাত্রির সুষুপ্তিতে যেন আবছা আলো-আঁধারে স্তূপীকৃত সব ছায়ার মত মনে হয়, বিন্দুমাত্র প্রাণের সাড়া নেই কোথায়ও যেন।

আগে অরিন্দম চলে,—পশ্চাতে থপ্ থপ্ করে চলে গোদা হাতী ব্রজলাল।

ফুটপাতের একধারে কয়েকটা ভিখিরী দল বেঁধে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। ভিখিরীগুলোর পাশে গোটা দুই কুকুরও কুণ্ডলী পাকিয়ে পেটের মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমোচ্ছে। একটা ষাঁড় চোখ বুঁজে ওদেরই পাশে পরম নিশ্চিন্তে বসে জাবর কাটছে। ওরা এগিয়ে চলে।

ক্রমে শশাংকর বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়াল অরিন্দম আর ব্রজলাল।

ব্রজলাল জিজ্ঞাসা করে, থামলেন ক্যান্?

BanglaBook.org

ঐটা শশাংকর বাড়ি! আঙুল তুলে দেখালে অরিন্দম।

বাড়ির লোহার গেট বন্ধ। চারপাশে বেশ উঁচু প্রাচীর।

মোটা পেশল রোমশ বাহু দিয়ে লোহার গেটটার একটা মোটা শিক মুঠি করে ধরে ব্রজলাল বললে, হালার গেট তো বন্ধ দেখতাছি, হালায় লাফাইয়া ভিতরে যাইবেন নাকি?

তার পর? গিয়ে কি হবে?

ক্যান্! হালার পো হালা নির্ঘাত নিশিন্তে ঘুমাইয়া আছে, ধইরা আনুম—বলতে বলতে কুৎসিত চাপা হাসি হাসে ব্রজলাল।

অন্ধকারে হাসির মধ্য দিয়ে উপরের নীচের সাদা ঝক্‌ঝকে দু'পাটি দাঁত যেন ওঠে ঝিকিয়ে জিঘাংসায়।

ব্রজলাল। দুর্দান্ত যাযাবর পর্তুগীজের রক্ত ওর শরীরে। মায়া দয়া বলে লোকটার ভিতরে কোন পদার্থই নেই। শশাংককে যদি এখন এই মুহূর্তে হাতের কাছে পায় ও তাকে টিপে মারতেও এতটুকু দ্বিধাবোধ করবে না। অবলীলাক্রমে ও মানুষের বুকে ছুরি বসায়। নিষ্ঠুর উল্লাসে ও মানুষের মৃত্যুযন্ত্রণাকে রীতিমত যাকে বলে উপভোগ করে। ওর দেহের প্রতিটি কোষে আজো আদিম বন্য গুহাবাসী মানুষের পশুপ্রবৃত্তি। সভ্যতার সংস্কার ওকে এতটুকুও বদলাতে পারেনি। জগতের মনুষ্যসমাজে যা কিছু বর্বরতা, পশুপ্রবৃত্তি সঞ্জাত—এবং তার মূল উৎসই ব্রজলালের শ্রেণীর মানুষের মন।

কিন্তু এসব কি ভাবছে? অরিন্দমও কি রাতারাতি আজ হঠাৎ বদলে গেল?

না, এ তার ক্ষণিক মৃত্যুভয়ে আত্মরক্ষার জৈবিক চেতনা মাত্র। মানুষ হঠাৎ চরম পরিণতির সামনে এসে পড়লে নিজের মনোমুকুরে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে এমনি করেই বুঝি বিহ্বল হয়ে পড়ে।

ব্রজলালই বা কি ভাবছে ঠিক এই মুহূর্তে!

সেও কি সত্যিই চাইছিল অরিন্দমকে মেরে ফেলতে তার নিস্ফলতার সুযোগটুকু নিয়ে? কর্তার আদেশ—সে তো সামান্য একটা নির্দেশ মাত্র! ব্রজলালের মত লোকের কাছে সত্যি সত্যিই কতটুকুই বা তার মূল্য আছে?

অবহেলে একান্ত নির্বিকার ভাবে, যে মানুষ যে কোন মুহূর্তে চরমতম নিষ্ঠুরতাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে, তার কাছে কর্তব্য বা তার পালন নিষ্ঠার দামই বা কতটুকু!

আজ যে কর্তার নির্দেশে সে পরম নির্বিকার ভাবেই অরিন্দম ব্যর্থ হলে তাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তেমন তাগিদ দেখা দিলে সেই কর্তাকেই যে সে হত্যা করতে এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করবে না সেও কি অরিন্দম জানে না, না বোঝে না? সব—সবাই স্বার্থের দাস। প্রয়োজনে সবাই সব করতে পারে।

হঠাৎ অরিন্দম ব্রজলালের কথায় চমকে ওঠে।

তা যাবেন তো ঢুইকা পড়েন—এহানে ভূতের মত খাড়াইয়া থাইকা করবেন কি!

না, ঢুকলেই হয়—কিন্তু—

ঠিক আছে—আমিই দেইখ্যা আসি—বলে ব্রজলাল লোহার গেটের শিক ধরে বেয়ে উপরে উঠে ওপাশে লাফিয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

॥ ২ ॥

শশাংক আবার দিগেন সান্যালের চিঠিখানা আগাগোড়া একবার পড়ে।

শনিবার ২২শে তো আজই। হঠাৎ মনে পড়ে—এবং আজই সন্ধ্যার পর দিগেন সান্যাল তাহলে তাঁর শ্যামপুকুর স্ট্রীটের বাসায় যেতে লিখেছেন! কিন্তু এদিকে সুব্রতবাবুর যে আবার আজকেই সন্ধ্যার পর এখানে আসবার কথা! পরামর্শ করবেন তিনি ওর সঙ্গে।

কি করবে ঠিক বুঝতে পারে না যেন শশাংক। কিন্তু একটা বিষয়ে অন্তত সে নিশ্চিন্ত হয়।

দিগেন সান্যাল তাহলে সিংগাপুর থেকে যাত্রীদের নিয়ে যে ক্রিশ্চানা জাহাজটা আসছিল—সে জাহাজডুবিতে মারা যাননি! বেঁচে আছেন!

যেতে লিখেছেন দিগেন সান্যাল! সুব্রতকে না জানিয়ে একাকী যাবে সে দিগেন সান্যালের ওখানে? অবিশ্যি দিগেন সান্যাল তার পরমাত্মীয় কাকার পরম বন্ধু!

কে জানে, দিগেন সান্যাল হয়ত অনেক খবরই দিতে পারে। হয়ত সেই কাকার অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয়াংশ—যা এখনও তার হস্তগত হয়নি, তারও কোন একটা সন্ধান পাওয়া যাবে ওঁর কাছ থেকে!

কিন্তু সেই সঙ্গে মনে হয়, একথাও তো অস্বীকার করলে চলবে না আজ; সুব্রতবাবুও আজ সত্যিই তার হিতাকাঙ্ক্ষী।

গত কয় দিনের ঘটনাবলী ছায়াচিত্রের মত শশাংকর মানসপটে স্পষ্ট হয়ে একের পর এক ভেসে যায়। একটার পর একটা বিপদের সেই বেড়াজাল—সেই চরমতম মুহূর্তে অদৃশ্য বন্ধুর কল্যাণ হাতখানি!

চারিদিক থেকে বিপদ এমন ভাবে তাকে ঘিরে ফেলেছে যে কে যে তার শত্রু আর কে মিত্র কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারছে না। কাউকেই আজ আর সে বিশ্বাস করতে পারছে না!

অথচ তাকে আজ কাকার এত কষ্টের গবেষণার ফলাফল যে পাণ্ডুলিপির মধ্যে ছিল সেটা যেমন করেই হোক উদ্ধার করতে হবে। তার কাকার নারকেলডাঙ্গার বাড়ির আয়রন সেফ্ থেকে সাংকেতিক শব্দের সাহায্যে তালা খুলে গবেষণার যে পাণ্ডুলিপিটা সে নিয়ে এসেছিল, সেটা পাণ্ডুলিপির অর্ধাংশ মাত্র তা তো ও জানে, গবেষণার যে বাকী অর্ধাংশ, পাণ্ডুলিপির সেটা আছে ঐ নারকেলডাঙ্গার বাড়িরই লাইব্রেরী ঘরের একটা পুস্তকের আলমারির মধ্যেই।

শত্রুপক্ষ নিশ্চয়ই এ সংবাদ জানে না। এমন কি তার কাকার লীগ্যাল অ্যাড্‌ভাইসার স্বয়ং দিগেন সান্যালও জানে কিনা তাতেও ওর সন্দেহ আছে। ওর যতদূর মনে হয়, একমাত্র সে-ই জানে এবং কাকা তাকে তা সিংগাপুর যাত্রার পূর্বে বলে গিয়েছিলেন। এ কথাটা অবিশ্যি অজয় মিত্র তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলে গিয়েছিলেন বটে, তবে একটা কথা বলে যান নি, সেই আলমারির সাংকেতিক তালাটা খুলবার গুপ্ত সংকেতটা। আয়রন সেফের তালা খুলবার সংকেত Ace of Spadesয়ের মত সেই তালাটি খুলবারও একটি গোপন সংকেত আছে। যা একমাত্র তার কাকা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন প্রাণীই জানত না। এবং একমাত্র এ কারণেই ও সম্পর্কে শশাংকও কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেনি।

কিন্তু এত পরিশ্রম, এত কষ্ট স্বীকার করেও তো শেষ পর্যন্ত কূলে এসে তরী ডুবে গেল। তার

BanglaBook.org

কাকা অজয় মিত্রের এত পরিশ্রমের সাধনালব্ধ ফলের কিছুটা অংশ সে তার নিজের আহাম্মকীর জন্য গঙ্গাসলিলেই চিরতরে বিসর্জন দিয়ে এল।

শত্রুপক্ষ সেটা পেল না বটে কিন্তু জগতেরই বা কি উপকার হলো? সে নিজেও তো সেটা হারিয়ে ফেলল। বাকী অর্ধাংশ পেয়েও তো কোন আর লাভ হবে না। একটি অংশকে বাদ দিয়ে অন্য অংশটির তো কোন মূল্যই নেই। বিজ্ঞানের এত বড় একটা আবিষ্কার কি ভাবে নষ্ট হয়ে গেল!

শত্রুপক্ষও অবিশ্যি কোন সুবিধা করতে পারবে না—কারণ তাদের হাতে যা আছে মনে হচ্ছে সেটা যে অংশটা সে গঙ্গার জলে হারিয়েছে তারই একটা Copy মাত্র।

কাকা যদি বেঁচে থাকতেন, হয়ত তাঁর আবিষ্কার আবার লোকচক্ষুর সামনে দেখা দিত। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে আশার আলোটুকুও নির্বাপিত হয়েছে।

হঠাৎ এমন সময় টেলিফোন বেজে ওঠে ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...

শশাংক একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই পাশের কক্ষে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নেয়, হ্যালো!

কে শশাংকবাবু? আমি সুব্রত কথা বলছি। একটা ব্যাপার তখন আপনাকে সকালে তাড়াতাড়ি জানানো হয়নি। সত্যি কথা বলতে গেলে অবশ্য তাড়াতাড়িতে জানানো হয়নি যে তা নয়, কতকটা ইচ্ছা করেই বলিনি। পরে ভেবে দেখলাম পথে আসতে আসতে, আপনাকে কথাটা, বলাই আমার উচিত ছিল।

কি—কি কথা সুব্রতবাবু!

দেখুন আগে আপনার ঘর খালি তো? বাইরে একটু দেখুন—আশেপাশে কেউ আছে কিনা?

শশাংক চট্ করে রিসিভারটা রেখে, ঘরের বাইরেটা একবার দেখে নিয়ে এসে বলল, না, আশেপাশে কেউ কোথাও নেই।

নেই তো?

না। বলুন।

আপনার সেই জিনিসটা কিন্তু খোয়া যায়নি—

অ্যাঁ! একটা অর্ধস্ফুট আনন্দে চীৎকার করে ওঠে শশাংক। সমস্ত দেহটা তার উত্তেজনায় আনন্দে কাঁপতে থাকে যেন।

হ্যাঁ! সেটা নিরাপদ জায়গাতেই আছে জানবেন।

কিন্তু কোথায়—কোথায় আছে সেটা সুব্রতবাবু?

বিশ্বাস করুন—আমি বলছি আপনাকে সেটা খুব নিরাপদ জায়গাতেই আপাততঃ আছে, তবু জানতে চাইবেন না কোথায় আছে সেটা—আমি কিন্তু এখন বলবো না।

নিরাপদ আছে আমি তাতেই যে কি পরিমাণ নিশ্চিন্ত হয়েছি সুব্রতবাবু আপনাকে তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না। আপনি ফোন করবার ঠিক আগের মুহূর্তটিতেই ভাবছিলাম এত পরিশ্রম এত কষ্ট সবই বুঝি বিফলে গেল!

যাক্, আপনি নিশ্চিন্ত হলেন তো? এখন আমার একটা জরুরী কাজ আছে এক জায়গায়, এখুনি সেখানে একবার যেতে হবে। সন্ধ্যার পর আবার দেখা হবে। চলি।

শশাংকর কোন আর উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করে সুব্রত ওদিক থেকে কানেক্শনটা ছেড়ে দিল।

BanglaBook.org

শশাংক তাড়াতাড়ি ট্যাপ্ করে। কিন্তু না, কানেক্শন কেটে দিয়েছে। আবার সে কানেক্শন চাইল, কিন্তু এবার আর সুব্রতর গলা শোনা গেল না। বাড়ির ভৃত্য জানাল, এইমাত্র সুব্রতবাবু গাড়ি নিয়ে কোথায় বের হয়ে গেলেন। কখন ফিরবেন তাও সে জানে না।

একান্ত হতাশ হয়েই শশাংক ফোনটা নামিয়ে রাখল।

সমস্ত শরীরটা অসহ্য ক্লান্তিতে অবসন্ন। ক্লান্তিতে দু'চোখের পাতায় নিদ্রা যেন পাথরের মত ভারী হয়ে নেমে আসতে চাইছে। নিদ্রা! একটা টানা দীর্ঘ নিদ্রার একান্ত প্রয়োজন।

শশাংক কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ করে সোজা স্নানঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল।

স্নান সেরে কিছু আহার করে শশাংক এসে শয্যার উপরে গা এলিয়ে দিল। শীতের বেলা—এর মধ্যেই বেশ যেন প্রখর হয়ে উঠেছে, শীত-শীত বোধ হওয়ায় গায়ে একটা কম্বল টেনে নিয়ে শশাংক চোখে বোজে। কিন্তু চোখ বুজলেও ঘুম আসে না। কত প্রকারের চিন্তাই যে একটার পর একটা এসে মস্তিষ্কের কোষগুলিতে ভীড় করছে! মন্দের ভাল তবুও একটা যে মূল্যবান এক্স্‌পেরিমেন্টের কপিগুলো শত্রুর হাতেও পড়েনি এবং খোয়াও যায়নি!

সুব্রতবাবু বললেন, সেগুলো নাকি নিরাপদ জায়গাতেই আপাততঃ আছে।

তবে কি সুব্রতবাবুই সেগুলো কোনমতে নিজের হাতে নিয়ে কোন নিরাপদ জায়গায় রেখে দিয়েছেন? কিন্তু কেমন করেই তাই বা সম্ভব হলো? কখনই বা সুব্রতবাবু সেগুলি পেলেন? কাগজগুলো তো লেফাফার মধ্যে তার কোটের ভিতরের পকেটেই ছিল। একসঙ্গে দু'জনে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপর দুজনেই সাঁতার কাটতে শুরু করেন।

গুলির শব্দে শশাংক ভয় পেয়েই বাবা গো বলে চীৎকার করে উঠেছিল। কাঁধের উপরে যা লেগেছে সামান্য একটু। বিশেষ আহত হয় নি। তারপরেই সে জ্ঞান হারায়। জ্ঞান ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার দেখে সে শত্রুপক্ষের হাতে এসে পড়েছে।

আশেপাশে কোথাও সুব্রত নেই।

ভিতরে আসতে পারি কি? দরজার বাইরেই সুমিষ্ট মেয়েলী কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

মুহূর্তে শশাংকর চিন্তাজাল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। চোখের অনুসন্ধানী দৃষ্টিটা গিয়ে ঘরের খোলা দরজায় নিবদ্ধ হলো।

ত্রস্তে উঠে বসে শশাংক শয্যার উপরেই, কে?

আবার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ভিতরে আসতে পারি কি?

আসুন! শশাংক শয্যা থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণ।

পরমুহূর্তেই ঘরে এসে ঢোকে একজন তরুণী। তরুণীর বয়স ২৪।২৫য়ের বেশী নয়। একহারা পাতলা চেহারা। গায়ের বর্ণ কালো হলেও তার মধ্যে একটা সজীব শ্যামল আভা আছে। অপূর্ব সুন্দর মুখশ্রী। সহজ সুন্দর লাবণ্যে যেন ঢলঢল রমণীয়। পাতলা ঠোঁট, সরল নাসিকা, গভীর আঁখিপল্লবে ঢাকা দু'টি চক্ষু। ঠোঁটের কোণায় অপূর্ব একটি হাসির মাধুর্য যেন।

পরনে সাধারণ সাদা মিলের কালোপেড়ে একটি শাড়ি— গায়ে সাদা লংক্লথের ব্লাউজ। পায়ে ক্রেপ্-সোলের প্লাস্টিকের তৈরী ফ্ল্যাট্হীল জুতো। হাতে দু'গাছা করে সোনার চুড়ি ছাড়া আর কোন আভরণ নেই।

নমস্কার!—হাত দু'টি তুলে, সুন্দর ভঙ্গীতে অভিবাদন জানায় আগন্তুক তরুণীটি।

BanglaBook.org

নমস্কার! কোনমতে প্রতি-নমস্কার জানায় শশাংক।

এই চেয়ারটায় বসলাম কিন্তু, আপনিও বসুন। আপনার সঙ্গে কতকগুলি বিশেষ জরুরী কথা আছে। হেসে তরুণী কথাগুলি বলে।

শশাংক কতকটা যেন হতবুদ্ধির মতই আর একটা চেয়ারে উপবেশন করে।

॥ ৩ ॥

অত্যন্ত সপ্রতিভ তরুণীটি।

খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন বোধ হয় হঠাৎ আমাকে এভাবে সোজা এই ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখে মিঃ মিত্র। অবিশ্যি ভেবেছিলাম খবর দিয়েই আসবো, কিন্তু বাড়িতে ঢুকে দেখলাম কোথাও কেউ নেই। সোজা উপরে চলে এসেছি নির্ভয়ে, উপরে উঠে দেখি সব ঘর খালি, তারপর হঠাৎ এই ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলাম আপনি শুয়ে। প্রথমে ভেবেছিলাম আপনি হয়ত ঘুমোচ্ছেন। কাল রাত্রে বিশেষ করে যে ধকলটা আপনার শরীরের উপর দিয়ে গিয়েছে—

আপনি—

ব্যস্ত হবেন না। সব একে একে বলবো। বুঝতেই পারছেন আপনার সব কিছুই আমি জানি, এমন কি এও জানি—রাত্রে ডায়মণ্ডহারবার থেকে মাইলখানেক দূরের গ্রামের এক পোড়ো বাড়িতে আপনি আটক ছিলেন, তারপর সেখান থেকে একজনের সাহায্যে আপনি—

আপনিই কি তবে সেই অদৃশ্য—

মৃদু হেসে তরুণী বলে, না। তিনি এবং আমি মোটেই এক ব্যক্তি নই!

তবে?

তাহলেও আমি সব জানি। কেমন করে আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে, সেটা অবিশ্যি বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক বলেই উহ্য রাখছি। প্রাসঙ্গিক যা তাই আগে আলোচনা করা যাক, কি বলেন?

কিন্তু—

আমার নামটা আপনার জানা প্রয়োজন নিশ্চয়ই—আমার নাম নীলিমা!

নীলিমার কথা শেষ হলো না, স্বরূপদা এসে ঘরে প্রবেশ করে নীলিমাকে দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল।

কিন্তু বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সংকোচের বালাই যেন নেই নীলিমার মধ্যে কোথায়ও। সে সহজকণ্ঠে বলে ওঠে, দেখে মনে হচ্ছে, আপনাদের বাড়িরই কেউ হবে—কে?

অনেকদিন আছে এ বাড়িতে, ভৃত্যের কাজ যদিও করে—আমরা ওকে 'স্বরূপদা' বলেই ডাকি!

স্বরূপদা! বেশ। স্বরূপদা, বড় তেষ্টা পেয়েছে, এক কাপ চা খাওয়াতে পারো? নীলিমা স্বরূপদার দিকে চেয়ে বলে।

যাও স্বরূপদা চা নিয়ে এসো! শশাংক বলে।

স্বরূপ ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

যাক্ এবার শুনুন মিঃ মিত্র, আমি কে বা আমার সত্যিকার পরিচয় কি তা নিয়ে আপাততঃ মাথা ঘামাবেন না। এইটুকু শুধু জেনে রাখুন—আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। আপনার ভালটাই আমি চাই—

BanglaBook.org

কিন্তু—

আবার কিন্তু না!—এর মধ্যে আর কিন্তু নেই। কিন্তু সব ভুলে যান। পরিচয় না দেবার আপাততঃ একটা কারণ আছে অবশ্যই—কারণটা হচ্ছে আমার পরিচয় জেনে আপনি হয়ত আমাকে বিশ্বাস করতে পারবেন না। তাই সত্য পরিচয়টুকু দিলাম না আপাততঃ আমার। তাছাড়া আমাকে এভাবে হুট্ করে একজন অচেনা ভদ্রলোকের কাছে আসতে দেখে ও এইভাবে কথা বলতে দেখে মনে মনে হয়ত খুবই আশ্চর্য হচ্ছেন মিঃ মিত্র, কিন্তু আমি একজন বাঙালী মেয়ে হলেও বাংলা দেশে আমি মানুষ নই—আঠার বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি লাহোরে দাদুর কাছে মানুষ! দাদু আমাকে নিজের ছেলের মত করেই পালন করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার— শেষ পর্যন্ত কপালে আমার সে সুখ টিকলো না। অকস্মাৎ—দাদুর হাই ব্লাড্‌প্রেসার ছিল, করোনারীতে মারা গেলেন। আমাকেও সেই নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে একপ্রকার বাধ্য হয়েই দীর্ঘকাল পরে বাংলাদেশে আমার মা-বাবার আশ্রয়ে ফিরে আসতে হলো—কথাগুলো বলতে বলতে সহসা যেন একটু থামে নীলিমা।

রুদ্ধনিঃশ্বাসে শশাংক তরুণীর কথাগুলো শুনছিল, বললে, তারপর?

হয়ত ভাবছেন নিশ্চয়ই, এসব কথা কেন বলছি আপনাকে! কারণ আছে তাই বলছি—হ্যাঁ যা বলছিলাম, এখানে এসে আমাকে যেখানে উঠতে হলো, দু'চার দিন না যেতেই বুঝলাম যে সেটা আমার পক্ষে একটা জীবন্ত নরকখানা ছাড়া আর কিছুই নয়! চারিদিকে বিষের হাওয়া, শ্বাস আমার বন্ধ হয়ে এলো, চলে যাবো বলে স্থির করছি—ঠিক সেই সময়ে জানতে পারলাম আমার চাইতেও এক হতভাগ্য, যে জীবনের দীর্ঘ পঁচিশটা বছর ধরে যম-যন্ত্রণা প্রতি মুহূর্তে প্রতি পলে সহ্য করেছে—তার মুখের দিকে তাকিয়েই স্থান ত্যাগ করা আর আমার হয়ে উঠলো না। তখন একটা জীবনের সঙ্গে আপোস করে ফেললাম। বলতে বলতে তরুণী আবার একটু হাসল।

হ্যাঁ, সেই compromise করতে গিয়েই আজ আমি যা বর্তমানে তাই!

স্বরূপ চা নিয়ে এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

এই যে স্বরূপদা—চা এনেছো! সাগ্রহে স্বরূপের হাত থেকে কাপ-ভর্তি সোনালী রংয়ের ধূমায়িত চায়ের কাপটা নিয়ে, মৃদু একটা চুমুক দিয়ে নীলিমা বললে, আঃ, চমৎকার চা'টি বানিয়েছো তো স্বরূপদা! আচ্ছা এখন তুমি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যেতে পার স্বরূপদা। তোমার দাদাবাবুর সঙ্গে আমার কয়েকটা জরুরী কথা আছে।

স্বরূপ শশাংকর মুখের দিকে তাকায়।

শশাংক চোখের ইঙ্গিতে স্বরূপকে কক্ষ ত্যাগ করতে বলে। স্বরূপ কক্ষ থেকে বের হয়ে গেল নিঃশব্দে।

নীলিমা তখন আবার তার অর্ধসমাপ্ত কথা শুরু করে। আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয়টা না জানলে আমায় বুঝতে পারতেন না—তাই ভণিতাটুকু সেরে নিলাম। এবার আসল কথায় আসা যাক— কেন এসেছি এখানে, আমি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে চাই—

সাহায্য!

হ্যাঁ, আমি জানি একটা মূল্যবান পাণ্ডুলিপি—চম্‌কে উঠলেন না! কিন্তু আমি জানি কিভাবে আপনি পাণ্ডুলিপিটা রক্ষা করবার চেষ্টা করছেন—

সপ্রতিভ তরুণীটির কথায়-বার্তায় চালচলনে শশাংক সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মৃদু হেসে প্রশ্ন করলে, কিন্তু তাতে আপনার লাভ?

BanglaBook.org

লাভ! দেখুন দাদু আমাকে সব চাইতে যে বড় শিক্ষাটা দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে—সত্য ও ন্যায়ের পথকেই যেন সর্বদা গ্রহণ করি। সেই জন্যই যেখানে অসত্য বা অন্যায় তার বিরুদ্ধে আমার সংগ্রাম। একটা বহু মূল্যবান জিনিসকে একদল লোক অন্যায় করে পরদেশীর হাতে অর্থের বিনিময়ে তুলে দিতে চাইছে, যা হারালে আমাদের দেশের অনেকখানি ক্ষতি হবে— দেশেরই এক মনীষীর আবিষ্কৃত একটা মূল্যবান গবেষণা অন্য দেশে চলে যাবে এ আমি কিছুতেই হতে দেবো না। আপনার সংগ্রাম যখন তারই বিরুদ্ধে— আমিও আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আপনাকে সাহায্য করতে চাই—

আপনার প্রচেষ্টা ও ইচ্ছার জন্য হাজারো ধন্যবাদ আপনাকে নীলিমা দেবী। তবে বুঝতে পারছি না, একজন স্ত্রীলোক হয়ে কি ভাবে আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন এ ব্যাপারে?

মেয়েমানুষ বলে অবহেলা করবেন না মিঃ মিত্র। রামচন্দ্রের সাগর-বন্ধনে সামান্য কাঠবিড়ালও তাঁকে সাহায্য করেছিল জানেন তো?

জানি, কিন্তু—

কিন্তু নয়—এই শত্রুপক্ষের অনেক কথাই আপনি জানেন না; কিন্তু সৌভাগ্য আমার, আমি জানি—তবে হ্যাঁ, একটা শর্তে— কেমন করে আমি সব জানলাম সেটা যেমন আপনি কখনো প্রশ্ন করতে পারবেন না তেমনি আমার সত্যিকারের পরিচয়টাও জিজ্ঞাসা করতে পারবেন না কখনো। তারপর একটু থেমে নীলিমা বলে, তবে হ্যাঁ, যদি সামান্য একজন মেয়ের কাছ থেকে সাহায্য নিতে আপনার গৌরবের ভ্যানিটিতে আঘাত লাগে, তাহলে অবিশ্যি—

না, না—এ আপনি কি বলছেন নীলিমা দেবী! আমি সানন্দ-চিত্তেই আপনার সাহায্য নেবো। এখন বলুন শুনি ঠিক কি জন্যে আপনি আমার এখানে এসেছেন!

নিঃশেষিত চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখতে রাখতে নীলিমা বললে, সেই কথাই এবার বলবো।

॥ ৪ ॥

নীলিমা বলে চলে, বলবো কিন্তু তার আগে একটিবার আপনাকে বাইরে যেতে হবে।

কেন?

কারণ আপনার বারান্দা দিয়ে আসতে আসতে একটা জিনিস আমার নজরে পড়েছে, জানি না অবশ্য সেটা আপনার নজরে এখনও পর্যন্ত পড়েছে কিনা—

নীলিমার মুখের দিকে তাকাল সবিস্ময়ে শশাংক, কি বলুন তো?

অনুগ্রহ করে একবার তাহলে আমার সঙ্গে বাইরের ঐ বারান্দায় চলুন!—

কতকটা কৌতূহলভরেই শশাংক উঠে দাঁড়ায়, চলুন!

আসুন। নীলিমা অগ্রসর হয় দরজার দিকে, শশাংক তাকে অনুসরণ করে।

আগে আগে নীলিমা এবং তাকে অনুসরণ করে শশাংক সামনে ঘুরে টানা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

কোথায় কি? শশাংক প্রশ্ন করে।

আসুন না। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? মৃদু হাস্যোৎফুল্ল তরল কণ্ঠে নীলিমা বলে।

পর পর বেশ বড় সাইজের পাঁচখানা ঘর। সেই ঘরগুলিরই সংলগ্ন আগাগোড়া সামনে টানা প্রশস্ত বারান্দা—রেলিংয়ের গা ঘেঁষে। সারি সারি পাতাবাহারের টব।

BanglaBook.org

নীচে কোথায় বাগানে বোধ হয় এখনও কোন গাছে গন্ধরাজ ফুল ফুটছে, তারই মিষ্টি সৌরভে সেখানকার বাতাস মন্থর।

বারান্দার একেবারে শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে নীলিমা অঙ্গুলিনির্দেশে দেখাল, দেখুন বারান্দায় কার যেন পায়ের ছাপ! কাদা মাখা পায়ের সুস্পষ্ট ছাপ!

সত্যিই শশাংক তাকিয়ে দেখলে, বারান্দায় সুস্পষ্ট যেন কারো জোড়াপায়ের ছাপ।

বেশ মোটা ও ভারী পায়ের ছাপ পড়েছে।

এ পায়ের ছাপ—মানে এত দীর্ঘ পায়ের ছাপ যে আপনার বা আপনার ভৃত্য স্বরূপদার নয়, এ আমি আপনাদের পা না দেখলেও বলতে পারি। আপনার অবর্তমানে এবং স্বরূপদার অজ্ঞাতে কাল রাত্রে কোন রবাহূত মহাপুরুষের এই গৃহে পদার্পণ ঘটেছিল—সম্ভবত এ তারই পদচিহ্ন! তাছাড়া সামনেই একতলা থেকে ওঠবার সিঁড়ি—ডান দিককার ঐ ঘরের দরজাটা দেখছি খোলা—

পায়ের ছাপ দেখে শশাংকও বুঝতে পেরেছিল এ পায়ের ছাপ তার বা স্বরূপদার নয়। সামনে ডান দিককার ঘরটা তার লাইব্রেরী ঘর।

ঘরটা অবিশ্যি সাধারণত খোলাই থাকে, কিন্তু দরজা খোলা থাকে না।

এগিয়ে গিয়ে খোলা দরজাপথে শশাংক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। এবং তাকে অনুসরণ করে ঘরে এসে প্রবেশ করল নীলিমা।

একটা জিনিস ঐ পায়ের পাতার ছাপে লক্ষ্য করেছেন কি মিঃ মিত্র? নীলিমা আবার প্রশ্ন করে।

কি? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল শশাংক।

যিনি আপনার গৃহে গতরাত্রে পদার্পণ করেছিলেন, তাঁর পায়ের পাতার সামনের দিকটা চলার সময় মাটিতে বেশী জোর দিয়ে চলেন। অর্থাৎ আমরা যাকে বলি, হাতির মত থপ্ থপ্ করে চলা গজেন্দ্রগমন, কিন্তু যাক গে সে কথা—কাল রাত্রে এই বাড়িতে কেউ একজন এসেছিলেন সেইটাই বড় কথা নয়, কথা হচ্ছে একটিবার বাড়িটা ভাল করে দেখুন আপনার কিছু খোয়া গেছে কিনা! কারণ আমাদের জানা প্রয়োজন, সেই মহানুভবের আবির্ভাবটি এ গৃহে কেন ঘটেছিল? অর্থাৎ উদ্দেশ্য কি ছিল সেই অনাহূত আগন্তুকের গত রাত্রে!

হয়ত সেই বহু মূল্যবান গবেষণার পাণ্ডুলিপিটি হাতাবার জন্য—

অবিশ্যি! যিনি এসেছিলেন গতরাত্রে, তিনি আপনার মিত্রপক্ষ নন! সুনিশ্চিত চোরের মত লুকিয়ে-চুরিয়ে অধিক রাত্রে যারা অন্যের গৃহে আনাগোনা করে, তারা আর যাই হোক মিত্রপক্ষ নয়। অতএব ধরে নিতে বাধা নেই এক্ষেত্রে শত্রুপক্ষই। কিন্তু শত্রুপক্ষ তো বেশ ভাল করেই জানে সে কাগজগুলো আপনার কাছে নেই। তাছাড়া কাল রাত্রেই যখন এসেছিল তারা তখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে আপনার ডায়মণ্ডহারবারের সেই বাগানবাড়ি থেকে চলে আসবার পরই হয়ত তারা এখানেই সর্বাগ্রে আপনাকে খুঁজতে এসেছিল!

আমি যে ডায়মণ্ডহারবারে একটা পোড়ো বাড়িতে বন্দী ছিলাম আপনি জানলেন কি করে?

একটু আগেই তো বললাম, অনেক কিছুই আমি জানি আপনার ব্যাপারে—যাক সে কথা, যা বলছিলাম, খুব সাবধানে এবারে আপনাকে চলাফেরা করতে হবে, শত্রুপক্ষের লোকেরা সর্বদাই এখন চেষ্টা করবে আবার আপনাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের হাজতে পুরতে!

কিন্তু তাতে লাভ কি? কাগজগুলো তো সত্যিই আমার কাছে নেই!

BanglaBook.org

নাই বা থাকল। কান টানলে মাথা আসে প্রবাদ আছে যখন তখন কাগজের মালিককে হাতে রাখতে পারলে একদিন যে কাগজগুলোও হাতে আসবে না তাই বা কে বলতে পারে! তাছাড়া হেরে যাবার লজ্জা অপমান কে সইতে চায় বলুন! শেষ পর্যন্ত সেই আক্রোশে তারা আপনাকে হয়ত হত্যা করেও তৃপ্তি পেতে পারে।

নিজের অজ্ঞাতেই শিউরে উঠে শশাংক অর্ধস্ফুট ভাবে বলে, হত্যা!

হ্যাঁ। বিচিত্র কি! যাক্ পরের কথা পরে ভাবলেও চলবে, আপাততঃ চলুন আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে—অর্থাৎ যে জন্য এসেছি—

এখানে—মানে এই ঘরেই বসা যাক না!

বেশ তো, আপত্তি কি?

দু'জনে তখন দুখানা কুশন মোড়া চেয়ার টেনে নিয়ে মুখোমুখি বসে।

শশাংক প্রশ্ন করে, বলুন কি বলছিলেন?

আমি জানি ওরা মানে আপনার পরম বন্ধুর দল আপনার কাছে কাগজগুলো পায়নি, কিন্তু কথা হচ্ছে সত্যি কাগজগুলো কি খোয়া গেছে না কি?

শশাংক হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারে না নীলিমার প্রশ্নের।

চকিতে একটা কথা ওর মনে পড়ে, মেয়েটা শত্রুপক্ষেরই কেউ নয় তো! একে পাঠানোও এখানে তাদের একটা বড় চাল বা চাতুরী নয় তো! মেয়েটি তা না হলে এত গোপন কথাই বা জানবে কি করে—তাছাড়া পরিচয় দিতেও সে ইচ্ছুকই বা নয় কেন?

সন্দেহ বড় সংক্রামক। একসঙ্গে অনেকগুলো 'কেন' মনের মধ্যে এসে শশাংকর চারিদিক হতে উঁকিঝুঁকি দিয়ে ওঠে, মনে দোলা জাগায়।

আশ্চর্য! আশ্চর্য! এ কথাটা এতক্ষণ একবারও তার মনে হয়নি কেন?

শশাংককে হঠাৎ ওরকম ভাবে চুপ করে থাকতে দেখে নীলিমা প্রশ্ন করে, কি হলো মিঃ মিত্র, কি ভাবছেন? আমার কথার জবাব দিচ্ছেন না কেন?

তাই তো! কি বলে এখন এই মেয়েটির মনে কোনরকম সন্দেহের না উদ্রেক করে ব্যাপারটা ম্যানেজ করা যায়!

সহসা নীলিমা খিলখিল করে সুমিষ্ট হাসি হেসে ওঠে, কি হলো মিঃ মিত্র! মনে হচ্ছে যেন হঠাৎ আমার উপরে সন্দেহ জেগেছে! ভয় নেই মশাই, ভয় নেই। আমি কোন শত্রুপক্ষের ট্র্যাপ নই, please বিশ্বাস করুন।

শশাংকর এই সামান্য ক'দিনে নেহাৎ কম শিক্ষা হয়নি।

সে ভাবে, কি জবাব দেবে?

বিশ্বাস করুন আপনি, দোহাই আপনার—আপনার কাকার মূল্যবান একস্‌পেরিমেন্টের কপিগুলো হাতাবার কোন সৎ উদ্দেশ্যই আমার কস্মিনকালে কুত্রাপি ছিলও না, এখনও বর্তমানে নেই। বরং যাতে করে সেগুলো নিরাপদে থাকে, সে উদ্দেশ্য নিয়েই আপনার সাহায্যার্থে আমি এগিয়ে এসেছি নিজের প্রভূত risk নিয়েও।

হয়ত মেয়েটির কথাই সত্যি। শশাংক নীরব দৃষ্টিতে নীলিমার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকায়। সহজ সরলতা মাখানো মুখখানি। স্মিত-হাস্যে ঢল ঢল কমনীয়। নিশ্চয়ই ও মুখের অন্তরালে কোন দুরভিসন্ধি নেই।

কিন্তু এও তো সে শুনেছে, অমনি সহজ সরল চোখই সহসা ছুরির ফলার মত ঝিকিয়ে ওঠে।

BanglaBook.org

সুন্দর পেলব কমনীয় অঙ্গুলিগুলি অকস্মাৎ ধারালো তীব্র নখর বিস্তার করে। বিশেষ করে মেয়ে জাত।

শশাংকবাবু!

চিন্তিত শশাংক নীলিমার মুখের দিকে তাকাল। অদ্ভুত পরিবর্তন মুহূর্তে যেন দেখা দিয়েছে নীলিমার মুখখানিতে। একটু আগের সেই হাস্য-তরল অম্লান মাধুর্যের যেন এতটুকু অবশিষ্টও নেই কোথাও।

সমগ্র মুখখানি ব্যেপে কেমন যেন একটা গাম্ভীর্য। মুহূর্ত-পূর্বের সেই হাসির চিহ্নমাত্রও যেন কোথায়ও আর অবশিষ্ট নেই।

বলুন? মৃদুকণ্ঠে শশাংক বলে।

বিশ্বাস করুন শশাংকবাবু, আমি আপনার শত্রুপক্ষ নই। আমি আপনাকে সাহায্য করতেই চাই। কাগজগুলো কোথায় তা আমি জানতে চাচ্ছি না, আপনার কাছে কেবল এইটুকু জানতে চাই কাগজগুলো কোন নিরাপদ জায়গাতে আছে কিনা?

আছে। একান্ত নিজের অজ্ঞাতেই যেন অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল শশাংক।

বেশ। আর একটা কথা, সুব্রতবাবুকে আপনার সত্যিই বন্ধু বলে জানবেন। সুব্রতবাবুর নাম আমি শুনেছি বটে, তবে সাক্ষাৎ পরিচয়ের এখনো কোনো সুযোগ ঘটেনি।

শশাংক চুপ করে থাকে। কোন জবাব দেয় না।

আর নিজের বাড়ি হলেও সর্বদা খুব সাবধানে থাকবেন, কারণ আপনার প্রতিপক্ষ অত্যন্ত ধূর্ত ও ক্ষমতাশালী। আরো একটা কথা আপনার জানা দরকার, আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি, আপনার কাকার একস্‌পেরিমেন্টের কাগজপত্রগুলো একজন দুর্ধর্ষ লোক জাপানের কাছে বহু টাকার বিনিময়ে এখনো বিক্রী করার চেষ্টা করছে—

জানি আমি তা।

শুধু তাই নয়, আরো একটা ব্যাপার বোধহয় জানেন না—আপনার শত্রুপক্ষের দলপতি যার ইঙ্গিতে একটা দল সমস্ত কাজ করে চলেছে লোকটা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ শয়তান। লোকটার আসল পরিচয় যে কি তা কেউ সঠিক জানেন না। লোকটা শুনেছি অসাধারণ চতুর, ক্ষিপ্র ও শক্তিশালী। দু'তিনটে ভারতীয় ভাষায় অনর্গল কথা বলে যেতে পারে, আত্মগোপনের আড়াল থেকে নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রকাণ্ড একটা দলকে অনায়াসেই অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত করে সর্বদা। কখন কোথায় যে সে থাকে কেউ জানে না, মুখে সর্বদা একটা মুখোস আঁটা থাকে। আজ পর্যন্ত শুনেছি কেউ নাকি তার মুখের আসল চেহারাটাও দেখতে পায়নি। লোকটার ব্যবহার দয়া মায়া মমতা চক্ষুলজ্জা বলে কোন পদার্থ নেই। লোকটা শুনেছি সামান্যমাত্র স্বার্থের জন্যও মানুষ খুন করতে পারে। আবার এও শোনা যায় দলপতি হিসাবে নাকি মধ্যে চার-পাঁচটা লোককে সে খাড়া করে রেখেছে। কে যে আসল তার মধ্যে—অর্থাৎ কে যে আসল দলপতি শিবের বাবারও অসাধ্য জানা। লোকটার আর একটা পরিচয় হচ্ছে—নেকড়ের থাবা।

॥ ৫ ॥

শশাংক স্তম্ভিত হয়ে নীলিমার কথাগুলো শুনছিল। বিস্ময়ে সে সত্যিই যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে। তার বিপদের সত্যিকারের গুরুত্বটা যেন এতক্ষণে সত্যি সে উপলব্ধি করে।

BanglaBook.org

নেকড়ের থাবা!

নীলিমা আবার বলে, তবে ঘটনাচক্রে গভীর রাত্রে সামান্য কোন একদিন হ্যারিকেনের আলোয় মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য গোপনে অন্তরাল থেকে ''নেকড়ের থাবা'' নামধারী একজনকে দেখবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য—কিন্তু এখনও জানি না যে তিনিই আসল কি নকল! তবে আমার মনে হয় আসল সে নয়, নকলের একজন—

কেন? একথা আপনার মনে হবার কারণ?

সহজ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে দেখুন, যে লোকটা এত ধূর্ত অত সহজে সে কখনো কারো কাছে কি আত্মপ্রকাশ করে, না করতে পারে?

কিন্তু এমনও তো হতে পারে সত্যিকারের যে আসল 'নেকড়ের থাবা' সে নিজেকে সহজলভ্য রেখে, অন্য নকল 'নেকড়ের থাবা'গুলোকে দুর্লভ করে রেখেছে বলেই!

নীলিমা বলতে থাকে, আশ্চর্য নয় কিছু আপনি যা বললেন! কিন্তু যাক সে কথা, আরো একটা কথা আপনি হয়ত জানেন না মিঃ মিত্র, সিংগাপুর থেকে ইভাকুইর দলবল নিয়ে যে 'ক্রিশ্চানা' জাহাজটা সলিলগর্ভে সমাধিলাভ করে, তার অনেক যাত্রী একটা সাবমেরিনের সাহায্যে রক্ষা পায়। এবং পরে সেই সাবমেরিন তার যাত্রীদের বঙ্গোপসাগরের মধ্যে এসে একটা জাহাজে তুলে দেয়। সেই জাহাজখানি নির্দিষ্ট দিনে ডায়মণ্ডহারবারের উপকূলে এসে যথাসময়ে যাত্রীদের নামিয়ে দেয়। শুনেছি আপনার কাকা অজয় মিত্রের লীগাল অ্যাডভাইসার দিগেন সান্যালও নাকি ঐ জাহাজেই ছিলেন এবং প্রাণে রক্ষা পেয়ে গিয়েছেন—

শুনেছি ঐরকমই বটে!

কিন্তু সত্যি সত্যিই কি দিগেন সান্যাল ঐ জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন কি না জানেন কিছু?

না, এখনও সঠিক জানি না বটে—তবে আমার নিশ্চিত ধারণা তিনি এখনো প্রাণে বেঁচে আছেন।

তাহলে আপনি জানেন না এখন তিনি কোথায় আছেন?

না।

শশাংক একবার ভাবে আজই সকালে এখানে ফিরে আসবার পর দিগেন সান্যালের স্বাক্ষরিত যে পত্রখানা সে পেয়েছে তার কথা উল্লেখ করে, তাতে করেই তো সে জেনেছে দিগেন সান্যাল কোথায় আছে বর্তমানে, কিন্তু পরক্ষণেই কি ভেবে আপাততঃ সে কথাটা গোপন রাখাটাই সমীচীন বোধ করে নীলিমার কাছে।

এমনই বিচিত্র মানুষের মন! একবার তার বিশ্বাসের ভিত্তিতে নাড়া খেলে চট্ করে সহজে কিছুতেই যেন আর বিশ্বাস স্থাপন কিছুর উপরেই করতে চায় না।

হঠাৎ একটা বিচিত্র প্রশ্ন করে বসে শশাংক নীলিমাকে, আচ্ছা নীলিমা দেবী, আমার ঘরের সামনের ঐ বারান্দায় যে পায়ের ছাপ আপনি আমাকে দেখালেন, ঐ পায়ের ছাপের কথা কি আপনি আমার এখানে আসবার আগে হতেই জানতেন?

এখনও দেখছি আপনি আমাকে তেমন বিশ্বাস করতে পারছেন না। অবিশ্যি দোষ দিই না আপনাকে শশাংকবাবু—বিশ্বাস বস্তুটা বড় ঠুন্‌কো, একবার ভাঙলে সহজে জোড়া লাগতে চায় না। না, আমি জানতাম না। উপরে ওঠবার সময় ওটা হঠাৎ আমার নজরে পড়ে যায়। তার পরই নানা চিন্তা মনে আসে। আমি এখানে এসেছিলাম প্রধানতঃ দু'টো কারণে। প্রথমতঃ সত্যি আপনি

BanglaBook.org

নিরাপদে এখানে আসতে পেরেছেন কিনা শত্রুগুহা হতে পালিয়ে সেটা জানতে; দ্বিতীয়তঃ আপনি যে এখানেই সোজা আসতে পারেন সেটা শত্রুপক্ষ সন্দেহ করে এখানে হানা দিয়েছে কিনা সেটা জানতে। তাছাড়াও এখানে আসবার আমার আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল বৈকি, আপনাকে যখন সাহায্য করবো বলে স্থির করেছি—তখন আপনার সঙ্গে একবার আলাপ-পরিচয় করাও প্রয়োজন এবং আপনার সম্মতিটাও তো নেওয়া উচিত। বিশেষ করে গায়ে পড়ে হিত করাটা যখন কোন ভদ্রব্যক্তিই সহ্য করতে পারেন না। এবং সন্দেহ হওয়াটা যখন খুবই স্বাভাবিক, বিশেষ ভাবে আপনার এ ক্ষেত্রে—বলতে বলতে হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে নীলিমা বললে, উঃ, বেলা প্রায় ১২টা বাজে—আর নয়, এবারে আমি উঠবো মিঃ মিত্র!

সত্যি সত্যিই কথা শেষ করতে না-করতেই যাবার জন্য নীলিমা উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণ।

যাবেন?

তা যাবো বৈকি। কাজ তো আমার শেষ হয়ে গিয়েছে। যাবার আগে শেষ কথা একটা, চট্ করে যার-তার চিঠি বা ডাক পেয়ে কোথাও যেন যাবেন না। আচ্ছা চলি নমস্কার!

নীলিমা চঞ্চল পদে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

নীলিমার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ যেন ঘরের আবহাওয়াটাও স্তব্ধ হয়ে গেল। এতক্ষণ যেন একটা প্রাণবন্যা ঘরের মধ্যে বয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ সেটা থেমে গিয়েছে। ক্রমে নীলিমার দ্রুত পায়ের শব্দও সিঁড়িপথে মিলিয়ে গেল।

আরো কিছুক্ষণ স্থাণুর মত চেয়ারটার উপরে বসে থেকে শশাংক সমগ্র ঘটনাটা আর একবার আগাগোড়া ভাববার চেষ্টা করে।

কিন্তু কিছুই আর ভাল লাগে না। একসময় উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। আবার চোখে পড়ে সেই সুস্পষ্ট পায়ের দাগগুলো বারান্দায়। কার—কার পদচিহ্ন ওগুলো? কার? কার?

ঐ বিশ্রী হাতীর মত বড় বড় পায়ের ছাপগুলোর সঙ্গে সঙ্গে শশাংকর মনে পড়ে যায়, আরো দু'টি কোমল পায়ের ছাপের কথা—কিন্তু সে এলেও পশ্চাতে তার কোন পায়ের ছাপ রেখে যায়নি!

মেয়েটি সত্যিই অপূর্ব!

কিন্তু মেয়েটি কে? কি ওর আসল ও সত্যিকার পরিচয়?

নাম বলে গেল বটে নীলিমা। কিন্তু এও সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে গেল, আসল নাম কিন্তু সেটা মোটেই তার নয়। যা পরিচয় দিয়ে গেল তাও সত্যিকারের পরিচয় না, একটা সযত্ন-গ্রথিত ও রচিত নকল পরিচয়!

কিন্তু মেয়েটি সত্যিই অত্যন্ত সপ্রতিভ। এতটুকু সংকোচ বা জড়তা নেই। এবং সত্যিই মেয়েটি তার হিতাকাঙ্ক্ষী কিনা তাই বা কে জানে! শত্রুপক্ষের কোন নিযুক্ত চর যে নয় তাই বা কে বলতে পারে!

সে সন্দেহটা যেয়েও যায় না। মনের মধ্যে কুয়াশা রচনা করতে থাকে।

পদশব্দে শশাংক মুখ তুলে তাকাল। স্বরূপদা আসছে।

কি রে? খাওয়াদাওয়া হবে না, না? বিশ্রাম তো ঢের করলি, এবারে চারটি ভাত মুখে দিয়ে—

তোর রান্না তাহলে হয়ে গেছে স্বরূপদা! বেশ, ভাত দে, আমি চোখেমুখে জল দিয়ে আসছি।

শশাংক বারান্দার অপর প্রান্তে বাথরুমের দিকে অগ্রসর হলো।

BanglaBook.org

॥ ৬ ॥

নীলিমা।

শশাংকর বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তার উপর ক্ষণেকের জন্য দাঁড়াল। রাস্তার এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত যতটা দৃষ্টি চলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার ও চারিদিক দেখে নিল।

শীতের দ্বিপ্রাহরিক রৌদ্র যেন ঝিম্‌ঝিম্ করছে। রাস্তায় লোকজন খুব কম। মাঝে মাঝে দু'একটা লরী ও প্রাইভেট-কার যাতায়াত করছে।

মাড়োয়ারী হাসপাতালের লাল রংয়ের বাড়িটা এখান থেকে বেশ সুস্পষ্ট চোখে পড়ে। একটা উড়ের পানের দোকানের সামনে কয়েকটি লোকের ভীড়। ছোট একটা ভিখিরীর ছেলে, খালি একটা টিন বাজিয়ে একটা ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী মিশিয়ে কি একটা অদ্ভুত গান বেঁধেছে—তারস্বরে বেসুরো করে সেই গানটা গাইছে।

গানের কয়েকটা লাইন নীলিমার কানে আসে—

Father Mother নেইকো কিছু
কুছ্ নেই হ্যায়।
হাম্ বাদশা বেগম ঝম্ ঝমা ঝম্
One, two, three—দম্ দমা দম্ দম্
চানাচুর কটর্ মটর্
ট্যাক্‌সি ট্রাম চটর পটর
দিলদরিয়া হ্যায়!
তুম্ কোন্ হ্যায়
হাম সাহেব হ্যায়!

আশেপাশের শ্রোতার দল গানটা উপভোগ করছে বোঝা গেল, তারাও হাসছে। নীলিমা এগিয়ে চলল দ্রুতপায়ে ট্রামরাস্তার দিকে।

পূজা সেরে মা'র খেতে বসতে বসতে যে প্রায় দেড়টা হয়, তা ও জানে।

নারকেলডাঙ্গা ব্রীজটা পার হয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ডাইনের গলিতে নীলিমাদের বাড়ি। একটু আগে শশাংকর কাছে নীলিমা যে আত্মপরিচয়টা দিয়েছে, যদিও স্বীকার করেনি তবু সত্যিই এতটুকুও সে মিথ্যা বলেনি বা গোপন করেনি।

হাত ইশারায় একটা ট্যাক্সি ডেকে তাতে উঠে বসে ড্রাইভারকে নীলিমা বলল, নারকেলডাঙ্গা ব্রীজ।

গাড়ি ছুটে চলে। গাড়ির ব্যাকে হেলান দিয়ে নীলিমা সামনের দিকে চেয়ে থাকে।

ওদের বাড়ি এখান থেকে খুব সামান্যই পথ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবে। মা'র মুখখানা মনে পড়ে নীলিমার। ধৈর্যের যেন জীবন্ত একখানি মূর্তি।

আজ প্রায় আট মাস হতে চলল দাদুর আকস্মিক মৃত্যুর পর লাহোর থেকে এখানে সে মা-বাবার কাছেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে।

মা-বাবা বেঁচে থাকতেও তাদের একমাত্র সন্তান হয়েও কেন যে সে মাত্র ছয় বছর বয়স থেকেই লাহোরে দাদুর কাছে এতকাল ছিল ও মানুষ হয়েছে, সেটাই ছিল তার কাছে একটা দুর্বোধ্য ব্যাপার প্রথমে—পরে অবিশ্যি বুঝেছিল কেন মা তাকে দাদুর কাছে রেখেছিল।

BanglaBook.org

দীর্ঘ বারো বছর পরে দাদুর মৃত্যুর পর কলকাতায় এসে দেখে পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে সাজানো-গোছানো বাড়িখানা। শুনেছে বাড়িখানা নাকি বাবার নিজেরই। অর্থের প্রাচুর্য না থাকলেও এ সংসারে অর্থের যে এতটুকু অসচ্ছলতাও নেই, সেটাও বুঝতে নীলিমার দু'দিনও লাগেনি।

বাড়িতে কোন পুরুষ চাকর নেই—একমাত্র একজন আধাবয়েসী নেপালী দারোয়ান ছাড়া। ভিতরের কাজ করবার জন্য জন-দুই চাকরানী আছে, এদেশীয় নয় বেহারী। একজন বিধবা প্রৌঢ়া রাঁধুনী বামুন ঠাকরুণ আছে।

বাপ লোকটা অত্যন্ত চাপা ও গম্ভীর প্রকৃতির! কখনো বেশী কথা নিজেও বলেন না এবং কেউ বললেও অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করেন।

খুব অল্প সময়ই বাড়িতে থাকেন—কখন আসেন আবার কখন যে যান টেরই পাওয়া যায় না। বাড়িতে যতক্ষণ থাকেন কথাবার্তাও বড় একটা তাঁর শোনা যায় না।

নীচে একটা বসবার ঘর আছে। মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে সেই ঘরে কারা যেন আসে। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর অনেক রাত্রি পর্যন্ত চাপা স্বরে কি সব কথাবার্তা হয়।

পাশের ঘরটাই বাড়ির ভাঁড়ার ঘর। যাবতীয় টুকিটাকি জিনিসপত্র ও নানাবিধ মালমশলায় ঠাসা। ছোট-বড় হাঁড়ি, বাসন, কাঠের বাক্স, তরকারির ধামা, চালের বস্তা। দুই ঘরের মধ্যবর্তী একটা জানলা আছে। জানলাটা অবশ্য সর্বদা বন্ধই থাকে, তবে জানলায় দু'টো কাঠের জোড়ের মুখটা একটু বেশী ফাঁক হয়ে যাওয়ায়—সেই ফাঁক দিয়ে নজর দিলে ওপাশের ঘরের সব কিছু দেখা যায় এবং সব কথাবার্তাই শোনা যায়।

ঐ ঘরের ঠিক উপরের ঘরটাতেই শোয় নীলিমা।

মাসখানেক আগে অকস্মাৎ একদিন ঘটনাচক্রে বাড়ির নীচেকার ঘরের রহস্যটি নীলিমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়।

তখনও শীতটা ভাল করে চেপে পড়েনি। তাছাড়া চিরদিন পাঞ্জাবের আবহাওয়ায় মানুষ নীলিমার গ্রীষ্মবোধটা একটু বেশীই। বাংলাদেশে তখন শীত-ঋতুর আবির্ভাব হলেও নীলিমার কাছে সেটা কিছুই নয়। তখনও তার বেশ গ্রীষ্মবোধ হয়।

দুপুরের দিকে নীলিমা গিয়েছিল 'জু' গার্ডেনে। সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গ্রীষ্মবোধ হওয়ায় মেঝেতেই একটা বালিশ মাথায় দিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল কখন যেন একসময়। মা দু'বার খাবার জন্য ডাকতে এসে ওকে নিদ্রিত দেখে আর ডাকাডাকি না করে যে চলে গিয়েছিলেন তাও জানতে পারেনি।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘরটার অন্ধকার খোলা জানলাপথে প্রথম শীতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় মৃদু পরশ পাওয়া যায়। কত রাত্রি হবে কে জানে!

কানে এল কতকগুলো অস্পষ্ট কথা হঠাৎ এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন নীলিমা সজাগ হয়ে ওঠে। পাশ ফিরে কাত হয়ে বালিশের উপর গাল দিয়ে শুয়েছিল নীলিমা।

মৃদু অস্পষ্ট কথার গুঞ্জন কোথা হতে আসছে যেন।

প্রথমটায় ও ভাল করে বুঝতে পারেনি। এবং কোথা থেকে কথার আওয়াজ আসছে যে তাও বুঝতে পারেনি। ক্রমে আরো সজাগ হয়ে ওঠে ও। হ্যাঁ, নীচের ঘরে কারা যেন কথাবার্তা বলছে!

স্পষ্ট—স্পষ্ট প্রত্যেকটি কথা ও বুঝতে পারে। দু-চারটে কথা কানে যেতেই ও অত্যন্ত কৌতূহলী ও সজাগ হয়ে ওঠে।

BanglaBook.org

অনাবিষ্কৃত রহস্যময় ইতিহাসের একটা পৃষ্ঠা যেন অকস্মাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ঘরের স্তব্ধ জমাট নিস্তব্ধতার পটভূমিতে একখানা মুখ ভেসে ওঠে।

প্রস্তর থেকে কুঁদে তোলা একখানি মুখ যেন।

মুখের রেখাগুলো যেন অকস্মাৎ নিশ্চল হয়ে গিয়েছে। বিন্দুমাত্র জীবনের স্পন্দনও নেই সেখানে। স্থির অকম্পিত বাঙ্ময় চক্ষু দু'টিও যেন কালো পাথরের তৈরী। পাথরের চোখ।

ঋষি-শাপে গৌতমী যেন পাষাণী হয়েছে।

ইতিমধ্যে কখন একসময় ট্যাক্সিটা ব্রীজ ক্রস্ করে সামনের নীচু ঢালু রাস্তা ধরে ছুটে চলেছে।

এই ড্রাইভার রোখকে! থোড়া আগাড়ী ঐ যে ডাহিনা গলি হ্যায়—উধার!

ড্রাইভার গাড়ির গতি সংযত করে আরোহিণীর নির্দেশমতই অগ্রসর হলো মন্থর গতিতে। গলির মুখে এসে ট্যাক্সি থেকে নেমে মিটারের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে গলির ভিতরে গিয়ে ঢুকল নীলিমা।

গলির শেষপ্রান্তে একেবারে দোতলা লাল রং-এর গেটওয়ালা বাড়িটাই ওদের বাড়ি। প্রস্তরের মত নিষ্প্রাণ নেপালী দারোয়ানটা গেটের সামনে একটা টুলের উপরে বসেছিল; উঠে গেটটা খুলে দিয়ে নিঃশব্দে একপাশে সরে দাঁড়াল।

নীলিমা ভিতরে প্রবেশ করে সোজা অন্দরে গিয়ে ঢুকল।

নীচের বারান্দার পশ্চিম কোণে ঠাকুরঘরের দরজার সামনে দেওয়ালে হেলান দিয়ে স্তব্ধ হয়ে মা—নীলিমার মা বসেছিলেন। নীলিমার পদশব্দে একবার চোখ তুলে তাকালেন। কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা নেই।

মেয়েই এগিয়ে এসে বললে, আমার জন্য বুঝি এখনও বসেই আছো মা! বুঝতে পারছি তুমি এখনও খাওনি। যাও ভাত দিতে বলো বামুন ঠাকরুনকে।

নীলিমা উপরে উঠে গেল নিজের ঘরে। কিছুক্ষণ পরে হাতমুখ ধুয়ে কোনমতে মুখে চারটি দিয়ে এসে আবার নিজের ঘরে প্রবেশ করে হেলান দেওয়া চেয়ারটার উপরে গা এলিয়ে দিল।

আবার মায়ের মুখখানা মনে পড়ে। মা—তার মা! পাষাণী। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি যেন।

সেই সঙ্গে মনে পড়ে আবার সেই সেদিনকার কথা। ভূ-শয্যা ত্যাগ করে এক সময় ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় নীলিমা।

সে-রাত্রে। রাত্রি বোধ করি এগারটা সাড়ে এগারোটা হবে, সমস্ত বাড়িটা যেন নিঝুম শব্দহীন।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে সোজা নীলিমা ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল, ওদিককার ও এ-ঘরের মধ্যবর্তী বন্ধ জানালার কাঠের ফাঁক দিয়ে ওপাশের ঘরের খানিকটা আলোর আভাস এসে পড়েছে এদিককার অন্ধকার ঘরে।

পা টিপে টিপে জানালাটার কাছে এসে রুদ্ধনিশ্বাসে চোখ পেতে দাঁড়াল নীলিমা।

পাশের ঘরের সব কিছু স্পষ্ট চোখে পড়ে। একজন দু'জন তিনজন চারজন লোক ঘরের মধ্যে বসে চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে কি একটা ব্যাপার নিয়ে যেন গভীর আলোচনায় রত।

আলোচনার টুকরো টুকরো কথাগুলো নীলিমার কানে আসে স্পষ্ট। কানের মধ্যে কে যেন তপ্ত অঙ্গার ঢেলে দিচ্ছে। কপালের উপরে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠছে।

কি এ সব কথাবার্তা! এসব কি শুনছে নীলিমা! সে জেগে না ঘুমিয়ে!

BanglaBook.org

অন্ধকার ঘরের মধ্যে অসংখ্য কালকেউটের বাচ্চা যেন কিলবিল করে ফিরছে।

পিচ্ছিল, বিষাক্ত। ঘরের রুদ্ধ বায়ু তাদের বিষাক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসে যেন শ্বাস-রোধকারী বলে মনে হয়। সমস্ত চিন্তাশক্তি যেন কেমন ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। পায়ের তলাকার মাটি সরে সরে যাচ্ছে। এ কোন্ নরককুণ্ডের মধ্যে এসে ও পড়েছে!

কোন মতে টলতে টলতে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এল নীলিমা।

অন্ধকার বারান্দাটা কোনমতে অতিক্রম করে সোজা সিঁড়ি বেয়ে উপরের ছাতে চলে এল নীলিমা। মধ্যরাত্রির আসন্ন শীতের পূর্বে হৈমন্তিক আকাশ অসংখ্য তারায় তারায় যেন লক্ষ কোটি প্রদীপ জ্বালিয়ে কার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।

ক্লান্ত চোখে-মুখে মধ্যরাত্রির শীতল বাতাস যেন স্নিগ্ধ পরশ দিয়ে গেল। কোথায় হয়ত কে আপন মনে বাঁশের বাঁশীতে বাগেশ্রীর আলাপ করছে। নীলিমা পায়ে পায়ে ছাদের উঁচু প্রাচীরের সামনে এসে দাঁড়াল। দূরে বড় রাস্তাটার দু'পাশে ইলেক্ট্রিক বাতিগুলো জ্বলছে, রাস্তায় মানুষের চলাচল বিরল হয়ে এসেছে। ক্বচিৎ এক-আধজন চোখে পড়ে।

মাথার মধ্যে যেন একটা আগুনের তপ্তপ্রবাহ বহে চলেছে। নীতি ও সুন্দরের সঙ্গে যেন দুর্নীতির বিরোধ বেধেছে।

কি করবে এখন ও? চলে যাবে! এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে? হ্যাঁ, সেই-সেই ভাল। দূরে—বহু দূরে অনেক দূরে সে চলে যাবে।

অস্থির ভাবে নীলিমা ছাতের উপর পায়চারী শুরু করে।

হঠাৎ ওর নজরে পড়ে ছাতের ছোট্ট ঘরখানির বন্ধ দরজাটার সামনে—কে, ওখানে অমন নিঃশব্দে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে কে?

এগিয়ে যায় নীলিমা। চেয়ে দেখে তার মা।

এ কি মা! নীলিমা ডাকে কিন্তু কোন সাড়া নেই।

মা—মাগো? আবার ডাকে নীলিমা।

নীলিমার ডাকে বন্ধ-চোখের পাতা খুলে মা তাকালেন মেয়ের মুখের দিকে।

অন্ধকারে স্তিমিত তারার আলোতেও সুস্পষ্ট নীলিমার চোখে পড়ে মা'র চোখের কোলে চক্ চক্ করছে একটি যেন ক্ষীণ অশ্রুর ধারা। সে মা'র পাশটিতে একেবারে বসে পড়ে সস্নেহে দু'হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে ডাকে, মা! কি হয়েছে মা—মা—

কিছু তো হয়নি!

না—নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে, বল মা—মা—

মা নিঃশব্দে দু'হাতে মেয়ের মাথাটা বুকের মধ্যে এবারে টেনে নিয়ে ক্ষীণ স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলেন, এত রাত্রে তুই ছাতে কেন নীলু?

তুমি কাঁদছিলে মা?

নীলু, কাঁদি না—কাঁদতে চাই না, কিন্তু তবু পারি না এই বাড়ির এই বিষাক্ত হাওয়া—

মাগো, চল এখান থেকে আমরা চলে যাই। মেয়ের চোখেও জল।

নিঃশব্দে মা মেয়ের নিজ বক্ষসংলগ্ন মাথাটির উপরে হাত বুলাতে থাকেন।

এই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে তুমি কেমন করে আছো মা! আমার যে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে! এই অন্যায় এই অত্যাচারকে কেমন করে—কেমন করে তুমি সহ্য করো?

পাগলী মেয়ে! বাড়ি ছেড়ে কোথায় যাবো? হ্যাঁ রে, খেয়েছিস, না এখনও না খেয়েই আছিস?

ক্ষিদে নেই মা।

BanglaBook.org

চল্, নীচে চল্। খেতে দিই। বামুন-ঠাকরুন বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। চল্, ওঠ্—

মা ও মেয়ে হাত ধরাধরি করে নীচে নেমে আসে।

এরপর কোনদিনই আর নীলিমা এ বাড়ি ছেড়ে, বিশেষ করে মাকে এই বাড়ির মধ্যে একাকী ফেলে চলে যাবার কথা ভাবেনি। মাকে কোন প্রশ্নও করেনি। মনে মনে একপ্রকার প্রতিজ্ঞাই করেছে, অন্তত মা যতদিন বেঁচে আছেন এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও সে যাবে না।

না—না।

বোজা চোখের পাতার উপর দিয়ে কেবলই মা'র মুখখানি ভেসে ভেসে যায়। সেদিন বুঝতে পারেনি নীলিমা, কিন্তু পরে বুঝেছিল কেন মা ঐ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারে না—কেন তার যাবার উপায় নেই কোথাও।

কত বড় মর্মান্তিক দুঃখের বোঝা যে মা নিঃশব্দে দিনরাত বয়ে বেড়াচ্ছেন, এখন ও বুঝতে পারে। এতটুকু ক্ষোভ নেই। এতটুকু নালিশ নেই। মাঝে মাঝে মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে কেন—কেন ওরা এ সহ্য করবে? কেন মা এমনি করে দিনের পর দিন অত্যাচার সহ্য করবে?

কিন্তু এমন করে থাকলে সেও যে পাগল হয়ে যাবে!

তারপর হতেই নীলিমার একটা নেশা হয়ে দাঁড়াল, সর্বদা নীচের সেই ঘরখানির উপরে নজর দেওয়া। কখন সেখানে লোকের সমাগম হয়, কে আসে, কারা আসে, কেন আসে, কে কি আলোচনা করে! তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সে নজর রাখে সর্বদা ঘরটার দিকে।

ক্রমে সে বুঝতে পারে একটা মস্ত বড় ষড়যন্ত্র চলেছে। মনের মধ্যে ক্রমে একটা সংকল্প দৃঢ় হয়ে ওঠে। অন্ধকারের মধ্যে একটা ছোট্ট আলোর বিন্দু।

ক্রমাগত কয়েকদিন ভেবে ভেবে ও স্থির করে, হ্যাঁ, ঐ পথ ধরেই ও চলবে।

অন্যায় দুর্নীতি অত্যাচারের কণ্ঠ রোধ করে ও করবে সত্যের সুন্দরের প্রতিষ্ঠা। এখানে এলেও সে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

বাবা তার কোন স্বাধীন ইচ্ছাতেই বাদ সাধেন না।

আসলে ভদ্রলোকটি এ সংসারের সাতে-পাঁচে কিছুতেই নেই।

॥ ৭ ॥

ফাল্গুনের বেলা ক্রমে ফুরিয়ে এল।

ম্লান সূর্যের তেজ ক্রমে অস্পষ্ট হতে হতে অস্পষ্টতর হয়ে নিঃশেষে মিলিয়ে গেল দিগন্তরেখায়। দীর্ঘ একটানা ঘণ্টা-তিনেক ঘুমিয়ে শশাংক শয্যার উপর উঠে বসল।

স্বরূপদা ঘরে এসে প্রবেশ পরে, কি রে, ঘুম ভাঙল? চা আনি?

নিয়ে আয়।

চা-পান করতে করতে শশাংকর আবার মনে পড়ে, কয়েক ঘণ্টা আগেকার পরিচিত সেই তরুণী নীলিমার কথা। সেই সঙ্গে মনে পড়ে যায় দিগেন সান্যালের চিঠির কথা। সন্ধ্যার পরেই তাঁর ওখানে একবার যাওয়ার জন্য তিনি তাঁকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছেন।

শেষ পর্যন্ত মনে মনে সে স্থির করেছে যাবে—দিগেন সান্যাল যখন ডেকে পাঠিয়েছেন সে যাবে।

সুব্রতবাবু তো স্পষ্টই জানিয়েছেন, গবেষণার কাগজপত্রগুলো খোয়া যায়নি বা নষ্ট হয়ে

BanglaBook.org

যায়নি, আপাততঃ নিরাপদেই রক্ষিত আছে। তাছাড়া কাকা অজয় মিত্র সম্পর্কেও তার সঠিক সমস্ত সংবাদটাও জানা একান্ত প্রয়োজন।

সিংগাপুর থেকে কিছুদিন আগে দিগেন সান্যালের যে চিঠিখানা সে পেয়েছে, তার মধ্যে কাকার হাসপাতালে যে মৃত্যুর কথা জেনেছে সেটাও রহস্যাবৃত। অর্থাৎ সে মৃত্যুও রহস্যাবৃত।

দিগেন সান্যালের সঙ্গে দেখা হলে সমগ্র ব্যাপারটাও জানা যাবে এবং একটা আলোচনাও করা যাবে।

কলকাতা শহরের উপরে ফাল্গুনের অবসন্ন সন্ধ্যার ধূসর ম্লানছায়া বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।

পথে পথে গ্যাস ও ইলেকট্রিক বাতিগুলো জ্বলে উঠলো। শহরের শ্বাসরোধকারী ধোঁয়ায় এ সময়টা সন্ধ্যার আকাশ চাপ বেঁধে ভারী হয়ে থাকে বিশ্রী। পথে পথে গ্যাস ও ইলেকট্রিক বাতিগুলোর আলোর তেজও কেমন ঝাপসা ম্লান মনে হয়।

ফাল্গুনের শেষ—অথচ শীত এবারে এখনো গেল না। গায়ে-পিঠে এখনো বেশ ব্যথা—গত রাত্রের সেই চাবুকের প্রহারের কথা আবার মনে পড়ে যায়। নিরুপায় ক্রোধে ও আক্রোশে সহসা যেন মনটা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পশুর মত ঘরের মধ্যে বন্দী করে হাত-পা বেঁধে নির্মমভাবে প্রহার করেছে শয়তানেরা।

উঃ, কি বিপদটাই না পর পর কয়েকটা দিন গিয়েছে! ঝড়ের মত একটার পর একটা তাকে ঝাপটা দিয়ে গিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছে, সেই অদৃশ্য শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুটির কথা। দু'দুবার সতর্ক করে বিপদ থেকে সে মুক্তি দিয়েছে, তাকে বাঁচিয়েছে, কিন্তু কে—কে সেই বন্ধুটি!

সম্ভব অসম্ভব নানা চিন্তা মনের মধ্যে এসে উঁকিঝুঁকি দেয়।

কি স্বার্থে—সেই অদৃশ্য-পরিচয়দানে-অনিচ্ছুক বন্ধুটি তার উপকার করেছে, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত ফিরিয়ে দিয়েছে সুনিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে—কেন তাই বা কে জানে!

একটা কথা সে এখনো বুঝে উঠতে পারেনি, চন্দননগরে তো তার আত্মীয় বসন্তকাকার ওখানে ছিল, কিন্তু কি করে সেখানে যে বিপদ এলো এখনো সেটা বুঝে উঠতে পারেনি।

ভাগ্যে সেখানেও সেই অদৃশ্য বন্ধুটি তাকে যথাসময়ে সতর্ক করে দিয়েছিল, নচেৎ কি যে হতো! হঠাৎ একটা কথা মনে হয় শশাংকর—তবে কি বসন্তকাকাও তার বিপক্ষ দলের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েছেন!

যত সে ভাবতে থাকে ততই মনে হয়, সেটাই সম্ভব—হয়ত তাই। নচেৎ সেখানে শত্রুপক্ষ তার উপস্থিতি অত তাড়াতাড়ি জানতে পারেই বা কি করে?

আশ্চর্য! আজ তবে আর এ জগতে কাউকেই কি সে বিশ্বাস করতে পারে না? আত্মীয় আপনজন যারা তারাও স্বার্থের লোভে তাকে বিপদের হাতে তুলে দেবে আজ?

তবে? কাকে—কাকে আর আজ সে বিশ্বাস করতে পারে!

সঙ্গে সঙ্গে মন বলে ওঠে, ছিঃ! ছি, এ কি ভাবছে সে! কাকার বন্ধু, যাঁর সাহায্যের জন্য কাকা তাকে সিংগাপুর পর্যন্ত ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, যিনি চিরদিন কাকার সকল আইন-সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শদাতা ছিলেন, তাঁকেও আজ সে অবিশ্বাস করবে নাকি?

সন্দেহ জিনিসটা বড় বিশ্রী। মনের কোণে একবার সন্দেহ জাগলে বোধহয় এমনিই হয়। কিন্তু না, এ ধরনের ছেলেমানুষী চিন্তা বা কল্পনাকে প্রশ্রয় দিলে তাঁর প্রতি অন্যায়ই করা হবে।

BanglaBook.org

আপাততঃ সমস্ত চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল শশাংক। দিগেন সান্যালের ওখানে সে যাবে। এবং একটা চিঠির মারফৎ সুব্রতবাবুকে সে সব কথা জানিয়েই যাবে।

ফোনে বা সাক্ষাতে সুব্রতবাবুকে শশাংকর কোন কথা বলা চলবে না। সুব্রতবাবু হয়ত একা যেতে বাধা দিতে পারেন—হয়ত বলবেন তিনিও তার সঙ্গে যাবেন।

না, এক্ষেত্রে তাঁকে ফোন না করে যাওয়াই ভাল, তবে হ্যাঁ, সে একটা সংবাদ দেবার ব্যবস্থা করে যাবে। অন্ততঃ তাঁর জানা দরকার সে কোথায় যাচ্ছে।

জামাকাপড় পরে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে পাশের ঘরে প্রবেশ করে শশাংক একটা লেটারপ্যাড্ টেনে নিয়ে লিখতে বসল।

সুব্রতবাবু,

বিশেষ একটা জরুরী কাজে। —নং শ্যামপুকুর স্ট্রীটে দিগেন সান্যালের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হলো। ভগবানের অশেষ কৃপায় তিনি অক্ষত দেহে ফিরে এসেছেন। তাড়াতাড়ি ফিরলে আপনাকে ফোনে জানাব। আর ফিরতে যদি রাত হয়—কারণ তাঁর ওখানেই আহারের নিমন্ত্রণ আছে, কাল সকালে আমি নিজেই আপনার ওখানে যাবো। আপনার সঙ্গে আজ সন্ধ্যার পরে আমাদের appointment রাখতে পারলাম না বলে দুঃখিত ও লজ্জিত। সাক্ষাতে সবিশেষ কথা হবে।

বিনীত—শশাংক মিত্র।

শনিবার।

চিঠিখান লিখে একটা খামের মধ্যে পুরে খামের মুখটা এঁটে উপরে শশাংক সুব্রতর নাম ঠিকানা লিখলে।

স্বরূপকে ডেকে তার হাতে চিঠিটা দিয়ে বললে, বিশেষ একটা জরুরী কাজে শ্যামপুকুরে যাচ্ছি স্বরূপদা। এই চিঠিটা তুই ঐ সামনের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবি রাত্রি আটটা নাগাদ। সুব্রতবাবু যদি বাড়িতে থাকেন তো ভালই, নচেৎ যার হাতে দিবি বলে আসবি চিঠিটা জরুরী; সুব্রতবাবু বাড়িতে ফিরে আসামাত্রই যেন তাঁর হাতে দেওয়া হয় চিঠিটা।

তা তুমি ফিরবে কখন? রাত্রে এসে খাবে তো?

না। দিগেনবাবুর বাড়ি থেকেই খেয়ে আসব। সেখানেই আমার রাত্রে খাবার নিমন্ত্রণ আছে। আর দেখ্, সাবধানে থাকবি, ঘরের জানলা-দরজাগুলো ভাল করে এঁটে রাখিস, সব দরজাগুলোতেই তালা দিয়ে দিবি।

কেন গো, হঠাৎ তালা দেবার কথা বলছো কেন?

কাল রাত্রে চোর এসেছিল বাড়িতে, খবর রাখিস কিছু?

চোর!

হ্যাঁ রে হ্যাঁ। খালি পড়ে পড়ে ঘুমোবি! হ্যাঁ দেখ্, ভাল কথা, কাল সকালেই আমাদের বুড়ো দারোয়ানকে একটা সংবাদ দিবি, বলবি সে যেন তাঁর ছেলেকে নিয়ে আসে। দু'জনেই এ বাড়িতে কাজ করবে।

দু'দুটো দারোয়ান দিয়ে কি হবে?

অত কথায় তোর কাজ কি! যা বলি তাই শোন্!

বেশ, দেবো খবর।

BanglaBook.org

॥ ৮ ॥

স্বরূপ চিঠিটা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

শশাংক হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলে—সওয়া সাতটা বাজে। ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে স্বরূপকে সদর দরজাটা বন্ধ করতে বলে শশাংক সদর রাস্তার উপরে এসে দাঁড়াল।

একবার মনে মনে ভাবলে ট্যাক্সিতেই যাবে, তারপর মনে হলো, না—এই সামান্য পথটুকু হেঁটেই যাবে। গাড়িটার কথা মনে পড়লো, দিন ছয়েক আগে রাত্রে নারকেলডাঙ্গার বাড়ির সামনে থেকে চুরি গিয়েছে।

পুলিসে সমস্ত ব্যাপারটা জানাজানি হবার ভয়েই মোটর চুরির কথাটা ও চেপে গিয়েছে, রিপোর্ট করেনি। শখ করে শশাংক গাড়িটা কিনেছিল।

হাঁটতে হাঁটতে আমহার্স্ট স্ট্রীট অতিক্রম করে কৈলাস বোস স্ট্রীট দিয়ে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের উপরে এসে পড়ল শশাংক একসময়।

শ্যামপুকুর স্ট্রীটে দিগেন সান্যালের মস্ত বড় দোতলা পৈতৃক বাড়ি। পুরানো আমলের বাড়ি। সামনের অংশটা ভেঙে নতুন করে আবার আধুনিক কেতায় বাড়িটা গড়ে তোলা হয়েছে।

গেটের সামনে দারোয়ানের ছোট্ট ঘর।

শশাংক তাকেই প্রশ্ন করল বাবু আছেন কিনা!

দারোয়ান তার ছোট্ট ঘরখানির মধ্যে বসে একটা বাটিতে বোধ হয় সিদ্ধি ঘুঁটছিল। শশাংকর প্রশ্নে মাথা হেলিয়ে বললে, জি হাঁ—যাইয়ে।

এ বাড়ি শশাংকর চেনা। আরো দু-চারবার শশাংক এখানে এসেছে। দারোয়ানকে ভাল করেই চেনে। দিগেন সান্যালের এত বড় বাড়িতে কিন্তু সে একা বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বাপের একটি মাত্র ছেলে। বিয়ে-থা এখনও করেনি। বয়স চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। পড়াশুনার খুব বাতিক, মস্তবড় একটা লাইব্রেরী আছে, তাতে সাহিত্য হতে শুরু করে নানা প্রকারের পুস্তকের সংগ্রহ।

দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে সামনেই একখানা হলঘর। তার পাশের মাঝারি আকারের ঘরটিতেই দিগেন সান্যাল সাধারণতঃ বসেন।

ঘরের সামনে এসে আলো জ্বলতে দেখে ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল, দিগেন সান্যাল ঘরেই রয়েছেন।

ভিতরে আসতে পারি কি?

কে? ভারী গলায় প্রশ্ন এলো।

আমি শশাংক।

এসো—এসো।

শশাংক ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল।

ঘরটির মধ্যে আসবাবপত্রের তেমন বাহুল্য নেই।

একটি সেক্রেটেরিয়েট্ টেবিল, তার চার পাশে খানকতক চেয়ার বসবার জন্য। একপাশে একটা রিভলভিং বুক-সেল্‌ফ। দিগেন সান্যাল একটা মোটা বই টেবিলের উপরে খুলে মুখে একটা পাইপ দিয়ে বসে ছিলেন। শশাংককে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে বললেন, এসো শশাংক, বোস ঐ চেয়ারটায়।

BanglaBook.org

শশাংক নির্দিষ্ট আসনে বসে।

দিগেন সান্যালের চেহারাখানি সত্যিই লোককে প্রথম দর্শনেই আকৃষ্ট করে।

সাধারণ বাঙালীর চাইতে সত্যিই অনেকটা লম্বা, পেশীবহুল গঠন। মুখখানা গোলাকার। পুরু ওষ্ঠ, ওষ্ঠের উপরেই একজোড়া ভারী গোঁফ।

তারপর—আমার চিঠি তুমি পেয়েছিলে?

হ্যাঁ।

এদিককার খবর কি?

সংক্ষেপে শশাংক কয়েকদিনকার সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক দিগেন সান্যালকে বলে গেল, কেবল নীলিমা ও বলদেবের কথাটা বাদ দিয়ে। শশাংকর মুখে সমস্ত শুনে কিছুক্ষণ দিগেন সান্যাল নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলেন। প্রশস্ত ললাটে চিন্তার রেখা দেখা দিল। হাতের পাইপটা অনেকক্ষণ আগে নিবে গিয়েছিল, সেদিকে যেন লক্ষ্যই ছিল না তাঁর।

হঠাৎ সেটা খেয়াল হতে ড্রয়ার থেকে টোবাকো পাইপটা বের করে খানিকটা টোবাকো পাইপের গহ্বরে ঠাসতে ঠাসতে দিগেন সান্যাল বললেন, আমিও অতটা না হলেও তুমি যা বললে অনেকটা সেইরকমই আশা করেছিলাম। যতদূর জানতে পেরেছি, একটা বিরাট গ্যাং অজয়ের এক্সপেরিমেন্টের কপিগুলো হাতাবার চেষ্টা করছে।

শুধু তাই নয় মিঃ সান্যাল, আরো এর মধ্যে কথা আছে—তারা সেই কপিগুলো বিদেশী শত্রুর কাছে বহু টাকার বিনিময়ে বিক্রী করবার মতলব করেছে।

পাইপটায় অগ্নিসংযোগ করে নিঃশব্দে ধূমপান করতে থাকেন দিগেন সান্যাল।

হঠাৎ একসময়ে শশাংক প্রশ্ন করে, মিঃ সান্যাল, কাকার মৃত্যুর কথা আমাকে সব খুলে বলুন—ব্যাপারটা জানবার জন্য আমি বিশেষ উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

সেই কথা বলবো বলেই তোমাকে আজ এখানে ডেকে এনেছি শশাংক!

দিগেন সান্যাল তাঁর কাহিনী শুরু করলেন ঃ

সমস্ত কথা হয়ত তুমি জান না শশাংক। তোমার কাকা অজয় মিত্র আমার ছোটবেলার বন্ধু। আর সুনীল কর ছিল আমাদের দু'জনার বন্ধু। আই. এস্-সি পাস করবার পর আমি বি. এ. ক্লাসে গিয়ে ভর্তি হলাম— তোমার কাকা অজয় ও সুনীল বি. এস্-সি ক্লাসে গিয়ে ভর্তি হলো।

তারপর?

তারপর আমি ল' পাস করে আইনের দিকে গিয়ে অ্যাটর্নী হলাম, ওরা এম্.এস্.সি পাস করে দু'জনে রিসার্চ শুরু করলে। তোমার ঠাকুরদা তাঁর দুই ছেলের নামে অর্থাৎ তোমার বাবা ও তোমার কাকা প্রত্যেকের নামে ব্যাঙ্কে ভূসম্পত্তি ছাড়াও নগদ এক লক্ষ করে টাকা মজুদ রেখে গিয়েছিলেন।

দিগেন সান্যাল একটু থামেন, আবার বলেন, কলকাতায় খান-দুই বাড়ি পড়েছিল তোমার বাবার ভাগে। নারকেলডাঙ্গার বাড়িটা, আজমীরের ও দেওঘরের বাড়ি পড়েছিল তোমার কাকার নামে। কাকা তোমার ব্রহ্মচারী মানুষ, বিয়ে-থা করলেন না, নারকেলডাঙ্গার বাড়িটায় বাপের টাকায় বিরাট এক ল্যাবরেটারী করে গবেষণা নিয়ে মেতে উঠলেন। সুনীল কর তাঁর সঙ্গে সহকর্মী হয়ে কাজ করতে লাগল। গরীবের ছেলে সুনীল নয়—তারও বাপের অবস্থা ভালই ছিল। পূর্ববঙ্গে তার বিরাট জমিদারী আছে। সে বাপের একমাত্র সন্তান। টাকার অভাব তারও ছিল না।

BanglaBook.org

বছরখানেক আগে হঠাৎ একদিন তোমার কাকা অজয় ও সুনীল আমার এখানে রাত্রে বেড়াতে এলো। সেই সময়েই ওদের মুখে শুনলাম, অজয় নাকি ঔষধের জগতে একটি বিরাট আবিষ্কার করেছে তার গত দশ বৎসরের অধ্যবসায়ে।

বিশেষ একটি 'ছত্রাক' সে আবিষ্কার করেছে, যার সাহায্যে যে কোন সংক্রামক দুরন্ত ব্যাধিকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নাকি নিরাময় করতে পারা যাবে এবং যে কোন প্রকার সেপ্টিক উণ্ডকে অতি দ্রুত নিরাময় করে তোলা যাবে।

অজয় বললে, ম্যাথামেটিকাল ক্যালকুলেশন নিয়েই সে এখন ব্যস্ত। সেটা সম্পূর্ণ হলেই সে তার থিসিস্ সাবমিট্ করবার জন্য ইউরোপে যাবে। সেই সঙ্গে অজয় সুনীলেরও প্রভূত প্রশংসা করলে, বললে, সঙ্গে সুনীল না থাকলে ও তার অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাহায্য না পেলে তার পক্ষে এ আবিষ্কার করা এত অল্প সময়ে সহজসাধ্য হতো না। ঐ ঘটনার পর মাসখানেক পর্যন্ত ওদের আর কোন সংবাদ বড় একটা পাইনি বা রাখতেও পারিনি। এমন সময় হঠাৎ শুরু হলো এই দ্বিতীয় মহাসমর। জার্মানীর দুর্বার অগ্রগতি ও সমগ্র ইউরোপের টলটলায়মান অবস্থা। এই সময় জাপানও করলে যুদ্ধ ঘোষণা মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে এবং জাপানের যুদ্ধ ঘোষণার ঠিক দিন কুড়ি আগে হঠাৎ একদিন রাত্রি প্রায় গোটা দশের সময় লাইব্রেরী ঘরে একা একা বসে পড়ছি, অজয় হন্তদন্ত হয়ে এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল, দিগেন?

কে, অজয়! এত রাত্রে? বসো, বসো। তুমি কাঁপছ যে—কি ব্যাপার?

আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে দিগু!

ব্যাপার কি—কি হয়েছে? সব আমাকে বলো!

এ জগতে তুমিই বোধ হয় আমার একমাত্র বন্ধু, দিগু। সুনীল—after all—আমাদের সুনীল—

অজয়ের স্বরটা কাঁপতে থাকে।

সুনীল—কি হয়েছে, কি করেছে সুনীল?

সুনীল—সুনীল, তুমি ধারণা করতে পারবে না দিগু, সুনীল শেষ পর্যন্ত কিনা আমার সঙ্গে ট্রেচারি করলে!

সে কি! কি বলছো অজয়?

তাই। সে আমার এত কষ্টের রিসার্চের কপির খানিকটা অংশ চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে সিংগাপুরে।

বল কি! সত্যি?

সত্যি। অবিশ্যি সে জানে না যে, যেটা সে নিয়ে গিয়েছে রিসার্চের ২/৩ অংশের কপি মাত্র—

আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না অজয়।

BanglaBook.org

॥ ৯ ॥

নীলিমাদের বাড়ির নেপালী দারোয়ানটা নিশ্চুপ পাথরের মত চব্বিশ ঘণ্টাই প্রায় গেটের সামনে বসে বসে বাড়ির প্রহরায় নিযুক্ত থাকে।

পরিচিত জন বাড়ির মধ্যে যাতায়াত করলে একবার সে শুধু চোখ তুলে চেয়ে দেখতো—পাথরে গড়া মুখের রেখাগুলোতে কোন কুঞ্চন বা বৈলক্ষণই প্রকাশ পেত না। পাথরের মত স্থির

বর্তুলাকার চক্ষুর তারকা দু'টিও অচঞ্চল থাকতো— কোনরূপ কৌতূহল বা ব্যগ্রতা তার মধ্যে দেখা যেত না। কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তি বা আগন্তুককে প্রবেশে উন্মুখ দেখলেই সহসা যেন পাথরের গড়া নিশ্চল দেহটা খাড়া হয়ে দাঁড়াত। বর্তুলাকার চক্ষু দু'টিতে সপ্রশ্ন ইঙ্গিত ছুরির ফলার মতই ঝিকিয়ে উঠত। সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতটা কোমরে ঝোলানো ধারালো কুকরীটার কালো হাড়ের তৈরী তৈলসিক্ত বাঁটটাকে শক্ত মুষ্টিতে ধরতো চেপে।

কিস্‌কো মাংগতে সাব্? একটি মাত্র প্রশ্ন করবে মুখের দিকে চেয়ে থেকে।

কেন না-জানি নীলিমা প্রথম দিনটি থেকেই ঐ নেপালী দারোয়ানটাকে সহ্য করতে পারতো না। লাহোর থেকে চলে আসবার সময় নীলিমা সঙ্গে করে এনেছিল তার ও তার দাদুর পেয়ারের ভৃত্য রতন সিংকে।

রতন সিং জাতিতে জাঠ। বয়েস ২২।২৩য়ের মধ্যেই। যুবক। খুব অল্পবয়সে মা-বাপকে হারিয়ে তার এক দুরসম্পর্কীয় চাচার সুপারিশে রতন সিং নীলিমার দাদুর কাছে এসে কাজে ভর্তি হয়েছিল।

সেই থেকেই সে নীলিমার দাদুর বাড়িতে থেকে যায়।

দাদুর মৃত্যুর পর নীলিমা যখন কলকাতায় চলে আসবে—সব ঝি, চাকর, ঠাকুর ইত্যাদিকে মাহিনা মিটিয়ে দিয়ে রতনকেও তার প্রাপ্য মাহিনা দিতে গেল। রতন ঘাড় নেড়ে বললে, নেহি—

নেহি কি রে?

নেহি যায়গা!

তব্? কেয়া করোগে?

আপহনকো সাথ্ সাথ্ চলেগে দিদি—

রতন প্রথম হতেই নীলিমাকে দিদি বলে ডাকত।

কিধার হামারা সাথ্ সাথ্ যায়গে রতন? ম্যায়নে তো বাংলা মুলুকমে যাতে হে!

হামেভি সাথ্ সাথ্ লে চলিয়ে দিদি!

বাংলা মুলুকে গিয়ে তুমি কি করবে রতন?

তোমার কাছে কাছে থাকব দিদি।

আর আপত্তি করতে পারেনি নীলিমা। বলেছিল, বেশ, তবে চল।

রতন সত্যিই চলে এলো নীলিমার সঙ্গে বাংলা দেশে।

২২।২৩ বৎসর হলে কি হবে, দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, টক্‌টকে গায়ের রং, কটা চোখ।

নীলিমার জন্য রতন প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারত।

রতনেরও নেপালী দারোয়ানটাকে ভাল লাগেনি।

একদিন সে বলেছিল, দিদি, আপ্‌কো ও দারোয়ান দুশ্‌মনকো চেলা হায়—

নীলিমা হেসে বলেছিল, কিউ?

দেখা নেহি দিদি, উস্‌কো আঁখ্—আঁখ সেই হামলোগ শয়তানকো পহচান্তে।

নেহি, নেহি। ই কেয়া তুম্ কহেতেহো রতন?

এক রোজ উস্‌কো সাথ্ হামারা একহাত হো জায়গা দিদি—

ছি রতন, য়্যাসা কাম কভি মাত্ কর্‌না।

জবাবে রতন শুধু হেসেছিল প্রচুর।

রতনকে নীলিমা বেশ ভাল করেই চেনে। পাঞ্জাবের এক পার্বত্যভূমি ঘেরা ছোট গ্রামের ছেলে

BanglaBook.org

রতন। ওর বাপ দাদা চোদ্দ পুরুষ সবাই চিরকাল সরকার বাহাদুরের সৈন্যবিভাগে সৈনিকের কাজ করে এসেছে। রতনের মা'র রতনের আগেও দু'টি ছেলে ছিল, তারা সরকার পক্ষের হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়েই সুদূর রণাঙ্গনে প্রাণ দিয়েছিল। তাই মা তার কোলের ছেলেটিকে নিজের কাছে রেখেছিল। মৃত্যুর সময় দশ বছরের বালক রতনকে তার এক ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে বলে, ভেইয়া দেখ্না, রতন মেরে লাল—মেরে বাচ্চা কভি না লড়াইমে নাম লিখায়!

গৃহের শান্ত নিরুপদ্রব পরিবেশের মধ্যে থাকলেও রতনের শরীরে তার পূর্বপুরুষের যে রক্ত ছিল তাতে ছিল যে লড়াইয়ের নেশা, মাঝে মাঝে সেটাই রতনকে চঞ্চল করে তুলতো।

কলকাতায় এসে রতনের বিশেষ কোন কাজকর্ম ছিল না। নীলিমার টুকিটাকি ফরমায়েস ছাড়া বেশির ভাগ সময় নিচের একটা ঘরে পড়ে পড়ে ঘুম দিত। মাঝে মাঝে বাইরে বের হয়ে দশ মাইল বারো মাইল একনাগাড়ে হেঁটে ঘুরে আসত।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে শহরের বুকে। দোকানে দোকানে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে। নীলিমা তার ঘরের মধ্যে বসে ডাইরিটা লিখছিল।

ঘরের ভিতরের আলো জ্বালা হয়নি। দিনের আলো নিঃশেষে লুপ্ত হওয়ায়, ঘরের মধ্যেই ইতিমধ্যে যে অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে নজরে পড়েনি তা নীলিমার।

লেখা আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। নীলিমা উঠে পড়ল টেবিল ছেড়ে।

ঝি এসে ঘরে প্রবেশ করল, দিদিমণি চা আনবো তোমার?

কে, তারা? হ্যাঁ, চা নিয়ে এসো। আর শোন, দেখ তো নীচে রতন আছে কি না, তাকে একবার আমার ঘরে ডেকে দিও।

তারা চলে গেল।

নীলিমার বাবা আজ দিন দুয়েক হলো বাড়ি নেই। মাঝে মাঝে এমনি হঠাৎ চলে যান তিনি, তারপর হঠাৎ আবার এসে হাজির হন।

নীলিমার মা এসে নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করলেন ছায়ার মত।

এ কি! আলো জ্বালিসনি?

না মা—দাঁড়াও, জ্বেলে দিই আলোটা।

নীলিমা এগিয়ে গিয়ে সুইচ টিপে আলোটা জ্বেলে দিল।

অবেলায় এসেও কিছু তখন খেলি না—কয়েকটা লুচি ভেজে দিতে বলি?

না মা, এখন আর কিছু খাব না। অবেলায় যেটুকু ভাত খেয়েছি তাতেই পেটটা ভারি হয়ে আছে।

এক কাপ দুধ দিতে বলি তবে?

না না—এখন কেবল চা'ই খাবো। পরে, তারপর হঠাৎ কি ভেবে বললে, মা, আজ রাত্রে আমার এক বান্ধবীর বাড়িতে আমার নিমন্ত্রণ আছে—একটু পরে বের হচ্ছি, সেখান থেকেই খেয়ে ফিরবো।

মা মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন, কিন্তু কোন প্রশ্ন করেন না।

ভয় নেই মা—একা যাবো না, রতনকে সঙ্গে নিচ্ছি।

বাইরে রতনের গলার স্বর শোনা গেল, দিদি!

কে, রতন? আয়, ঘরে আয়।

BanglaBook.org

মা নিঃশব্দে যেমন এসেছিলেন, তেমনি নিঃশব্দেই ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

রতন এসে ঘরে প্রবেশ করে সামনে দাঁড়াল, দিদি, ম্যায়নে বোলায়া?

হ্যাঁ, কোথাও যাস্ না রতন। একটু পরে আমার সঙ্গে বাইরে যেতে হবে।

জি।

যা—নীচে তোর ঘরেই থাকিস্।

জি। রতন চলে গেল ঘর ছেড়ে।

নীলিমার দাদু ডাঃ দ্বিজনাথ চৌধুরী ছিলেন আত্মভোলা অঙ্কের অধ্যাপক মানুষ। তবে সাধারণতঃ অধ্যাপকেরা যেমন নিরীহ শান্তশিষ্ট প্রকৃতির হন এবং দিনরাত অধ্যয়নপ্রিয় হন, ডাঃ দ্বিজনাথ আদপেই সেই প্রকৃতির লোক ছিলেন না।

পড়াশুনার সঙ্গে ছোটবেলা হতেই নিয়মিত কুস্তি করা, বারবেল করা, ঘোড়ায় চড়া, লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, বন্দুক ছোঁড়া সব কিছুই তাঁর একসঙ্গে চলত। বাঙালীর মধ্যে অমন সুন্দর বলিষ্ঠ গঠন সচরাচর বড় একটা চোখে পড়ত না। বিলাত থেকে ম্যাথমেটিক্স্ এ পি. এইচ. ডি হয়ে সোজা তিনি লাহোর কলেজে গিয়ে অধ্যাপনার কাজ নিলেন। এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই কাজেই নিযুক্ত ছিলেন।

পূর্ববঙ্গে বাপের বিস্তৃত জমিদারী বা তার থেকে যে অর্থাগম হতো তার প্রতি কোনদিনই কোন আকর্ষণই বোধ করেননি দ্বিজনাথ।

একটি মাত্র মেয়ে সরমা, তাকে জন্ম দিয়েই স্ত্রী কাদম্বরী মারা যায়। আর বিবাহ করেননি দ্বিজনাথ। মেয়েকে মানুষ করে বড় করে তার বিবাহ দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নামকরা ছাত্রের সঙ্গেই। তারপর দেশের বাপের সমস্ত জমিদারী বিক্রী করে দিয়ে, তার অর্ধেক মেয়েকে দিয়ে বাকী অর্ধেক নিজের নাতনী নীলিমার নামে ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দিয়েছিলেন।

নীলিমার যখন বছর চারেক বয়েস হঠাৎ একবার বড়দিনের ছুটিতে কলকাতায় মেয়ের ওখানে গিয়ে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে চম্‌কে উঠলেন দ্বিজনাথ। বছর চারেক বাপ আর মেয়ের দেখাসাক্ষাৎ ছিল না, তারপর আবার এই সাক্ষাৎ।

সস্নেহে দ্বিজনাথ মেয়েকে প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে রে সরো?

কিছু না তো বাবা! সরমা মুখটা ফিরিয়ে নিল বোধহয় উদ্ধত অশ্রুকে গোপন করতেই।

সস্নেহে মেয়েকে এবার হাত বাড়িয়ে একেবারে কোলের কাছে টেনে নিলেন দ্বিজনাথ, আমার কাছে লুকোসনি মা। বল্, অরু—

না, তিনি তো বাবা আমাকে রাণীর মত ঐশ্বর্যের মধ্যেই রেখেছেন। চুপ করে গেল সরমা।

কয়েকটা দিন আপ্রাণ চেষ্টা করেও দ্বিজনাথ মেয়ের মুখ থেকে একটি কথাও বের করতে পারলেন না।

আত্মভোলা একান্ত সরল প্রকৃতির লোক হলেও দ্বিজানাথের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিকে সরমা এড়াতে পারেনি। নিশিদিন যে অন্তর্দাহ তার সমগ্র অন্তরের মধ্যে থেকে অঙ্কুশবিদ্ধ করছিল, যে যন্ত্রণা প্রতি পলে প্রতি মুহূর্তে সরমা সহ্য করছিল, তারই বিষাদ-ক্লিষ্ট ছায়া পড়েছিল সরমার মুখখানিতে। যাবার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা দ্বিজনাথ তাঁর নির্দিষ্ট ঘরখানিতে বসে আপন মনে ঐদিনকার সংবাদপত্র পড়ছিলেন, সরমা নিঃশব্দে এসে পাশটিতে দাঁড়াল, বাবা!

কি মা? আয়, বোস্।

BanglaBook.org

নীলুকে তুমি তোমার সঙ্গে করে লাহোরে নিয়ে যাও বাবা। এখানে থাকলে—বাকী কথাটা সরমার রুদ্ধকণ্ঠে আটকে গেল।

বেশ, তাই হবে। আমারও বড় একা একা লাগে রে! নীলুকে নিয়ে গিয়ে আমিই মানুষ করবো। তারপর হঠাৎ কথার মধ্যে একটু রহস্য টেনে এনে বললেন, মেয়েকে ছেড়ে থাকতে পারবি তো? তা হ্যাঁ রে, শেষে আবার দু'দিন না যেতে যেতেই 'তার' করবি না তো, বাবা—পাঠিয়ে দাও! দেখিস? হাসতে লাগলেন দ্বিজনাথ।

না, তা বলবো না—

তা হ্যাঁ রে, অরু—অরুর মত আছে তো এতে?

হ্যাঁ। তিনি শুনে কোন আপত্তি করেননি।

বেশ, তার আর কি—

সে-যাত্রায়ই দ্বিজনাথ নীলিমাকে সঙ্গে করে লাহোরে নিজের কর্মস্থলে নিয়ে এলেন।

দ্বিজনাথ নীলিমাকে নিয়ে এলেন।

অদ্ভুত মেয়েটি! বিশেষ কোন কান্নাকাটি করলে না।

একজন দাই ও একজন ঝি রেখে দিলেন দ্বিজনাথ নীলিমাকে দেখাশুনা করবার জন্য।

বাড়িতে দ্বিতীয় আর কোন সমবয়সী মেয়ে না থাকায় এবং ঝি ও দাই বাদে বেশীর ভাগ সময় দ্বিজনাথের সঙ্গে সঙ্গে থাকায় নীলিমার প্রকৃতিটাও একটু বিশেষ রকমভাবে অন্য ধারায় গড়িয়ে চললো।

দাদুর সঙ্গে লাফালাফি, ছুটোছুটি, তরোয়াল খেলা, বন্দুক ছোঁড়া, ঘোড়ায় চড়া নীলিমার সহজাত নারীপ্রকৃতি যেন কোথায় চাপা পড়ে যেতে লাগলো এবং একটা সহজ পৌরুষ ধীরে ধীরে নীলিমার সমস্ত দেহ ও মনকে ঘিরে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগলো।

সাধারণ মেয়েলী ঢং, লজ্জা বা ব্রীড়া তার জায়গায় দেখা দিতে লাগলো ক্রমে সহজ সরল একটা অকুতোভয়তা—সংকোচহীনতা—দুর্দমনীয়তা।

পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি থেকে প্রবেশিকা, আই. এ. ও ক্রমে বি. এ. পাস করলে নীলিমা।

মাঝখানের এই যে এতগুলো বছর—একবার মাত্র দিন সাতেকের জন্য নীলিমা কলকাতায় তার মায়ের কাছে গিয়েছিল আর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। আকস্মিক ভাবে দাদুর মৃত্যুর পর নীলিমা দেখলে, দাদু তার নামে ব্যাঙ্কে অনেক টাকা রেখে গেছেন বটে তবে আজ সে লাহোরে একাকী। একপ্রকার বাধ্য হয়েই তাই কলকাতায় মা-বাবার কাছে চলে আসতে হলো।

দ্বিজনাথ লোকটি ছিলেন সাহসী—সরল ও একান্তভাবে সত্যপ্রিয়।

অন্যায়কে তিনি কোন দিনই সহ্য করতে পারেননি।

নীলিমাও ঠিক দাদুর প্রকৃতিই পেয়েছিল। অবাধ স্বাধীনতা—খুশিমত যেখানে ইচ্ছা যাতায়াত করা এ সব ব্যাপারে দ্বিজনাথ কোন দিনই নীলিমাকে বাধা দেননি। গায়ে তার শক্তিও ছিল যেমন প্রচুর—সাহস ও আত্মরক্ষার ক্ষমতাও ছিল তার তেমনি।

ভয় বলে কোন বস্তুকে সে কখনো জানেনি। তা ছাড়া সর্বত্র রতন সর্বদাই ছায়ার মত নীলিমাকে অনুসরণ করতো। একাকী কখনো জনহীন বা জনপূর্ণ পথে নীলিমাকে চলতে দেখা গেলেও, লোক জানত তার অল্প কিছু দূরেই অনুসরণ করছে তাকে জাঠ যুবক রতন সিং ছায়ার মত নিঃশব্দে।

BanglaBook.org

গরম কালো রংয়ের সার্জের লংস ও সেই রংয়ের ব্লাউজ পরিধান করেছে নীলিমা। মাথায় ধূসর বর্ণের 'বেরে' ক্যাপ্, পায়ে ক্রেপ্-সোলের 'সু' জুতো।

আলমারির গায়ের সংলগ্ন প্রমাণ-সাইজের দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীলিমা ছোট্ট একটা অ্যাটাচী কেস থেকে ছদ্মবেশের সাজসরঞ্জাম বের করে, ঠোঁটের উপরে সূক্ষ্ম একটা গোঁফ লাগাচ্ছিল স্পিরিট্ গামের সাহায্যে।

গোঁফ লাগাতে লাগাতে মনে মনেই মৃদু মৃদু হাসছিল নীলিমা।

কে বলবে এই পোশাকের অন্তরালে আত্মগোপন করেছে তরুণী এক নারী।

তেইশ-চব্বিশ বছরের সুগঠিত দেহ এক তরুণ যুবাপুরুষ যেন!

সাজসজ্জা শেষ করে বার বার দর্পণের সামনে নানাভাবে ঘুরে-ফিরে নিজের বেশ ও চেহারাটা দেখতে থাকে নীলিমা।

পাশের ঘরে ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি দশটা ঘোষণা করলে। এর মধ্যেই বাড়িটা নিঝুম হয়ে এসেছে। মা এখন পূজাশেষে ছাতের সেই ছোট্ট ঘরের দরজাটার গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজে নিত্যকার মত হয়ত বসে আছেন।

স্পষ্ট ও চোখের উপরে দেখতে পায়—মায়ের নিমীলিত দু'টি চোখের কোল বেয়ে নিঃশব্দে অশ্রুর একটি ক্ষীণ রেখা নেমে আসছে অন্ধকারে।

সহসা সমস্ত অন্তরটা অদৃশ্য একটা ব্যথায় ম্লান বিষণ্ণ হয়ে আসে যেন নীলিমার। নিরুপায় আক্রোশে দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু যেন আলোড়ন জাগায়।

অথচ দাদুর কাছে শিক্ষা পেয়েছে সে—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম!

তাহলে অন্যায়কেই কি সে মেনে নেবে? মা তো নিঃশব্দে সমস্ত জীবন দিয়ে মেনে নিয়েছেন। নিজেকে নিঃস্ব করে আর একজনের সত্তার কাছে বিলিয়ে দিয়েছেন। নিজের ব্যক্তিত্ব, শুভাশুভ, সুখদুঃখ সব—সব কিছুই একজনের ইচ্ছা ও প্রকৃতির কাছে বিসর্জন দিয়েছেন। তা হোক—তবু সে তা পারবে না।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে নিজের ঘর হতে বের হয়ে এলো নীলিমা।

সমস্ত বাড়িটার মধ্যে কোন সাড়াশব্দ নেই। বারান্দার কমশক্তির ইলেকট্রিক বাতিটা যেন কেমন ঘোলাটে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। রতন প্রস্তুত হয়েই ছিল।

এক ডাকে সাড়া দিয়ে নীলিমার সামনে এসে দাঁড়াল।

চল।

দুজনে সদর গেট দিয়ে বের হয়ে গেল।

নেপালী দারোয়ানটা একবার মাত্র চোখ তুলে ওদের দেখে, আবার চোখ নামিয়ে নিশ্চল হয়ে বসে রইলো।

BanglaBook.org

॥ ১০ ॥

তারপর? শশাংক রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করে দিগেন সান্যালকে।

অজয়, তোমার কাকা বললেন, সুনীল নাকি কিছুদিন আগে হতেই গোপনে গোপনে তাঁর

গবেষণার নথিপত্র থেকে কপি করছিল। সুনীলের যত্রতত্র অবাধ গতিবিধি ছিল—যখন তখন সে কাজে অকাজে ও বাড়িতে ও ল্যাবরেটারি ঘরে যাতায়াত করত। সে যে একটা দুরভিসন্ধি নিয়ে অজয়ের সর্বনাশ করছে, তা সে স্বপ্নেও মুহূর্তের জন্য ভাবেনি—অবশ্য কেউ ভাবতেও পারে না।

কেমন করে কাকা তবে ব্যাপারটা জানতে পারলেন?

সেই কথাই বলবো। হঠাৎ একদিন ল্যাবরেটারিতে কাজ করতে করতে একটা রসায়নের পুস্তকের মধ্যে একখানা সুনীলের নামে চিঠি দেখতে পান তোমার কাকা। সুনীল হয়ত কোন একসময় অসাবধানতাবশতঃ বা মনের ভুলে, চিঠিখানা ঐ বইয়ের মধ্যে ফেলে রেখেছিল। যাহোক ঐ চিঠি থেকেই জানা যায়, দু'লক্ষ টাকার বিনিময়ে সুনীল জাপানের কাছে, জাপানের কনসালের সাহায্যে গোপনে ঐ অজয়ের গবেষণার ব্যাপারটা বিক্রী করছে। সেই সম্পর্কেই ওতে সব লেখা ছিল। তখন সন্ধ্যা হবে-হবে প্রায়—অজয় পাগলের মত তখনি ছুটলেন সুনীলের ওখানে। কেননা কয়েকদিন ধরে সুনীল অজয়ের ওখানে আসছিল না। সুনীলের ওখানে গিয়ে অজয় সুনীলের দেখা পেলেন না। অস্থির চঞ্চল হয়ে ফিরে এলেন তাঁর বাসায়। আগেই বলেছি গবেষণার সমস্ত অংশ তিন অংশে ভাগ করে তিন জায়গায় পৃথক পৃথক ভাবে রেখেছিলেন—একটা ছিল ল্যাবরেটারি ঘরের একটা ড্রয়ারের মধ্যে, একটা অংশ ছিল অজয়ের শয়নকক্ষের আলমারিতে আর একটা অংশ লাইব্রেরীতে একটা বইয়ের মধ্যে। ল্যাবরেটারির যে অংশটা সে হাতের কাছে পেয়েছিল, সেটাই সে কপি করে নিয়েছিল। সুনীল বোধ হয় ভেবেছিল ঐটাই সব। যাই হোক ঐ রাত্রেই অজয় সুনীলের বাড়িতে আবার গেলেন, কিন্তু গিয়ে শুনলেন ভোররাত্রের হাওয়াই জাহাজে সুনীল সিংগাপুর চলে গিয়েছে।

আমি সমস্ত ব্যাপারটা শুনে তো থ'! কি বলবো বুঝতে পারলাম না। অজয় বললেন, কালই জাহাজে সিংগাপুর যাত্রা করছেন। তাঁর এত পরিশ্রমের গবেষণা এমন করে বেহাত হয়ে যাবে, কিছুতেই যেন সহ্য করতে পারছেন না। সুনীলকে তিনি বলবেন, দু'লক্ষ কেন তিন লক্ষ টাকা সুনীলকে দেবেন—সুনীল যেন ও-কাজ না করে। এবং শেষে বললেন, তাঁর লাইব্রেরী ঘরে একটা জার্মান সিন্দুক আছে, সেটার তালাটা সাংকেতিক অক্ষর দিয়ে খুলতে হয়। সেই সিন্দুকের মধ্যেই এক্সপেরিমেন্টের আসল অংশের কপিটা বন্ধ করে রেখে গেলেন, বাকী অংশটা লাইব্রেরীর মধ্যে কোথায় কোন্ বইয়ের মধ্যে রেখে গেলেন তাও বলে গেলেন না এবং শেষ ১/৩ অংশটাই নাকি ছিল লাইব্রেরী ঘরে একটা বইয়ের মধ্যে, সুনীল তাই ১/৩ অংশের সন্ধান পায়নি ল্যাবরেটারির ড্রয়ারে এবং তালা খুলবার সাংকেতিক কথাটাও আমাকে বলে গেলেন না। বললেন, যদি প্রয়োজন হয় তো সাংকেতিক অক্ষরটা আমাকে পরে 'তার' মারফৎ জানাবেন। আরো বললেন, যদি তাঁর কাগজপত্র উদ্ধার করতে পারেন তবেই ফিরবেন নচেৎ তাঁর শেষ উইল, তো আমি জানিই—সেইমত কাজ হবে। তুমিই হবে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশন। যাহোক পরের দিনই জাহাজ ছিল। অজয় সিংগাপুর চলে গেলেন। দিন বারো পরে হঠাৎ তাঁর একটা 'তার' পেলাম, অবিলম্বে সিংগাপুর যাত্রা করবার জন্য। আমি যেদিন গিয়ে সিংগাপুর পৌঁছাই, তারই আগের দিন জাপান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ও পার্ল হারবার আক্রমণ করেছে অতর্কিতে।

দিগেন সান্যাল এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন।

ভৃত্য এসে কক্ষে প্রবেশ করল, রান্না হয়ে গেছে। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করছে খাওয়ার টেবিল কি সাজানো হবে এখন?

BanglaBook.org

ও, রান্না হয়ে গেছে! যা, তবে টেবিলে খানা দিতে বল্।

ভৃত্য চলে গেল আদেশ পালন করতে।

চল শশাংক, বাকীটা তোমায় খাবার টেবিলে খেতে খেতেই বলবো। চল—ওঠ।

শশাংক উঠে পড়ে।

টেবিলে বসে আহার করতে করতে দিগেন সান্যাল আবার তাঁর অসমাপ্ত কাহিনীর জের টেনে চললেন, সিংগাপুরে যখন গিয়ে পৌঁছলাম, সেখানকার অবস্থা যুদ্ধপরিস্থিতির জন্য তখন থম্‌থম্ করছে। চারিদিকে একটা ভয়ংকর গুমোট ভাব।

শহরের সর্বত্র সৈন্যদের কর্মচাঞ্চল্য। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে প্রহরা।

জাহাজে একদফা খানাতল্লাসী হয়ে গিয়েছিল। কাস্টমস্ অফিসেও হলো আর একদফা খানাতল্লাসী। অজয় আমাকে তাঁর ঠিকানা দিয়েছিলেন 'স্লোভিউ' হোটেল—সুইট নাম্বার ১৬, সেকেণ্ড ফ্লোর। হোটেলে পৌঁছেই অজয়ের খোঁজ করতে গিয়ে শুনলাম, দিন আটেক হলো হোটেলে তিনি আসেন না।

কথাটা শুনে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠলাম। কোনমতে হোটেলের ঘরে জিনিসপত্রগুলো রেখে একটু ব্রেকফাস্ট করেই ছুটলাম থানায়। সেখানে গিয়েও কোন সংবাদ পেলাম না।

শহরে তিন-চারটে হাসপাতাল। খোঁজ করতে করতে অবশেষে জানতে পারলাম, একটা হাসপাতালে সাতদিন আগে মধ্যরাত্রে সমুদ্রের ধার থেকে একজনের রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মৃতপ্রায় দেহ তুলে আনা হয়েছিল—জল-পুলিসের লোক সংবাদ দেওয়ায়। হাসপাতালে আসবার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই লোকটা মারা যায়। তার পকেটে যে পার্স ও পাসপোর্ট ছিল তা থেকে জানা যায় লোকটার নাম ডাঃ অজয় মিত্র। আর কোন সংবাদই পাওয়া যায়নি। অবসন্ন ক্লান্ত মনে হোটেলে ফিরে এলাম। এমন সময় হোটেলের ম্যানেজার এসে আমাকে একটা সিল্ড্ এনভেলাপ দিল। উপরে আমার নাম লেখা এবং ম্যানেজারকে নির্দেশ দেওয়া ছিল এনভেলাপটা যেন আমার হাতে আমি এলে পৌঁছে দেওয়া হয়। চিঠিটা খুলে ফেললাম। তাতে লেখা ছিল ঃ

দিগেন ভাই,

তোমাকে এখানে শীঘ্র চলে আসবার জন্য তার করেছি, হয়ত এর মধ্যে তুমি রওনা হয়েও পড়েছো। আজ রাত্রে একটা বিশেষ অ্যাপয়েন্টমেণ্টে এক জায়গায় যাচ্ছি, সুনীলও সেখানে থাকবে। জীবনে কখনো কোন কারণেই ভীত হইনি। আজ কেন না জানি অকারণে একটা আশংকায় মনটা আমার অসাড় হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে জীবনের শেষ মুহূর্ত বোধ হয় আমার ঘনিয়ে এলো। কেন যেন মনে হচ্ছে, আর বুঝি এ জীবনে তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। যদি নাই হয়, দু'টি কাজের ভার তোমাকে দিয়ে গেলাম—১নং, আমার এত পরিশ্রমের সাধনা যেন এমন ভাবে ব্যর্থ না হয়ে যায় সেটা তুমি দেখো। কলকাতার বাড়ির লাইব্রেরী ঘরের আয়রন চেস্টের তালা খুলবার সাংকেতিক শব্দ হচ্ছে—ইংরাজীতে ইস্কাবনের টেক্কা Ace of Spades! আর যে ১/৩ অংশের কথা তোমায় বলিনি সেটা আছে লাইব্রেরী ঘরে ১৩৩ নং বইয়ের মধ্যে, দক্ষিণদিকের ২নং আলমারিতে। ২নং, শশাংক রইলো তাকে তুমি দেখো। ভালবাসা রইলো।

পুনঃ। চিঠিটা পড়া হয়ে গেলেই ছিঁড়ে ফেল।

তোমার

অজু মিত্তির।

ছোটবেলা হতে অজয়কে জানি। চিঠিটা পড়ে মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল। চিঠিটা ছিঁড়ে

BanglaBook.org

ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে শয়তান সুনীলের উপরে অসহ্য ক্রোধে ও আক্রোশে সর্বাঙ্গ আমার জ্বলে যেতে লাগল।

কি করি! এর কি উপায় করি!

ক্রমান্বয়ে দু'টো দিন উদ্‌ভ্রান্তের মত শহরের রাস্তায় রাস্তায় যে দিকে দু'চক্ষু যায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। অজয়ের মত বন্ধু ও সুহৃদ জীবনে আর আমি পাইনি। অজয়ের বন্ধুত্ব জীবনের একটা মস্তবড় সৌভাগ্য ছিল আমার। সেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বন্ধু বিদেশে আত্মীয়স্বজনহীন কোন নির্জন সাগরকূলে অদৃশ্য আততায়ীর নিষ্ঠুর ছুরিকাঘাতে এমনি করে প্রাণ দিয়ে গেল!

মৃত্যু-শয্যার পাশে এমন কেউ আপনার জন বা প্রিয়জন রইলো না যার মৃদু স্নেহপরশটুকু তার শেষ যন্ত্রণাকাতর বিদায়ের মুহূর্তটিকে সান্ত্বনায় ভরে দিতে পারত।

ঐ সঙ্গে কেবলই মনে পড়তে লাগলো আর এক শয়তান বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর কথা। আবাল্যের বন্ধুত্বের চরম প্রতিদানই সে দিয়েছে বটে! এত দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্বের কথা ভুলে গিয়ে চরম ও নিষ্ঠুরতম আঘাত হেনেছে। এই যদি হয় দুনিয়ায় বন্ধুত্বের দাম—তবে এ পৃথিবীর মানুষ আজ সভ্যতা শিক্ষা ও কৃষ্টির গর্ব করে কেন! কোন্ সর্বনাশা ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে মানুষ আজ! প্রীতি-ভালবাসা-স্নেহ মানুষের অন্তর থেকে যদি এমনি করেই যে কোন মুহূর্তে নিঃশেষে মুছে যেতে পারে, তবে মানুষের বাঁচবার আর কি সান্ত্বনা রইলো?

॥ ১১ ॥

তারপর?

তারপর ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে একদিন হঠাৎ এক রেস্তরাঁর সামনে দিয়ে চলতে চলতে দেখি, সুনীল কর রেস্তরাঁ থেকে বের হয়ে সামনেই বাজারের পথের দিকে হন্‌হন্ করে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

দূর থেকে সুনীলকে দেখেই চমকে উঠলাম ও দ্রুত তাকে অনুসরণ করলাম। বাজারের ভিতরে গিয়ে তাকে ধরলাম। কিন্তু সে যে আমাকে কোন'দিন চেনে সম্পূর্ণ অস্বীকার করলো। তার মুখের কথা শুনে মনে হলো ইতিপূর্বে জীবনে সে আমাকে কখনো দেখেওনি বুঝি। স্তম্ভিত নির্বাক হয়ে গেলাম।

কতক্ষণ ঠিক দাঁড়িয়েছিলাম মনে নেই। যখন খেয়াল হলো দেখি আশেপাশে কোথাও সুনীলের চিহ্নমাত্র নেই।

সেই দিনই হোটেলে ফিরে তোমাকে পত্র দিই।

আপনার সে চিঠি আমি যথাসময়েই পেয়েছিলাম। শশাংক মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়।

দিগেন সান্যাল আবার বলতে শুরু করলেন, চন্দননগরে বলদেব থাকতো। তুমিও হয়ত জান বলদেব হচ্ছেন তোমার ঠাকুরদার আমলে যে জমিদারীর নায়েব রসময় ঘোষ ছিলেন—তাঁরই ছেলে ঐ বলদেব ঘোষ।

হ্যাঁ, বলদেব কাকা!

শয়তানের দল সেই নিরীহ বলদেবকে পর্যন্ত খুন করেছে। আজ সকালে পুলিস এসেছিল তার সম্পর্কে এনকোয়ারী করতে। তার মৃতদেহ নাকি তার চন্দননগরের বাড়িতে পাওয়া গিয়েছে।

আমি তা জানি।

BanglaBook.org

জান! বলদেবকেও খুন করা হয়েছে তুমি জান?

হ্যাঁ।

সংক্ষেপে শশাংক আবার সে রাত্রে বলদেব সংক্রান্ত কাহিনীটুকু দিগেন সান্যালের কাছে বিবৃত করে। কারণ প্রথম বারে সে বলদেব সম্পর্কে কোন কথা বলেনি।

কিছুকাল স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে দিগেন সান্যাল বললেন, তাই এখন বুঝতে পারছি, পুলিসের লোকেরা তার বাড়ির খাতাপত্রের মধ্যে সিংগাপুর থেকে যে শেষ চিঠিটা লিখেছিলাম—তারই সূত্র ধরে অনুসরণ করতে করতে আমার এখানকার ঠিকানা জেনে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, কিন্তু বুঝতে পারছি এও—ওরা সেখানে তোমার উপস্থিতির কথা কিছু জানে না আর তাই বোধ হয় তারা তোমার কাছে যায়নি। Poor বলদেব! যাবার অর্থাৎ এখান থেকে অজুর তার পেয়ে সিংগাপুরে যাবার আগের দিন রাত্রে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে এসেছিল আমারই সঙ্গে দেখা করতে। অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ হয় না। যাবার আগে তাড়াতাড়িতে তোমার সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলে যেতে পারলাম না বলে তাকেই সব মোটামুটি উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলাম। বেচারী সাতেও নেই পাঁচেও নেই, হঠাৎ কোথা থেকে দৈবচক্রে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়ে ওদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হলো।

দিগেন সান্যালের বাসায় খাওয়াটা সাধারণতঃ একটু সাহেবী ধরনের হয়। খাদ্যের মেনুও কতকটা সেই প্রকারের হয়ে থাকে।

সব কিছুর শেষে একটু মিষ্টির ব্যবস্থা অর্থাৎ পুডিং জাতীয় খাদ্য ও তারপর আহার সমাপনান্তে একটু গরম কফি এটা তাঁর চাইই।

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। ভৃত্য টেবিলে পুডিংয়ের প্লেটটা নামিয়ে রেখে গেল ও অন্য একজন ভৃত্য ঐ সঙ্গে কফির পাত্র নামিয়ে রাখতে যেতেই দিগেন সান্যাল বললেন, কফিটা বাইরের ঘরে দে গোবিন্দ।

হাতমুখ ধুয়ে দিগেন সান্যাল শশাংককে নিয়ে আবার এসে বাইরের ঘরে বসলেন।

ভৃত্য কফির সাজসরঞ্জাম একটা ট্রেতে করে সামনের টিপয়ের উপর এনে নামিয়ে রেখে গেল ড্রয়িংরুমে।

কফি চলবে তো শশাংক?

আজ্ঞে না। কফি খেলে আমার রাত্রে ঘুম আসতে চায় না।

বল কি হে! It's a nice soothing stimulent for a good sleep in the night! অভ্যাস করো, অভ্যাস করো। You will find it is really charming and delicious !

ঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি এগারোটা ঘোষণা করলে।

পাইপে তামাক ভরে পাইপ খেতে খেতে দিগেন সান্যাল কফির পাত্রে চুমুক দিচ্ছিলেন মাঝে মাঝে। ঘড়ির শব্দে চমকে উঠে বললেন, উঃ, রাত অনেক হলো! আর তো তোমার দেরি করা উচিত নয় শশাংক। সঙ্গে গাড়ি আছে তো?

না, গাড়িটা আমার চুরি গেছে।

অ্যাঁ!

বললাম যে আপনাকে প্রথমেই—প্রথম রাত্রেই সেটা চুরি যায়।

থানায় ডাইরী করে দিয়েছো তো?

না।

BanglaBook.org

কালই সকালে থানায় একটা ডাইরী করে দিও।

পুলিসে সব জানাজানি হবার ভয়েই—

ছেলেমানুষ! পুলিসের সাহায্য ছাড়া এক পাও যে এগুনো যাবে না হে। প্রাইভেট ডিটেকটিভের বুদ্ধি থাকতে পারে, শক্তি থাকতে পারে, কিন্তু আইন যে তাদের হাতের বাইরে! সেখানেও তাই তাদের শেষ পর্যন্ত পুলিসেরই শরণাপন্ন হতে হয়। না, না—আর দেরি নয়। কাল সকালের দিকেই আমার এখানে তুমি আসবে। এখানকার পুলিস কমিশনার চট্টরাজ আমার বিশেষ বন্ধু। তোমাকে নিয়ে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে সব বলতে হবে।

কিন্তু সুব্রতবাবু?

তাকেও সকালে উঠেই একটা ফোন করে আমার কথা সব বলবে। তাকে অনুরোধ জানাবে। তিনি যেন কাল সকালের দিকে অনুগ্রহ করে একবার তোমার সঙ্গেই আমার এখানে আসেন। সকলে মিলে একটা পরামর্শও করা প্রয়োজন। সুব্রতবাবু নিজেও এককালে পুলিসের একজন বড় অফিসার ছিলেন, তাঁর সাহায্যেরও এখন আমাদের বিশেষ প্রয়োজন বৈকি। তাহলে এক কাজ করি—ড্রাইভারকে ডেকে বলি তোমাকে না হয় পৌঁছেই দিয়ে আসুক, কি বল?

না না—তার কোন প্রয়োজন নেই। এই সামান্য পথটুকু আমি হেঁটেই চলে যেতে পারবো।

শশাংক এর পর বিদায় নিয়ে দিগেন সান্যালের বাড়ি থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল।

অন্ধকার রাত্রি এর মধ্যেই যেন ঝিম্ ঝিম্ করছে। রাস্তাঘাট প্রায় জনহীন বললেও অত্যুক্তি হয় না। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ট্রাম-বাসও বন্ধ। মাঝে মাঝে কেবল দু-একটা রিক্সার টুংটাং ঘণ্টার শব্দ নিস্তব্ধ রাত্রির জমাট স্তব্ধতাকে যেন অকস্মাৎ ভঙ্গ করে করে চলেছে।

ঘণ্টার বিলীয়মান দীর্ঘায়ত শব্দটা ঢং ঢং করে অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে! বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে!

কোটের পকেটে হাত দুটো সেঁধিয়ে দিয়ে শশাংক ক্রমে হাঁটতে হাঁটতে অ্যাভিনুর উপরে এসে দাঁড়ায়।

দীর্ঘ প্রশস্ত পথটা।

সম্পূর্ণ জনহীন প্রায়। হঠাৎ পাশের একটা গলিপথ হতে একটা লোক ছুটতে ছুটতে শশাংকর সামনে এসে দাঁড়াল, বাঁচান—বাঁচান আমাকে! গুণ্ডারা আমাকে তাড়া করেছে!

গুণ্ডা! কোথায়?

লোকটা তখনও হাঁপাচ্ছে।

লোকটার চেহারা রুগ্ন। অত্যন্ত ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরিধানে, গায়ে একটা দামী শাল, পায়ে চক্‌চকে নিউকাট জুতো।

পকেটে আমার ব্যাগের মধ্যে প্রায় দুইশত টাকা ছিল, বেটারা সব ছিনিয়ে নিয়েছে। ফাউনটেন পেন্‌টা, সোনার পকেট ঘড়িটা পর্যন্ত।

হঠাৎ শশাংকর নজরে পড়ল দু'জন লোক ওদের দিকেই আসছে।

শশাংক একবার রাস্তার এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত নজর করে দেখলে জনহীন—একটি প্রাণী পর্যন্ত নেই আশেপাশে কোথাও।

ওই দেখুন ওরা বোধ হয় এদিকেই আসছে—

এককালে শশাংকও কিছুদিন ব্যায়াম অভ্যাস করেছিল। তাছাড়া তরুণ বয়সের তেজ ও রক্ত চন্‌চন্ করে ওঠে সমস্ত শরীরে।

BanglaBook.org

মুহূর্তে শশাংক সোজা হয়ে দাঁড়ায়, আসুক।

গায়ের কোটটা খুলে চট্‌পট্‌ লোকটার হাতে তুলে দেয়, ধরুন কোটটা।

লোক দু'টো ততক্ষণে একেবারে সামনে এসে পড়েছে।

শশাংকও প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায়।

লোক দু'টো এসে কিন্তু শশাংককেই আক্রমণ করে।

শশাংকও যুঝতে থাকে একই সময়ে দু'টো লোকের সঙ্গে।

হঠাৎ কানে একটা কথা আসে, শালা কোট হাতে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? ধর্‌ না রুমালটা চেপে ব্যাটার মুখে!

প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও একটা রুমাল শশাংকর নাকের উপরে চেপে বসে, একটা মিষ্টি গন্ধ। উগ্র মিষ্টি গন্ধে সমস্ত বোধশক্তিটা যেন কেমন ধোঁয়াটে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। হাত-পা সব শিথিল হয়ে আসছে। একটা গর্জন শোনা যায়—ঘর্‌-র্‌-র্‌! শশাংকর জ্ঞান লুপ্ত হলো।

একটা প্রাইভেট গাড়ি এসে লোকগুলোর সামনে দাঁড়াল।

॥ ১২ ॥

নীলিমা আগেই সন্ধান পেয়েছিল, শশাংককে আবার গায়েব করা হবে এবং প্রতি মুহূর্তেই তার জন্য চেষ্টা করা হবে। কিন্তু ওরা জানত না যে ফাঁদে পা দেবার জন্য শশাংক ওদের অজ্ঞাতেই এগিয়ে আসছে। ওরা জানত না, আজই রাত্রে শশাংক দিগেন সান্যালের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবে।

অরিন্দম সরকার তখন সত্যিই মরীয়া হয়ে উঠেছে। পুচ্ছ-মর্দিত ক্রুদ্ধ শার্দূলের মত তার সমস্ত পৌরুষ ব্যর্থতার অপমানে রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসছিল।

শশাংক! সেদিনকার একটা ছোকরা তার চোখে ধূলো নিক্ষেপ করে দিব্যি খোসমেজাজে এতবড় কলকাতা শহরে গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াবে আর সে কিনা মাথায় বয়ে বেড়াবে তার পৌরুষত্ব ও শক্তির দুরপনেয় অপমানের দুঃসহ গ্লানি! এবং তার সেই স্বকৃত ব্যর্থতার দোহাই দিয়ে ব্রজলাল তার বক্ষে বিদ্ধ করবে হিংস্র লালসায় "বাঘনখ"! না না—তা হবে না। সে তা হতে দেবে না।

সে রাত্রে ব্রজলাল শশাংকর বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে শশাংকর টিকিটিও দর্শন পায়নি, বলাই বাহুল্য। কারণ তখনও শশাংক তার বাড়িতে পৌঁছাতেই পারেনি।

সে রাত্রে আধ ঘণ্টাটাক পরে ব্রজলাল ফিরে এসে বললে, হালার কোনই পাত্তা নাই সরকার মশাই!

অরিন্দম সরকার তখন ভাবছিল অতঃপর কি করা কর্তব্য।

ঠিক আছে ব্রজলাল। বেটা যাবে কোথায়! এ বাড়িতেই তাকে আজ হোক কাল হোক পরশু হোক ফিরে আসতেই হবে। আমাদের লোক এই বাড়ির ঘাঁটি আগলে বসে থাকুক। সংবাদ হলেই খবর দেবে।

তা আপনে যেমন কন্‌!

সেই মতই ব্যবস্থা হলো, দিবারাত্র প্রহরার জন্য বারো ঘণ্টা বারো ঘণ্টা করে টাইম ভাগ করে তখুনি দু'জন লোকের পাহারা দেবার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

BanglaBook.org

সেই লোকের মারফতই সমস্ত সংবাদের আদান-প্রদান হয়েছে।

নীলিমা রতনকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমেই এলো অত রাত্রে আমহার্স্ট স্ট্রীটে শশাংকর বাড়িতে।

কলিং বেল টিপতেই একটু পরেই স্বরূপ এসে সামনে পুরুষবেশী নীলিমাকে দেখে চিনতে না পেরে প্রশ্ন করলে, কাকে চান?

শশাংকবাবু আছেন?

না। কি দরকার তাকে?

কোথায় গিয়েছেন? কখন ফিরবেন জান কিছু? একটা বিশেষ জরুরী দরকার ছিল।

খুব জরুরী হলে—বেশী দূর নয় শ্যামবাজারে —নং শ্যামপুকুর স্ট্রীটে দিগেন সান্যালের বাড়িতে গেলেই তার দেখা পাবেন।

বেশ, তবে আমি সেখানেই চললাম।

নীলিমা আবার রাস্তায় এসে নামল। স্বরূপ ভিতর হতে দরজাটা বন্ধ করে দিল, শব্দ শোনা গেল।

রতনকে নিয়ে সোজা নীলিমা শ্যামপুকুর স্ট্রীটের নির্দিষ্ট বাড়ির দিকেই অগ্রসর হলো। বাড়ির কাছে এসে পৌঁছতেই ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলে ঠিক রাত্রি এগারোটা।

কে জানে শশাংক ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছে কিনা?

বাড়ির দোতলার একটা ঘরের খোলা জানালাপথে আলো দেখা যাচ্ছে। একটু অপেক্ষা করবে, না আবার শশাংকর বাড়ির দিকে রওনা হবে ভাবছে—এমন সময় নীচে রাস্তায় দাঁড়িয়েই নীলিমার নজরে পড়ল, আলোকিত কক্ষের দেওয়ালে দীর্ঘ দু'টো ছায়া পড়ছে।

ছায়া দুটো ক্রমে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ এমন সময় সিঁড়ির আলো জ্বলে উঠলো।

রাস্তা হতেই ভিতরের সিঁড়ির একটা অংশ স্পষ্ট চোখে পড়ে—আরে! ঐ তো শশাংক না?

হ্যাঁ। শশাংকই তো! শশাংকই তো সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে!

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নীলিমা বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতেই পরম নিশ্চিন্তে বলে, যাক্ শশাংক তাহলে এখনও ফিরে যায়নি!

কিছুদূরে একটা ব্যালকনির সেডের নীচে অন্ধকারে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে সব নীলিমা। তার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে রতন।

শশাংক এগিয়ে চলল রাস্তা দিয়ে।

কি ভাবছে ও?

রতনকে ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বলে কিছুটা দূরত্ব রেখে নীলিমাও শশাংককে অনুসরণ করে।

ছোট একটা রাস্তা অতিক্রম করে শশাংক গিয়ে অ্যাভিনুতে পড়তেই একটা অস্পষ্ট গাড়ির ইঞ্জিনের ঘর্-র্ শব্দ কানে আসতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল নীলিমা।

অন্ধকার রাত্রি—রাস্তার আলোও এমন কিছু প্রখর নয় তথাপি গাড়ির হেডলাইট তো জ্বলছেই না—এমন কি সাইড লাইট দু'টিও নেবানো। গাড়িটা থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দরজা খুলে সামনের দিক হ'তে একজন ও পশ্চাতের দিক থেকে দু'জন লাফিয়ে রাস্তায় নামল।

গাড়িটা নিউ মডেলের একটা বিরাট লাক্সারী অ্যামেরিকান গাড়ি বলেই মনে হয়।

একজন লোক হঠাৎ ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গেল যেদিকে শশাংক গিয়েছে।

BanglaBook.org

নীলিমা নিঃশব্দে গাড়িটার পশ্চাতে এসে দাঁড়াল।

এখান থেকে অর্থাৎ গাড়ির পিছন দিকে দাঁড়িয়ে এই রাস্তাটার শেষ প্রান্ত যেখানে গিয়ে অ্যাভিনুতে মিশেছে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

ঠিক একটা লাইট্ পোস্টের নীচে শশাংক দাঁড়িয়ে। লোকটা ছুটতে ছুটতে গিয়ে শশাংকর সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন বলছে এই দিকে হাত দেখিয়ে দেখিয়ে।

এতক্ষণ নীলিমার আর সন্দেহের অবকাশ মাত্রও থাকে না। শশাংককে ধরবার জন্য এরা ফাঁদ পেতেছে নিশ্চয়ই!

ঠিক এই সময় বাকী যে লোকটি গাড়ির সামনে ঐ দিকে দৃষ্টি দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সেও দ্রুত ঐ দিকেই ছুটলো।

গাড়ির ভিতরে উঁকি দিয়ে নীলিমা দেখলো—গাড়ির মধ্যে আর কেউ নেই। গাড়ি খালি তবে মেসিনটা গাড়ির চলছে। বন্ধ করা হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ-চমকের মত একটা মতলব খেলে যায় নীলিমার মাথার মধ্যে। এগিয়ে গিয়ে ড্যাস্ বোর্ডের দিকে নজর দিতেই দেখলে, হ্যাঁ, চাবিটা ঝুলছে কি বোর্ডের সঙ্গে লাগানো—সুইচ!

চাবিটা খুলে নিয়ে চট্‌পট্ গাড়ির পশ্চাতে এসে ক্যারিয়ারের ডালাটা চাবি দিয়ে খুলে ফেললে নীলিমা। ক্যারিয়ারের মধ্যে এক বাণ্ডিল দড়ি, জগটা, দু'টো খালি পেট্রোলের টিন। রতনও ততক্ষণে নীলিমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

রতনকে বললে, ক্যারিয়ারটা চট্‌পট্ খালি করে জিনিসগুলো সরিয়ে নিতে।

জিনিসগুলো সরানো হতেই বললে, রতন, হাম ই ক্যারিয়ার কী অন্দরমে ঘুসকে গাড়ি কি সাথ্ সাথ্ যায়েংগি। হাম্ ভিতরমে ঘুস্ যাতা হ্যায়। তোম্ ইস্‌কো বন্ধ্ কর দেও—আউর এহি কুঞ্জিঠো গাড়িকা সুইচ্‌মে লাগাদো।

নীলিমা চট্‌পট্ ক্যারিয়ারের মধ্যে প্রবেশ করে উবু হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। রতন ডালাটা নামাতে নামাতে বললে, হামারা পর্ কেয়া অর্ডার হ্যায় দিদি?

কোই কিসি তারা কৌসিস করকে এহি গাড়িকা সাথ্ সাথ্ যানে সেকে তো দেখো। নেহি তো ওয়াপস্ জানা।

এদিকে একটা লোক ততক্ষণে ছুটে আসছে গাড়িটার দিকে।

রতন চট করে গাড়ির পিছন দিকে দাঁড়িয়ে নিজেকে গোপন করে।

লোকটা গাড়িতে উঠে তাড়াতাড়ি গাড়িতে স্টার্ট দেয়। ইঞ্জিন গর্জে ওঠে। গাড়িটা যে বন্ধ হয়ে ছিল, সেদিকে সে নজরই দেয় না।

শত্রুপক্ষের দু'জনে যখন শশাংকর জ্ঞানহীন দেহটা গাড়ির মধ্যে তুলতে ব্যস্ত, সেই ফাঁকে তড়িৎ পায়ে রতন আবার গাড়ির পশ্চাতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

শশাংককে গাড়িতে তুলেই ওরা গাড়ি যেমন ছেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে রতন টিকটিকির মত লাফিয়ে পশ্চাতের চওড়া বাম্পারের উপর বসে পড়ে শক্ত করে দু'হাতে বাম্পারটা চেপে ধরে।

সমান বেগে ছুটে এসে গাড়িটা দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ধারে এক বাগানবাড়ির মধ্যে ঢুকল।

গাড়ির গতিবেগ তখন খুব ধীরে। হেড্‌লাইট জ্বালিয়ে গাড়িটা আস্তে আস্তে বাগানের মধ্য দিয়ে একটা বড় অব্যবহার্য পথ ধরে এগুচ্ছে।

এতক্ষণ কোনমতে গাড়ির পিছনের বাম্পারে বসে বাম্পারটা দু'হাত দিয়ে চেপে রেখে রতনের হাত দু'টো যেন অবশ হয়ে যাবার যোগাড়। ও গাড়ি থেকে ঝুপ করে নেমে পড়ল।

BanglaBook.org

চলমান গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে ও রাস্তায় ছোট বড় সব ইঁটের টুকরোগুলো টায়ারের চাপে শব্দ করে ছিটকে যাওয়ার দরুন অনবরত গাড়ির আরোহীদের মধ্যে একমাত্র পশ্চাতের ক্যারিয়ারে উপবিষ্ট নীলিমা ছাড়া আর কেউই টের পেলে না যে রতন গাড়ি থেকে নেমে গেল ইতিমধ্যে।

নীলিমাও এতক্ষণ রতনের দুঃসাহসের জন্য রুদ্ধনিশ্বাস হয়ে ছিল। কোন্ মুহূর্তে কি সর্বনাশ ঘটে!

যাক্, শেষ পর্যন্ত রতন নিরাপদে পৌঁছে নেমে যেতে ও একটা স্বস্তির নিশ্বাস নেয়।

রতনের উপস্থিতির জন্য সাহসও অনেকটা ফিরে আসে। সঙ্গে যখন রতন আছে, শশাংকর মুক্তির ব্যবস্থা একটা হবেই।

গাড়িটা ধীরে ধীরে এসে একটা অন্ধকার গাড়িবারান্দার নীচে ততক্ষণে দাঁড়ায়।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ইঞ্জিনও বন্ধ হয়ে গেল।

শশাংকর তখন অল্প অল্প জ্ঞান ফিরে আসছে।

তিনজনে মিলে ধরাধরি করে ওরা গাড়ি থেকে শশাংককে নামাল।

একটা টর্চ হাতে অরিন্দম সরকার এসে দরজা খুলে ওদের সামনে দাঁড়াল, এনেছিস?

দেহেন কর্তা—হালার পোরে আবার ধইরা আনছি!

ব্রজলাল ওদের মধ্যে ছিল। আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে সে-ই বলে কথাটা।

নিয়ে আয় বরাবর ডানদিককার ঐ নীচের ঘরটাতেই। অরিন্দম বলে।

অদূরে কতকগুলো ঘন আম্রবৃক্ষের স্তূপীকৃত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রতন সবই লক্ষ্য করে। লোকগুলো শশাংককে বহন করে নিয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে।

একটু পরে নীলিমা ক্যারিয়ারের ঢাকনাটা তুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। কোমরটা টন্‌টন্ করছে।

অন্ধকারে রতন নীলিমার সামনে এসে দাঁড়াল, দিদি! চাপা গলায় ডাকে রতন।

চুপ, আস্তে!

॥ ১৩ ॥

অন্ধকারে যেন চোখের দৃষ্টিশক্তি একেবারে অন্ধ হয়ে গিয়েছে। চারিপাশে ঘন বৃক্ষের মধ্যে রাত্রির ঠাণ্ডা অন্ধকার যেন স্তূপ বেঁধে আছে।

আকাশের এক প্রান্তে ধীরে ধীরে মধ্যরাত্রের মৃত্যুর মত স্তব্ধতার ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে সরু একফালি চাঁদ। একটু একটু করে ক্ষীণ চাঁদের আলো চারিদিককার অন্ধকারে যেন আলোর একটা মৃদু পরশ ছুঁইয়ে দিল। ঘুমন্ত গাছপালাগুলো যেন সেই যাদুস্পর্শে চোখ মেলে পিট্ পিট্ করে তাকাতে শুরু করেছে।

মাঝে মাঝে হাওয়া বইছে, গাছের পাতায় পাতায় শব্দ জাগে বিচিত্র।

বিচিত্র চাপা কণ্ঠের মত ক্ষীণ সেই শব্দ মনে হয় যেন হঠাৎ চাঁদের আলোর ছোঁয়া পেয়ে রাত্রি বুঝি ফিস্ ফিস্ করে কি সব গোপন কথা কানে কানে কারু বলতে চায়। হঠাৎ কানে আসে নীলিমার, সেই অস্পষ্ট শব্দকে ছাপিয়ে শুক্‌নো শীতের ঝরা পাতার উপরে মৃদু একটা মর্মর ধ্বনি!

সমগ্র শ্রবণেন্দ্রিয় মুহূর্তে সজাগ হয়ে ওঠে নীলিমার।

আশেপাশে চতুর্দিকে যতটা সম্ভব অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকায় নীলিমা।

BanglaBook.org

শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু তথাপি তার মন থেকে সন্দেহের ছায়া দূর হয় না।

আবার—আবার সেই মৃদু মর্মর!

রতন! চাপা ক্ষীণ সতর্ক কণ্ঠে আহ্বান জানায় নীলিমা।

ছায়ার মত সামনের দিকে একটু ঝুঁকে সামান্য এগিয়ে আসে রতন। সেও শব্দটা শুনেছে।

ফিস্ ফিস্ করে নীলিমা বলে, দেখ তো উধার! কোই আদমী মালুম হোতা আঁধারিমে—

মুহূর্তে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল রতন নিঃশব্দে। সহসা ঠিক সেই সময়ে অতর্কিতে কার মৃদু স্পর্শ পৃষ্ঠদেশে অনুভব করতেই চকিতে বিদ্যুৎগতিতে ফিরে দাঁড়ায় নীলিমা।

Hush! ভয়ের কিছু নেই। অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে সামনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ একটি মূর্তি।

মূর্তির কপালে ও ঠোঁটের অংশটুকু মুখের বাদ দিয়ে বাকীটা একটা মুখোশের অন্তরালে ঢাকা। মুখোশের গোলাকার ছিদ্রপথে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। আগাগোড়া মূর্তির দেহে মিশকালো পোশাক।

পোশাকের অন্তরালে দীর্ঘ সুগঠিত দেহটা যেন একটা উদ্ধত ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান।

ভয় পেয়ো না আমাকে দেখে। আমার অনুমান যদি ভুল না হয়, তবে বোধ হচ্ছে তুমিও বোধ হয় আমার মতই শশাংকর শুভাকাঙ্ক্ষী! কেমন না?

অদ্ভুত প্রকৃতি নীলিমার। মৃদু হেসে বলে, অনুমান তো আপনার ভুলও হতে পারে!

না। ভুল যে করিনি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তোমার এই মুহূর্তের কথাগুলো। তাছাড়া তুমি আমায় জান না, কিন্তু আমি তোমার সম্পূর্ণ পরিচয় জানি ও তোমার সব কিছুই আমার জানা।

আপনি—

পরিচয়টা এখন দেবো না মা—

এবারে সত্যিই নীলিমা যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে একসময় রতনও এসে ওদের পাশটিতে দাঁড়িয়েছে।

শোন মা, এখানে এভাবে এসে তুমি অন্যায়ই করেছো। সাক্ষাৎ শয়তানের আড্ডা এটা। এরা মানুষের বুকে ছুরি চালাতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করে না। নিজেদের স্বার্থের জন্য এরা এমন কোন নৃশংস জঘন্য বা ঘৃণ্যতম কাজ নেই যা করতে পারে না।

কিন্তু—

ভয় নেই মা তোমার। তুমি যখন এসেছই—হ্যাঁ ভাল কথা, তুমি গাড়ি drive করতে জান কি?

জানি।

বেশ। Then hurry up! Dont delay! রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেই একটা ওভারব্রীজ দেখতে পাবে। তার নীচে কতকগুলো কাঁটা মনসার ঝোপের পাশে অন্ধকারে আমার টুরার গাড়িটা পার্ক করা আছে। এই নাও চাবি। তুমি বরং গাড়িটা এদিকে খানিকটা নিয়ে এসে এই বাগান বাড়ির ঠিক বাইরে যে বড় বট গাছটা আছে তার নীচে শশাংকর জন্য অপেক্ষা করো। তোমার ঐ অনুচরটিকে বলে দাও আমার সঙ্গে আসতে। ওর সাহায্যের আমার প্রয়োজন হতে পারে।

নীলিমা তবু ইতস্ততঃ করতে থাকে।

আগন্তুক মৃদু হেসে বললেন, আমাকে তুমি হয়ত বিশ্বাস করতে পারছো না। এই মুহূর্তে সেটা একটু কষ্টকর—তাও বুঝি—কিন্তু মা, আর তো সময় নেই। বেশী বিলম্ব করলে ওদিকে হয়ত বিপদ ঘটতে পারে। মাত্র আজকের রাতটুকুর মত তুমি আমাকে বিশ্বাস করো। আমি শপথ করে বলছি—শশাংকর বিপদের কথা জেনেই এখানে এই সময়ে আমি এসেছি। একদিক দিয়ে তোমার

BanglaBook.org

ও আমার স্বার্থ এক হলেও অন্য দিক দিয়ে তোমার চাইতেও আমার স্বার্থ ঢের বেশী! যাও মা! আমার কথা শোন।

নীলিমা কেন যেন এবারে আর আপত্তি করলে না।

রতনকে বললে আগন্তুকের সঙ্গে যেতে এবং তাকে সাহায্য করতে।

আচ্ছা। তাহলে আপনার নির্দেশমতই আমি গাড়িটা আনতে চললাম—গাড়িতেই আমি অপেক্ষা করবো।

নীলিমা অন্ধকারে ছায়ার মত মিলিয়ে গেল।

রতন?

জি?

হামরা সাথ আও!

চলিয়ে সাব!

॥ ১৪ ॥

জ্ঞানহীন শশাংককে ওরা বয়ে নিয়ে বাড়িটার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল।

বহুদিনের অব্যবহার্য ভাঙাচোরা পুরাতন একটা বাগানবাড়ি। বাড়ির মেঝে পর্যন্ত ফেটে ভেঙে গিয়ে ইতস্ততঃ সব ইট বের হয়ে পড়েছে। প্রচুর ধুলো-বালি জমে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে তুলেছে একটা পুরু আস্তরণ যেন ধুলো-বালির। একটা বিশ্রী ধুলোর গন্ধে নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে।

আগে আগে টর্চ হাতে চলেছে অরিন্দম সরকার।

পিছনে পিছনে ব্রজলাল ও বাকী দু'জনে জ্ঞানহীন শশাংকর দেহটা বয়ে নিয়ে চলেছে।

সকলে এসে একটা অপরিসর ঘরের মধ্যে ঢুকল।

ঘরের মধ্যে এক পাশে একটা পুরাতন দড়ির খাটিয়া—তার উপরে এনে অরিন্দমের নির্দেশে ওরা শশাংককে শুইয়ে দিল।

পকেট থেকে একটা সিল্ক কর্ড বের করে অরিন্দম ব্রজলালের-হাতে দিয়ে বলল, প্রথমে বেশ ভাল করে হাত-পা বাঁধো ব্রজ—তারপর খাটিয়াটার সঙ্গে বেঁধে দাও। দেখি বেটা এবারে পালায় কি করে! উঃ, কম ভুগিয়েছে!

ব্রজলাল অরিন্দমের নির্দেশে কর্ডটা দিয়ে বেশ শক্ত করে শশাংককে বেঁধে ফেললে।

বাঁধা হয়ে যেতে অরিন্দম বললে, আপাততঃ যতক্ষণ না জ্ঞান ফিরে আসে ঐ ভাবে পড়ে থাক্। চল সব বাইরে চল।

সকলে বাইরে এসে দরজায় বেশ বড় ও মজবুত দেখে একটা তালা লাগিয়ে চাবিটা নিজের পকেটে রেখে ব্রজলালের দিকে ফিরে অরিন্দম বললে, ব্রজ, তুই গোব্‌রা আর দীনু এখানে থাক, আমি চললাম কর্তাকে সংবাদটা দিতে। এত সহজে যে বেটাকে মুঠোর মধ্যে আবার এনে পুরবো স্বপ্নেও ভাবিনি। বেটা বড্ড ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছিল। তোদের দেখে তো আমি ভাবছিলাম বুঝি ধরতে পারলি না।

হেয়ায় কি যে কন সরকার মশাই! হালার পো হালা আমারে ফাঁকি দিয়া যাইবে। কিন্তু সরকার মোশাই, আমার কথাটা হেয়ায় যেন ভুলবেন না। নিঃশব্দে কুৎসিত হাসিতে ব্রজলালের ভয়ংকর মুখটা আরো যেন ভয়ংকর ও হিংস্র দেখায়।

BanglaBook.org

মৃদু হাসে অরিন্দম সরকার।

এই মুহূর্তে ব্রজলাল তার পরিশ্রমের পারিতোষিকের জন্য লোলুপ হস্ত প্রসারিত করেছে হিংস্র লোভে; অথচ ও যদি অকৃতকার্য হতো তা'হলে ঐ হস্ত দু'টি হয়ত তার বুকে বোসের দেওয়া বিষাক্ত তীব্র বাঘনখর সমূলে বিদ্ধ করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করতো না।

পর্তুগীজের বংশধর ব্রজলাল, সমুদ্রপথে ওরা একদিন নাও ভাসিয়ে হত্যা ধর্ষণ লুট করে ফিরেছে।

অর্থের লোভে কত নিরীহ বৃদ্ধ নারী কিশোর শিশুর বুকে শাণিত কৃপাণ বিদ্ধ করে অথবা তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়ে দরিয়ার পানি রাঙা করে তুলেছে নিষ্ঠুর দানবীয় উল্লাসে।

অরিন্দম সরকার চলে যাবার পরই ব্রজলাল উপরের তলায় একটা ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। পাখী হাতের মধ্যে এসে গেছে আবার। আর তার পালাবার কোন পথ নেই।

শার্দূল যেমন তার করায়ত্ত শিকারকে পরম নিশ্চিন্তে চোখের সামনে রেখে মানসিক বিলাসিতাকে উপভোগ করে, ব্রজলালও তেমনি নীচের কুঠুরীর মধ্যে অজ্ঞান অচৈতন্য শশাংককে বন্দী করে রেখে এসে পরম নিশ্চিন্তে একটা দেশী মদের বোতল নিয়ে খুলে বসল। যথেষ্ট ধকল গেছে শরীরের উপর দিয়ে। শরীরটাও কেমন ক্লান্ত। ব্রজলাল খানিকটা নির্জলা উগ্র তরল পদার্থ গলার মধ্যে ঢেলে দিয়ে চোখ বুজে, মুখ বিকৃতি করে কিছুক্ষণ ঝিম্ দিয়ে বসে রইলো। খালি পেটে উগ্র তরল পদার্থ পাকস্থলী ও যন্ত্রের শ্লৈষিক ঝিল্লীতে যেন অগ্নির জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে।

গোব্‌রা আর দীনুও এসে কক্ষে প্রবেশ করল। ব্রজলালকে চোখ বুজে বসে থাকতে দেখে এবং সামনে তার বোতলটা দেখতে পেয়ে উল্লাসে গোব্‌রার চোখের তারা দুটো কুঞ্চিত হয়ে আসে।

বেজা?

ব্রজলাল চোখ মেলে তাকাল, গোব্‌রা! আয় বস্।

দে ভাই এক পাত্তোর! বুকটা যেন কেমন খালি লাগছে!

বস্ বস্। ব্রজলাল দিলদরিয়া ভাবে আহ্বান জানায়।

কালো অন্ধকারে সমস্ত বাড়িটা যেন অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

রতনকে সঙ্গে নিয়ে অপরিচিত রহস্যময় সেই আগন্তুক বাড়িটার মধ্যে এসে প্রবেশ করল। একটু আগেই যে গাড়িটাতে করে শশাংককে ওরা এ বাড়িতে বহন করে এনেছিল ততক্ষণে সেই গাড়িতে চেপেই অরিন্দম সরকার চলে গিয়েছে। একজন গেলেও বাড়িটার মধ্যে এখনো যে কয়জন আছে তা জানা নেই।

বেশী লোকজন না থাকাই সম্ভব। থাকলেও আগন্তুকের পকেটে লোডেড্ রিভল্‌বার আছে।

তাছাড়া সঙ্গে আছে নীলিমার একান্ত অনুগত ভৃত্য জাঠ যুবক রতন সিং। সদর দরজাটা অবশ্য খোলাই ছিল, বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করতে ওদের কোন বাধা পেতে হয়নি।

ওরা প্রথম ঘরটা অতিক্রম করে এসে ভিতরে যেখানে দাঁড়াল সেটা একটা চাতালের মত—স্থানটি স্বল্পালোকিত।

অদূরে একটা সিঁড়িপথ দেখা যাচ্ছে—বোধ হয় দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি ওটা।

সিঁড়ির সামনেই দেওয়ালের গায়ে একটা মৃদু আলোকোদ্ভাসী কালিপড়া হ্যারিকেন বাতি টিম্ টিম্ করে জ্বলছে। বাতিটা আলোর চাইতে যেন ধূমোদ্গীরণই বেশী করছে।

মৃদু আলো ও চাপ বাঁধা কালো ঝুলের মত অন্ধকার মেশামেশি হয়ে আশ-পাশের সমগ্র জায়গাটিতে অদ্ভুত একটা বিভীষিকাময় ভৌতিক পরিবেশ যেন গড়ে তুলেছে।

BanglaBook.org

মধ্যরাত্রির অন্ধকার যেন নিঃসঙ্গ একটা কবরখানার উপর থাবা বিস্তার করেছে অন্ধকারে, হিংস্র পশু যেমন থাবা বিস্তার করে শিকারের উপরে। ঘুণ-ধরা জীর্ণ দরজা-জানালার কবাটগুলির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রমধ্যে কুর কুর করে অদৃশ্য পোকাগুলি কাঠ জীর্ণ করে চলেছে—তারই একটা চাপা দীর্ঘায়িত শব্দ। পায়ের নীচে পুরু ধুলোর আস্তরণ। বদ্ধ বাতাসে তারই গন্ধ।

নিঃশব্দে এগিয়ে যান আগন্তুক, তার পশ্চাতে রতন সিং।

সেই পর পর তিনখানা ঘর, প্রত্যেকটারই দরজা হা হা করছে খোলা। পকেট হতে সরু একটা টর্চবাতি বের করে, আগন্তুক সেই টর্চের আলো ফেলে প্রত্যেকটি ঘর একবার করে দেখে নিল—সব ঘরগুলিই শূন্য।

কোথায়ও জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

সবশেষের ঘরটার কাছে এসে আগন্তুক দাঁড়াল, ঘরের দরজায় ভারী তালা লাগানো একটা।

হঠাৎ এমন সময় রাত্রির সেই মৃত্যুর মত জমাট নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে একটা উচ্চকিত হাসির শব্দ যেন অন্ধকারে প্রেতের হাসির মত ঝম্ ঝম্ করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

মদের নেশায় উপরের ঘরে ব্রজলাল, গোব্‌রা ও দীনে হাঃ হাঃ করে সবাই একসঙ্গে হাসছে।

আচম্‌কা হাসির শব্দে আগন্তুক থম্‌কে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, পরক্ষণেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাত বাড়িয়ে দরজার গায়ে লাগানো বন্ধ তালাটা স্পর্শ করলে। ধরে টেনে দেখল।

মুহূর্তে আগন্তুক বুঝতে পারে ভারী এবং মজবুত তালা।

রতন সিং? চাপা গলায় ডাকল আগন্তুক।

জি! ছায়ার মত এগিয়ে এল রতন সিং।

তুম জেরা ইধার ঠ্যায়ারো, হাম তুরন্ত্ আতা হ্যায়—

জি! রতন দাঁড়িয়ে থাকে।

আগন্তুক নিঃশব্দে সিঁড়িপথে এবারে একা-একাই দোতলায় উঠতে লাগল।

হাসির শব্দ তখনও মধ্যে মধ্যে অন্ধকার বাড়িটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে শব্দের ঝংকার তুলে ফিরছে! শব্দ লক্ষ্য করে আগন্তুক এগিয়ে চলল পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে। নীচতলার ঠিক অনুরূপ উপরের তলায়ও বারান্দা এবং পর পর চারিটি ঘর। বারান্দার দক্ষিণ দিকটা খোলা, খুব নিকটেই গঙ্গা বোধ হয়, হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।

তৃতীয় ঘরটার দরজাটা খোলা। খোলা দ্বারপথে অস্পষ্ট একটা আলোর আভাস অন্ধকার বারান্দায় এসে আত্মপ্রকাশ করেছে!

আবার একটা হাসির হুর্‌রা উঠলো। আগন্তুক দাঁড়াল দরজার অল্প দূরে।

BanglaBook.org

॥ ১৫ ॥

সেই রাত্রেই।

কলুটোলায় একটা পুরাতন বাড়ির তিনতলায় ভিতরের একটা ঘরে ছোট একটি টেবিল, তার উপরে ফোন রক্ষিত। তারই সামনে একটি টিনের চেয়ারের উপরে হেলান দিয়ে বসে বোস সাহেব। অল্প দূরে একটা চৌকি।

মুখের অর্ধেকটাতে তার পূর্বের মতই পাত্‌লা একটা মুখোশ আঁটা।

একটু আগে ফোনে সংবাদ এসেছে অরিন্দম সরকার তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে। খুব

জরুরী এবং মূল্যবান খবর আছে। টেবিলের উপরে জ্বলছে একটি মোমবাতি—যদিও ঘরে ইলেক্ট্রিক আলোর ব্যবস্থা আছে—কিন্তু ইলেকট্রিক আলো নেভানো।

মূল্যবান এবং জরুরী সংবাদ! কি এমন মূল্যবান এবং জরুরী সংবাদ অরিন্দম সরকার নিয়ে আসতে পারে!

লোকটা আজকাল যেন কেমন ঢিলে প্রকৃতির হয়ে গিয়েছে। আগেকার সেই ক্ষিপ্রতা, চাতুরী ও অকুতোভয়তা যেন অরিন্দমের মধ্যে আজকাল আর নেই। তবু তাকে দলে রেখেছে বোস সাহেব কারণ পুরাতন লোক বিশ্বাসী।

ঈষৎ ভেজানো দরজাটার ওপাশ হতে চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন এলো ঃ মাই গড্! আসতে পারি স্যার ভিতরে?

চকিতে ঘুরে বসে বোস সাহেব, কে বংশীবাবু! এসো এসো!

বংশী—অর্থাৎ বংশীধর নাগ।

দীর্ঘ ছয় ফুট লম্বা, বেশ বলিষ্ঠ গঠন একটা লোক ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল। চৌকো মুখ, প্রশস্ত কপাল, নাকটা বাঁকা সামান্য একটু একদিকে, খোঁচা খোঁচা দাড়িতে মুখ ভর্তি লোকটার একটা চোখ কানা।

তারা-হীন শূন্য অক্ষিকোটরটা যেন একটা কুৎসিত কলঙ্কর মত একটিমাত্র চোখের পাশে কেমন বিশ্রীভাবে জ্বল জ্বল করছে।

লোকটার পরনে একটা খাকী লংস ও খাকী বুস কোর্ট, বুস কোর্টের বোতামগুলো খোলা। বুকে লোম প্রচুর, পায়ে চপ্পল। মুখে যেন বিদ্রুপের একটুখানি হাসি।

মাই গড্! লোকটা ঢুকতে ঢুকতে আবার বলে, স্যারকে যেন চিন্তিত দেখাচ্ছে! কেমন কেমন একটু—

বসো বংশী—

বোস সাহেব মৃদু কণ্ঠে সাদর আহ্বান জানায়।

বংশী বোস সাহেবের নির্দেশে সামনের চৌকির উপর এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ে।

পকেট থেকে সোনার সিগারেট কেস বার করে, একটা সিগারেট নিজে নিয়ে একটা আগন্তুক বংশীর দিকে এগিয়ে দিতেই বংশী বাধা দিয়ে বলে ওঠে, মাই গড্! জানেন তো ও সব সাদা চলে না স্যার এ অধীনের, খাকী-মাকী থাকে তো তাই দিন একটা ক্ষমাঘেন্না করে।

খাকী অর্থে বিড়ি। বোস সাহেব মৃদু হাসে।

পকেট যা রেস্ত ছিল ফুরিয়ে গিয়েছে টের পাইনি। হঠাৎ নজরে পড়ল। তখন আশেপাশে তাকিয়ে দেখি শালার দোকানও খোলা নেই।

বোস সাহেব মৃদু হেসে বললে, না হে, তোমার খাকী নেই। সাদাই একটা মা হয় খেয়ে দেখ হে! 'তিন-নয়' মন্দ লাগবে না হয়ত—তা ছাড়া মুখটাও বদল হবে।

মাই গড্! ও শালার সাদা বড় নেমকহারাম। পয়সাও যায়, নেশাও হয় না। বংশী বলে।

মৃদু হেসে বোস সাহেব নিজের মুখ ধৃত সিগারেটটায় অগ্নিসংযোগ করে টান দিয়ে ধূমোদ্গীরণ করতে থাকে।

এখন অধীনকে স্মরণ করেছেন কেন বলে ফেলুন। আপনার ঐ মমির মত মুখোশ-আঁটা মুখ কেমন যেন দেখলেই গা ঘিনঘিন করে।

কেন হে? বোস সাহেব বলে।

BanglaBook.org

জানি না। কেমন যেন নসিয়েটিং মনে হয়।

বংশী—

ইয়েস্—মাই গড্! হুকুম হোক। দাস তো হুজুরে হাজির।

একটা বেওয়ারিশ লাশ পাওয়া গেছে, সেটাকে পাচার করতে হবে। একান্ত নির্বিকার ভাবে বললে বোস সাহেব।

মাই গড্! আবার বেওয়ারিশ লাশ! God promise—সত্যি বলছি স্যার, যেভাবে হরদম বেওয়ারিশ লাশ খুবলে বেড়াচ্ছেন ইদানীং, শেষ পর্যন্ত না খোদ আপনাকেই লাশ বন্‌তে হয় কোনদিন। তখনও কি অভাগাকেই নরক থেকে এত্তালা পাঠাবেন আপনার নিজের লাশটার ব্যবস্থা করতে! বলে হেসে ওঠে বংশী। তারপর একটু থেমে বলে, যাক গে মরুক গে। এখন আপাততঃ দিন তো স্যার—দিন, আপনার সেই famous একটা পুরিয়া ছাড়ুন দেখি। যা ঠাণ্ডা পড়েছে, জমিয়ে দিলে হাত-পাগুলো! হাতটা প্রসারিত করে ধরল বংশী।

পকেট থেকে একটা রূপার সুদৃশ্য কৌটা বের করে তার মধ্য থেকে হ্যাসহিসের তৈরী একটা সিগারেট বের করে এগিয়ে দিল বোস বংশীর দিকে।

সিগারেটটা নিয়ে, ওষ্ঠাধরে চেপে ধরে, পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করে সেটাতেই অগ্নি-সংযোগ করলে বংশী। সজোরে একটা টান দিয়ে ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র কটু গন্ধ সমস্ত ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে গেল।

আবার আর একটা জোর টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল বংশী।

বেড়ে কল বানিয়েছেন স্যার! মাই গড্! এক টানেই ব্রহ্মার ফাদার অ্যাণ্ড গ্রেট গ্র্যাণ্ড ফাদার পর্যন্ত টলটলায়মান হয়ে ওঠেন!

আর গোটাকয়েক সুখ-টান দিয়ে বংশী তার একচক্ষুর তীব্র দৃষ্টিটা অদূরে উপবিষ্ট বোস সাহেবের নির্লিপ্ত মুখখানার প্রতি স্থিরনিবদ্ধ করে বললে, মাই গড্! নাউ! এবারে তাহলে বলুন দেখি শুনি অফারটা কি? মানে কত বাই কত?

কত হলে চলে তোমার সেইটাই বল না?

আরে বাবা! আমাদের তো রাঘব-বোয়ালের হাঁ! দিয়ে দেখুন না, ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত গিলতে পারি!

শ' পাঁচেক পাবে।

রসিকতা করছেন স্যার! মৃদু হেসে বলে বংশী।

রসিকতা করছি!

তা ছাড়া আর কি বলি বলুন? না হয় তো বলতে হয় রাগ করে কথা বলছেন।

বেশ। তবে তোমারটাই না হয় শুনি।

একে এই যুদ্ধের বাজার, চারিদিকে ব্ল্যাক-আউট্ আর ব্ল্যাক-মার্কেট। ট্রাকে ট্রাকে মিলিটারীর আনাগোনা। হেন বাগানবাড়ি বা পোড়োবাড়ি নেই কলকাতা শহরে আর তার আশেপাশে যেখানে মিলিটারীর লোকেরা ডেরা না ফেলেছে। চারিদিক ব্ল্যাক হলে কি হবে—হাজার হাজার চোখ! হাজার দশেকের কম—

বল কি বংশী! দ-শ-হা-জা-র!

মাই গড্! আপনাদের মত পূণ্যাত্মাদের কাছে তো ও নগণ্য। খোলামকুচি স্যার।

নন্‌সেন্স্!

বংশী নাগের সেন্স্ চিরকালই একটু ভোঁতা জানেন তো স্যার!

BanglaBook.org

শোন বংশী, ওই পুরো হাজারই পাবে।

গুড্ নাইট্ স্যার্! তবে চলি। বংশী ঘর হতে বের হয়ে যেতে উদ্যত হলো।

বংশী, শোন শোন—

কয়েক পা গিয়ে থামল বংশী। বলে, চলুন—

আর শ' দুই মত পাবে।

না স্যার্। বড্ড ব্ল্যাক চারিদিকে। ভদ্রলোকের এক কথা, হাজারখানেক কমাতে পারি। নয় হাজারের এক পয়সাও কম হবে না।

কম হবে না?

না। বংশী আবার যেতে উদ্যত হলো।

শোন বংশী, একটু দাঁড়াও—

বলুন স্যার্—

হাজার দুই দেবো।

না স্যার্, ফিফ্‌টি ফিফ্‌টিতে কিছুই থাকে না শেয়ারে। তাছাড়া টোয়েন্টি ফাইভ তো কমিশনই হয়েছে লাল ফৌজের।

বাইরে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। বোধ হয় অরিন্দম সরকার এসে গেল। সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে বোস সাহেব।

॥ ১৬ ॥

তাড়াতাড়ি বংশী নাগের দিকে তাকিয়ে বলে, বংশী, পাশের ঘরে একটু অপেক্ষা কর। যে আসছে তার সঙ্গে কথাটা শেষ করে নিই।

মাই গড্! বেশ।

নিঃশব্দে বংশী ঘর হতে বের হয়ে গেল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। চট্ করে অন্ধকার বারান্দাটা অতিক্রম করে বংশী পাশের ঘরের ভেজানো দরজাটা ঠেলে ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়ল।

অন্ধকার ঘরটা। কিন্তু এ বাড়ি বংশীর যথেষ্ট পরিচিত, এর প্রতিটি ঘর দরজা গলিঘুঁজি ওর নখদর্পণে। হাত বাড়িয়ে দেওয়ালের গায়ে সুইচটা টিপে দিল বংশী। অত্যুজ্জ্বল আলো কিন্তু ঠুলি দেওয়া বলে চাপা আলোয় ঘরটা ভরে গেল।

আলোর ঠিক নীচে একটা চেয়ার টেনে এনে বংশী চেয়ারটার উপরে বেশ আরাম করে বসল। গায়ের মলিন লংকোটটার ঝুল পকেটে হাত গলিয়ে টেনে বার করলে পেঙ্গুইন সিরিজের একটা ডিটেক্‌টিভ্ নভেল।

বইয়ের মাঝামাঝি একটা নির্দিষ্ট চিহ্নিত পাতা খুলে বংশী পুস্তক পাঠে মন সন্নিবেশ করলে।

It was dark! The silent footsteps are still following him.

একচক্ষুর তীব্র দৃষ্টি দিয়ে বইয়ের ছোট ছোট হরফ্‌গুলো যেন গিলতে থাকে বংশী। নিমেষে ও যেন অন্য এক রাজ্যে চলে গিয়েছে।

লণ্ডন শহর।

অন্ধকার কুয়াশা-মলিন এক মধ্যরাত্রির নিঃসঙ্গ মূহূর্ত। ম্যাকি তার কালো লংকোটের পকেটে হাত দুটো প্রবেশ করিয়ে হেঁটে চলেছে একা একা। কোথায়?

BanglaBook.org

এত রাত্রে একটি হোটেলও তো খোলা নেই। কিন্তু সারা—সেই হোটেলের পরিচারিকা—সে নিশ্চয়ই এখনও ঘুমোয়নি। ব্যবহৃত প্লেটগুলো ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে হয়ত রাখছে পাশের ঘরে।

চম্‌কে ওঠে হঠাৎ মিস্ সারা। পশ্চাতে কার লঘু পায়ের চাপা শব্দ ও যেন শুনতে পায়।

উত্তেজনায় বংশীর গায়ের লোমগুলো যেন খাড়া হয়ে ওঠে।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা অর্ধভুক্ত চিনাবাদামের চাকতি বের করে সেটা মুখে পুরে দিয়ে চিবুতে শুরু করে বংশী।

চিবুতে থাকে আর গোগ্রাসে বইয়ের অক্ষরগুলো যেন একটিমাত্র চক্ষুর দৃষ্টি দিয়ে গিলতে থাকে।

বংশী নাগ—আজ আর ওকে চিনবারও উপায় নেই।

আলোকোজ্জ্বল বড় রাস্তা ছেড়ে ও আজ অন্ধকার চোরা গলিপথে এসে দাঁড়িয়েছে।

কে বলবে আজ ওকে দেখলে ঐ বংশীই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র কোন একসময় ছিল। ফিজিকস্ ও ম্যাথেমেটিক্স-এ ডাবল এম. এস্-সি!

এক মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি, সপ্তাহে দু'দিনের বেশী খেউরী হয় না। উপরের ঠোঁটটা একটু বেশীমাত্রায় পুরু ও কালো নিকোটিনের প্রভাবে নীচের ঠোঁটটা উপরের ঠোঁটের আন্দাজে যেন একটু ছোটই। উপরের পাটির দাঁত দিয়ে সর্বদা নীচের ঠোঁটটা কামড়ে চেপে রাখা বংশীর একটা বদ অভ্যাস—যেমন কথায় কথায় 'মাই গড্' বলা একটা মুদ্রাদোষ।

বংশীর বাপ ছিলেন সাধারণ মধ্যবিত্ত একজন গৃহস্থ, সাধারণ একজন স্কুল-শিক্ষক।

নিজের মেধা ও অধ্যবসায়ের জোরে বংশী টপাটপ পরীক্ষার চৌকাঠগুলো ডিঙিয়ে গিয়েছিল বরাবর। নিজের শক্তির উপরে অসাধারণ বিশ্বাস ও গর্ব ছিল ওর এবং নিজের দৈহিক কুশ্রিতা সম্পর্কে ছিল চিরদিন ওর অজ্ঞতা—অর্থাৎ নিজের চেহারাটা যে সত্যিই অন্যের চক্ষে অত্যন্ত কুশ্রী বলে বোধ হতে পারে এবং সেটাই তার জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় অভিশাপ হতে পারে, এ ধারণা ওর কোনদিন হয়নি—বোধ করি স্বপ্নেও ভাবেনি।

তাই ঠিক ঐ দিক হতেই জীবনে যেদিন এলো নিষ্ঠুর ও চরম আঘাত, ও যেন নিমেষে বোবা হয়ে গেল সেদিন। মুহূর্তে যেন পাথর হয়ে গেল।

দুটো বস্তু ছিল বংশীর কাছে সবচাইতে প্রিয় ঃ পড়ার বই ও ডিটেক্‌টিভ্ গল্পের বই।

বেশীর ভাগ সময়ই ও কলেজে ও পড়াশুনার ব্যাপার নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকতো। অবসর সময়টুকু কাটত যত রাজ্যের ডিটেক্‌টিভ গল্পের বই পড়ে।

আশ্চর্য মানুষ! আরো আশ্চর্য তার মনের মধ্যকার ঘুমন্ত বা সুপ্ত প্রবৃত্তিটা ছিল। এবং সেই অর্ধঘুমন্ত প্রবৃত্তিটা এক এক সময় মানুষের শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার সব কিছুকেই যে কি ভাবে কোথা দিয়ে অতিক্রম করে যায় তা সে নিজেও টের পায় না।

একান্ত নিশ্চিন্ত ভাবেই সে সুপ্ত প্রবৃত্তির অঙ্গুলিসঞ্চালনে এগিয়ে চলে তখন অন্ধের মতই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বিন্দুমাত্রও বালাই না রেখে। কিন্তু ঐ যে সুপ্ত বা ঘুমন্ত প্রবৃত্তিটা সেটার মূল যে কোথায়, কোথা হতে কেমন করে রস সংগ্রহ করে তাও মানুষের অজ্ঞাত।

বংশীর ডিটেক্‌টিভ্ গল্পের বইগুলোর মধ্যে কাহিনীর যে বস্তুটি তার মনকে আকর্ষিত ও বিমুগ্ধ করতো সেটা গল্পের নায়ক—ভিলেন চরিত্রটিই।

BanglaBook.org

মুগ্ধ বিস্ময়ে ও পাতার পর পাতা উল্টে যেত একটা শয়তান বা জঘন্য চরিত্রের লোক কি ভাবে তার শয়তানীর জাল বিস্তার করে চলে সেটা পড়বার নেশায়।

ঘৃণ্যতম ও নৃশংসতম কাজও অনায়াসে অকুণ্ঠচিত্তে সাধন করে যাচ্ছে একটা লোক। মনের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব বিস্ময় এনে দিত যেন বংশীর। নিজেকে ওই চরিত্রের মধ্যে কাল্পনিক রক্তমাংসের শরীরে দাঁড় করিয়ে বংশী রোমাঞ্চিত বোধ করত। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা একটা নেশার মতই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বংশীর।

অবসর মুহূর্ত ছাড়াও অনেক সময় পাঠ্যপুস্তক একপাশে ঠেলে রেখে ডিটেক্‌টিভ্ বই নিয়ে তার বীভৎস রসের মধ্যে নিজেকে ও ডুবিয়ে রাখত।

ভিলেনের চরিত্রে এতটুকু দুর্বলতা বা ত্রুটি দেখলে মনে মনে বংশী যেন রুদ্ধ বিষধর সর্পের মতোই গর্জাত। আকস্মিক ভাবে কোন ভিলেনের চরিত্রের মৃত্যু হলে বা শেষ পর্যন্ত চরম দণ্ড হলে, নিঃশব্দে একটিমাত্র চক্ষুর কোল বেয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ত বংশীর। এবং ডিটেকটিভ বা পুলিসের পরাজয়ে প্রাণ খুলে হাসতো পৈশাচিক আনন্দানুভূতিতে।

বংশীর পিতৃদেব ভদ্রলোকটি একান্ত গোবেচারা নিরীহ প্রকৃতির একজন স্কুল-শিক্ষক ছিলেন।

সংসারে ঐ একটিমাত্র ছেলে। ছেলের জন্মের মাস আষ্টেক পরেই কলেরা হয়ে বংশীর মা বারো ঘণ্টার মধ্যেই মারা গিয়েছিলেন।

বংশী মানুষ হয়েছিল তাঁর এক বিধবা পিসির সেবা ও যত্নে। পিসিও বংশী যেবারে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে সেবারে মারা যান।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করে বংশী কলকাতায় পড়তে এলো।

ক্বশ্চিৎ কালে-ভদ্রে ছুটিছাটায় দু-চার-দশ দিনের জন্য বংশী বাপের কাছে আসত। পিতা ও পুত্রের মধ্যে পত্র-বিনিময়ের ব্যাপারটাও তেমন ছিল না। তবে নিয়মিত মাসের দশ তারিখে টাকাটি ঠিকই আসত।

এমনি ভাবেই দীর্ঘকাল চলছিল। এমন সময় দু-দুটো বিষয়ে এম.-এস-সি পাস করবার পর বংশী তৃতীয় বিষয়ে আবার পরীক্ষা দেবার জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছে, আচম্‌কা তারযোগে তার পিতার মৃত্যু সংবাদ এলো। এবং বাড়িতে গিয়ে জানলে শেষ কয়েক বছর কর্জ করে বাড়িঘর বন্ধক রেখে বাপ তার কলকাতার খরচ চালাচ্ছিলেন। এবং সে সম্পর্কে কোন কথা তাকে গোচরীভূত কোনদিনও করেননি। খরচ তো বন্ধ হলোই—আকণ্ঠ দেনার বোঝাও মাথায় এসে চাপল সেই সঙ্গে বংশীর।

বংশী কলকাতায় ফিরে এলো। সেখানেও মেসের টাকা বাকী। বংশী চাকরির চেষ্টায় বের হলো। কিন্তু কোথাও কোন সুবিধা করতে পারলে না।

যেখানে যায় সেখানেই এক জবাব ঃ নো ভেকেন্সি। তাছাড়া যে সব অফিসে তাকে ডেকে পাঠায় শেষ পর্যন্ত সেই সব অফিসে উপস্থিত হলেই বংশীর চেহারার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গেই কর্তাদের চোখেমুখে একটা অসহ্য বিরক্তির ছায়া যেন ঘনিয়ে উঠত।

তাড়াতাড়ি বলে উঠতো, না না মশাই, এখানে হবে না। অন্যত্র চেষ্টা দেখুন।

কিন্তু তখনো বুঝতে পারেনি বংশী কেন ওর মুখের দিকে তাকানো মাত্রই লোকের চোখমুখে বিরক্তি প্রকাশ পায়। বুঝতে পারল হঠাৎ সেইদিন যেদিন একটা অফিস থেকে বের হয়ে আসতে আসতে ওর কানে এলো অফিসের বড়বাবু তার পার্শ্বচরকে বলছেন, লোকটাকে দেখতে কি

BanglaBook.org

horrible কুৎসিত, দেখলে মহী! গল্পের সেই স্যাটানের মত। চেহারার মধ্যে ওর যেন শনির ছায়া আছে। একটা চোখ কি ভীষণ দেখতে!

থম্‌কে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে সেদিন বংশী।

একটা যেন প্রচণ্ড চাবুকের আঘাত সপাং করে এসে মুখের উপরে পড়েছিল সেদিন।

একটা চোখ ওর নেই সত্যি—এবং সেটা ছোট বেলায় একটা দৈবদুর্ঘটনায় খোয়া যায়। কিন্তু সেটাই যে একদিন এক নিষ্ঠুর মর্মান্তিক অভিশাপ হয়ে তার সমস্ত জীবনটার পথরোধ করে দাঁড়াবে এ যেন কল্পনার অতীত ছিল।

তিনদিন একটি দানাও পেটে পড়েনি। অনাহারে ক্ষুধার জ্বালায় আঁচলা ভরে ভরে কেবল রাস্তার কলের জল পান করেছে। মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। একটা অবসন্ন ক্লান্তিতে শরীরের প্রতিটি মাংসপেশী যেন জমাট বেঁধে আসছে।

কোনমতে টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বংশী রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

ইচ্ছা ছিল আরো দু-তিন জায়গায় যাবার কিন্তু নিজের উপরে এসে গেছে একটা ঘৃণা। শ্লথ অবসন্ন ক্লান্ত দীর্ঘ মন্থর পদবিক্ষেপে বংশী এগুতে লাগলো।

শীতের সূর্য ইতিমধ্যেই আকাশের পশ্চিম প্রান্তে হেলে পড়েছে।

ইডেন গার্ডেনের দিকে চলতে লাগলো বংশী।

শীতের রাত!

একটা বেঞ্চের উপরে টান টান হয়ে শুয়ে আছে বংশী। শীতও কয়দিন ধরে যেন প্রচণ্ডভাবে পড়েছে। হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলছে। গায়ের জামায় ও আলোয়ানে শীত মানায় না। তিনদিন ক্ষৌরকর্ম না হওয়ায় খোঁচা খোঁচা দাড়িতে মুখটা কর্কশ হয়ে উঠেছে। তীব্র ক্ষুধার পাচকরসে পাকস্থলীটা যেন হজম হয়ে যাবার যোগাড়।

শেষ পর্যন্ত এইভাবে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে নাকি! বুদ্ধি, শক্তি, বিদ্যা সব—সব কিছুই তার আছে, তথাপি সে না খেতে পেয়ে মরবে!

একটু একটু করে নিরুপায় একটা মানুষ এমনি করে মরে যাবে!

না—বাঁচতে তাকে হবেই এবং বেশ সুস্থ বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকতে হবে যেমন করে যেভাবেই হোক। একটা জোরালো মোটরের হেড্ লাইটের আলো বংশীর সর্বাঙ্গে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

বংশী বিরক্তভাবে উঠে বসলো।

মোটরটা এসে ওর খুব কাছেই থেমে গেল।

বংশী বেঞ্চের উপর থেকে উঠে দাঁড়াল।

এই—কে রে ওখানে?

এ কি! এ যে চেনা গলা! প্রশ্নকারী ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে।

কে? মাই গড্! কে সুচিৎ দাশ না! If I am not wrong–

আরে! বংশী নাগ?

হ্যাঁ।

আশ্চর্য! একটা যুগ পরে দেখা, কিন্তু এ কি তোর চেহারা রে! চেনাই যায় না!

একটা মৃদু চুড়ির রিনিঝিনি মিষ্টি শব্দ শোনা গেল সুচিতের পাশে—এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা মৃদু মিষ্টি সুবাসের ঝাপটা নাকে এসে লাগল।

BanglaBook.org

সঙ্গে কে তোমার সুচিৎ? প্রশ্ন করলে বংশী।

আমার স্ত্রী নমু।

ডাঃ সুচিৎ দাস তার স্ত্রী নমিতাকে নিয়ে গার্ডেনে বেড়াতে এসেছিল। যাহোক পরিচয় হবার পর সুচিৎ একপ্রকার জোর করেই তার গাড়িতে তুলে নিয়ে বকুলবাগানে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল বংশীকে।

কিন্তু সুচিতের চোখের দৃষ্টি বিশেষ করে তার স্ত্রী নমিতার বিস্মিত বোবা দৃষ্টিটা বংশী যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারল না। সেই রাত্রেই ওদের বাড়ি ছেড়ে পালাল।

অন্ধকার রাত্রি।

শীতের ঠাণ্ডা যেন চারিদিকে চাপ বেঁধে বসেছে। হন্ হন্ করে এগিয়ে চলেছে বংশী নির্জন পথ ধরে। হঠাৎ একটা গাড়ি এসে হুড়মুড় করে ঘাড়ের উপরে পড়ে আর কি। গাড়িটা ব্রেক কষে দাঁড়ালেও সামান্য আঘাত লেগেছিল বংশীর বাঁ পায়ে।

বাঘের মত দৃঢ় মুষ্টিতে গাড়ির দরজার হাতলটা টেনে ধরে বংশী গর্জন করে ওঠে তিক্ত কর্কশ কণ্ঠে, মাই গড্! শালা চার চাকার গাড়িতে চেপে একেবারে দুনিয়াসুদ্ধ সড়ক বানিয়ে নিয়েছো না?

গাড়িতে একটিমাত্র আরোহী। এবং সে নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করছিল।

আরোহী আর কেউ নয়—স্বয়ং বোস সাহেব। বোস সাহেব চম্‌কে বংশীর দেহ ও মুখের দিকে তাকাল।

অন্যায় হয়ে গিয়েছে।

চাপা দিয়ে এখন অন্যায় হয়ে গিয়েছে! এত বড় রাস্তাটা, জনশূন্য—ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে তো?

আছে। বোস সাহেব হেসে ফেলে বংশীর কথায় হঠাৎ।

আবার হাসা হচ্ছে। লজ্জা করে না হাসতে! বংশী আবার গর্জন করে ওঠে।

লজ্জা! না। ও বালাই বহুদিন ত্যাগ করেছি। কিন্তু আপনার নামটি জানতে পারি কি?

নাম! কেন, নাম দিয়ে কি হবে? থমকে যায় হঠাৎ বংশী যেন।

বেশ। নাম বলতে আপত্তি থাকে, জানতে পারি কি, কি করা হয়?

মাই গড্! প্রফেশন, ইউ মিন? বেকার, satisfied ?

বেকার! তা চাকরির প্রয়োজন আছে তো নিশ্চয়ই—

No, thanks—

এই যে বললেন বেকার—

বলেছিই তো, তাতে হয়েছে কি? সত্য কথাই বলেছি।

বেশ তো, চাকরি না করেন ব্যবসা—

মাই গড্। ব্যবসা! তামাসা শুরু করলেন নাকি মধ্যরাত্রে এই নির্জন রাস্তায় গাড়ি চাপা দিয়ে?

দিই নি—দেবো দেবো হয়েছিল আর কি। আসুন, আমার গাড়িতে উঠে বসুন।

উঠে বসবো মানে? মতলবখানা কি, জানতে পারি কি?

যাই থাক না কেন, ভয়টাই বা কি? আর যাই করি, এমন কিছু মূল্যবান একটি চীজ নন আপনি যে গুম করবো!

BanglaBook.org

মাই গড্! তা যা বলেছেন। চলুন, ন্যাংটোর আবার বাটপারের ভয় কি?

বইটা ইতিমধ্যে অনেকক্ষণ পড়া শেষ হয়ে গিয়েছিল; বংশী বসে বসে তার অতীত জীবনের কথাই ভাবছিল, হঠাৎ ওর খেয়াল হলো, তাই তো, অনেকক্ষণ ধরে এই ঘরে ও বসে আছে, বোস সাহেব ডাকছে না—ব্যাপারটা কি!

বোস সাহেব ওকে অপেক্ষা করতে বলেছিল এই ঘরে। পাশের ঘরেও তো কোন সাড়াশব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। বংশী দাঁত কড়মড় করে একবার বললে, শালা—মাই গড্!

উঠে পড়ল বংশী হাতের বইখানা পকেটে রেখে।

পাশের ঘরের দরজাটা ভেজানো, দরজার ফাঁক দিয়ে ঈষৎ আলোর আভাস। উঁকি দিয়ে দেখলে একা বোস সাহেব বসে কি একটা খাতায় কি যেন একমনে ঝুঁকে পড়ে পেন দিয়ে লিখে চলেছে।

মাই গড্! আসতে পারি?

কে বংশী? এসো—এসো।

বোস সাহেবের আহ্বানে বংশী ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল।

॥ ১৭ ॥

মুহূর্তে মস্তিষ্ক স্থির করে আগন্তুক যে ঘরের মধ্য হতে হাসির হররা উঠছিল তার দরজাটার একপাশে গিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

খুব সন্তর্পণে দরজার একপাশ থেকে উঁকি দিয়ে দেখলে ঘরের মধ্যে তিনজন লোক। ওদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝতে কষ্ট হয় না, সুরার প্রভাবে ইতিমধ্যে বেশ রঙিন স্বপ্নের আমেজ লেগেছে ওদের দেহ ও মনে। সকলেই দরজার দিকে পিছন ফিরে বসেছে। এই সুযোগ!

নিঃশব্দে আরো একটু এগিয়ে গিয়ে সন্তর্পণে দরজার কবাট দু'টো টেনে বাইরে থেকে শিকলটা তুলে দিল আগন্তুক।

ঘরের মধ্য হতে আবার একটা হাসির হররা উঠলো। ওরা নিজেদের নিয়েই মশগুল।

দ্রুতপদে আগন্তুক নীচে যেখানে বন্ধ দরজাটার সামনে রতন নিঃশব্দে একাকী অন্ধকারে ছায়ার মত তখনো দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে এসে দাঁড়াল।

রতন!

আগন্তুকের চাপা কণ্ঠের সতর্ক ডাক শুনে রতন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়।

জি!

ইয়ে কামরা কা অন্দরমে একঠো বাবু হ্যায়— কোই কিসি তারাসে উনকো ইহাসে বাহার করনে হোগা। তারপর একটু থেমে বললে, লেকেন দারোয়াজামে তালা! মালুম হোতা হ্যায় বহুৎ মজবুত ইয়ে তালা!

রতন এগিয়ে এসে হাত দিয়ে তালাটা একবার পরীক্ষা করে বললে, জি হাঁ!

বাহার মে যায়কে দেখো তো কোই কিসি তারাসে উস্ কামরামে ঘুসনে সেকে তো! পরক্ষণেই আবার কি ভেবে বললে, আচ্ছা তুম্ ইধারই ঠ্যায়রো ম্যায় খুদই দেখ্তা হুঁ।

BanglaBook.org

আগন্তুকই রতনকে দরজার সামনে প্রহরায় নিযুক্ত করে বাড়ির বাইরে চলে গেল।

শশাংকর জ্ঞান ফিরে এসেছে তখন।

ঘরের মধ্যে একটা মিট্‌মিটে বাতি জ্বলছে। প্রথমটায় চোখ মেলে ও কিছুই বুঝতে পারে না।

আবছা ম্লান আলোয় চারিদিকে ও একবার অস্পষ্ট দৃষ্টিটা বুলিয়ে নেয়। চিন্তাশক্তি ক্লান্ত অবসন্ন। নড়াচড়া করতেই ও বুঝলে খাটের সঙ্গে ওর দেহটা বেশ মজবুত করেই বাঁধা।

ঘোলাটে চিন্তাশক্তির উপরে একটু একটু করে যেন আলোকসম্পাত হয়, মনে পড়ে ধীরে ধীরে সবই।

দিগেন সান্যালের ওখান থেকে আমন্ত্রণ রক্ষা করে গৃহে ফিরছিল, অ্যাভিনুর কাছে এসে অতর্কিতে কোথা হতে গুণ্ডা গুণ্ডা বলে ছুটে এসে ওর সামনে উপস্থিত। তারপরই সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। মনে পড়লো, দিগেন সান্যাল বলেছিল তার গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দেবে। যদি তখন দিগেন সান্যালের পরামর্শ মত কাজ করতো!

চব্বিশ ঘণ্টাও পার হয়নি—আবার শত্রুকবলে!

হঠাৎ কানে এলো চাপা কণ্ঠে কার সতর্ক আহ্বান, শশাংকবাবু! শশাংকবাবু!

বিস্মিত শশাংক শোওয়া অবস্থাতেই ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলো।

কে! কে ডাকে!

আবার ডাক শোনা যায়, শশাংকবাবু! যদি জ্ঞান হয়ে থাকে তো জবাব দিন। ভয় নেই, আমি আপনার শত্রুপক্ষ নই।

কে? অনুচ্চ স্বরে জবাব দেয় শশাংক এবারে।

আমি আপনার ঘরের বন্ধ জানলাটার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। আপনি কি এই জানলাটা খুলে দিতে পারেন?

না। আমার ওঠবার উপায় নেই। বেটারা আমাকে খাটের সঙ্গে বেঁধে রেখে গিয়েছে!

ভয় নেই। ব্যস্ত হবেন না। আমরা আপনাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করছি, চুপচাপ থাকুন।

আগন্তুকের কথাটা শেষ হলো না।

দুরে গাড়ির হেড্‌লাইট্ একটা দেখা গেল। দ্রুতপদে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে দরজার সামনে দণ্ডায়মান রতনকে আগন্তুক বললে, রতন, শিগ্‌গির এখান হ'তে চলে এসো, কারা যেন গাড়ি করে এদিকে এলো মনে হচ্ছে।

দু'জনে এসে অন্ধকারে সদর দরজাটার আড়ালে আত্মগোপন করে দাঁড়াল।

গাড়ি ততক্ষণে একেবারে দরজার সামনে এসে গেছে, সামনে দিয়ে আপাততঃ আর পালাবারও সময় নেই।

গাড়ি এসে থামল—ইঞ্জিনও গাড়ির বন্ধ হলো। নামলো গাড়ি থেকে একা অরিন্দম সরকার। রতন সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারে অরিন্দমকে এবং বলে ওঠে, ইয়ে কেয়া তাজ্জব কি বাত্—দিদিমণিকা—

পার্শ্বে দণ্ডায়মান রতনের হাতে ঈষৎ চাপ দিয়ে চুপ্ চুপ্ বলে আগন্তুক নিঃশব্দ সংকেত জানাতেই মুহূর্তে রতনের সংকেতটা বুঝে উঠতে কষ্ট হয় না।

রতন অতঃপর আর সাড়াশব্দ করে না। দু'জনে নিঃশব্দে দরজার আড়ালে পূর্ববৎ আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে থাকে।

BanglaBook.org

অরিন্দম নিশ্চিন্তে এগিয়ে আসছে, গায়ের লংকোটটার সাইড পকেটে দুটো হাত সেঁধিয়ে।

হঠাৎ একটা হাসির উচ্ছ্বাস আবার উপরের ঘর হতে ভেসে এলো।

অরিন্দম চলতে চলতে একবার থম্‌কে দাঁড়াল। অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বললে, শালা!

একটু থেমে মনে মনে কি ভেবে আবার অরিন্দম অগ্রসর হলো।

ঠিক ভিতরের বারান্দায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকারে অতর্কিতে দু'পাশ হতে ওর উপরে দু'জনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রতন ধরলে লোহার মত বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে অরিন্দমকে চেপে। আগন্তুক অরিন্দমের মুখে গুঁজে দিল একটা রুমাল।

অর্ধস্ফুট একটা চিৎকার অরিন্দমের রুমাল-চাপা মুখ বিবরে আটকে গিয়ে শব্দ তুলল একটা গর-র-র্-মাত্র।

পকেট থেকে একটা সিল্ক কর্ড বের করে চকিতে অরিন্দমকে বেঁধে ফেললে ওরা, মুখটাও রুমালটা দিয়ে দিল শক্ত করে চেপে বেঁধে।

অতর্কিত আক্রমণে অরিন্দম সরকার সত্যিই প্রথমটায় যেন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল, তারপর ব্যাপারটা যখন বুঝতে পারলে, বিশেষ কোন সুবিধাই করতে পারলে না, তার কারণ আক্রমণকারীদের মিলিত শক্তির কাছে তার একক শক্তি এবং তার প্রয়োগের চেষ্টাও যে ব্যর্থ হবে তা বুঝতে পেরেই অরিন্দম নিজেকে এলিয়ে দিয়েছিল।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অরিন্দম সরকারের। এক্ষেত্রে নীরবে আত্মসমর্পণ করাটাই যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে তা জেনেই সে মুক্তির কোন চেষ্টামাত্রও করলে না। অন্ধকারেও দুই চক্ষু মেলে অরিন্দম দেখবার ও চিনবার চেষ্টা করতে লাগল আক্রমণকারীদের। কে তারা!

ক্ষীণ চাঁদ আবার আকাশের পশ্চিম প্রান্তে তখন হেলে পড়েছে।

অস্পষ্ট আলোয় অরিন্দম দেখলে একজনের মুখে মুখোশ আঁটা—দ্বিতীয় জনের মুখে যদিও মুখোশ নেই, কিন্তু তাকে চিনতে তার কষ্ট হলো না। এবং লোকটাকে চিনবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন কি এক অজ্ঞাত আশংকায় অরিন্দমের বুকের ভিতরটা হিম হয়ে যায়। সর্বনাশ! রতন! তাড়াতাড়ি অরিন্দম মুখটা নীচু করে।

দেখো রতন, ইতিমধ্যে আগন্তুক বলে, পাকিটসে কুঞ্জিঠো ছিন লেও!

আগন্তুকের নির্দেশে রতন জামাকাপড় হাতড়ে সহজেই অরিন্দম সরকারের বুকপকেট থেকে চাবিটা বের করে নিল।

আগন্তুকের দিকে হাতটা প্রসারিত করে দিল নিঃশব্দে।

হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অরিন্দমকে সেইখানেই দেওয়াল ঘেঁষে বসিয়ে দিয়ে আগন্তুক রতনকে তাঁর প্রহরায় রেখে দ্রুত যে ঘরে শশাংক বন্দী হয়ে আছে সেই ঘরের বদ্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

হাতের চাবিটা দিয়ে বন্ধ তালাটা খুলে ফেললে।

শশাংক! ঘরের মধ্যে ঢুকে ডাকে।

শশাংক তখন অসহায়ের মত খাটিয়ার উপরে হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই ঝিম মেরে পড়ে অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আবোল-তাবোল অনেক কথাই চিন্তা করছিল।

আগন্তুকের ডাকে চম্‌কে ওঠে, কে?

চুপ! আস্তে—আমি!

আপনি?

BanglaBook.org

আগন্তুক শশাংকর শয্যার পাশে এসে পকেট থেকে একটা ধারালো ছুরি বের করে চট্‌পট শশাংকর হাত পায়ের বাঁধনগুলো কেটে দিতে শুরু করে।

দেখ শশাংক, এখনও তোমাকে আমি আসল পরিচয়টা দিতে পারছি না। তা তুমি আমাকে তোমার বন্ধু বলেই জেনো। কিন্তু তোমাকে বার বার সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও এমন বোকামি করে এদের খপ্পরে এসে আবার পড়লে কেন!

বাঁধন কাটা হয়ে আলগা হতেই শশাংক উঠে বসে।

দেখ, এখন আর চিন্তার সময় নেই। তুমি এই বাড়ি থেকে বের হয়ে সোজা বাগান পার হয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়বে। রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে গেলেই একটা ওভারব্রীজ আছে, তারই একপাশে কতকগুলো ঝোপের আড়ালে নীলিমা গাড়ি নিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে দেখবে।

নীলিমা! বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে শশাংক আগন্তুকের মুখের দিকে তাকায়।

হ্যাঁ, নীলিমা। আর ভবিষ্যতে আমার মত তাকেও অর্থাৎ নীলিমাকেও তোমার বন্ধু বলেই জানবে।

কিন্তু—

Don't worry! যা বলছি তাই শোন। সময় খুব অল্প। নীলিমাকে বলবে সে যেন তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ২১নং নারকেলডাঙ্গা মেন রোডে যে গ্যারেজটা আছে, সেখানে গাড়িটা রেখে দিয়ে বাড়ি চলে যায়। গ্যারেজের চাবি গাড়ির মধ্যেই দরজার সাইড্ পকেটে আছে। হ্যাঁ, আর বলবে তাকে, রতনের জন্য চিন্তা নেই।

যন্ত্রচালিতের মতই যেন শশাংকর কণ্ঠ হতে বের হয়ে এলো একটি কথা, কিন্তু আপনি?

আমার জন্য ভাবতে হবে না। তোমাকে যা বলছি তাই কর।

শশাংক তার বন্ধুর নির্দেশপালনে ঘর ত্যাগ করে যেতে উদ্যত হতেই, সে আবার বলে ওঠে, হ্যাঁ শোন, কাল ভোরেই সুব্রতবাবুর সঙ্গে দেখা করে তাকে সব কথা খুলে বলবে, যাও!

শশাংক ঘর থেকে বের হয়ে এল।

॥ ১৮ ॥

অন্ধকারে ওভারব্রীজের নীচে মনসা কাঁটার ঝোপটার ধারে আগন্তুকের নির্দেশ মত গাড়িটা ড্রাইভ করে এনে অপেক্ষা করছিল নীলিমা।

সত্যই নীলিমা ঘটনার দ্রুত আকস্মিকতায় প্রথমটায় যেন বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। তার মত চতুর ও প্রখর বুদ্ধিশালিনী মেয়েও যেন বর্তমান পরিস্থিতিতে কেমন বোবা হয়ে গিয়েছিল।

বিশেষ কোন তর্কবিতর্ক না করে সোজা অপরিচিত আগন্তুকের নির্দেশমত এখানে চলে এসে, এলোমেলো অনেক চিন্তাই তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল কাজটা ভাল হলো কিনা তাই বা কে জানে!

এক কথায় অপরিচিত ঐ ব্যক্তির নির্দেশে শশাংক সম্পর্কে পরম নিশ্চিন্তভাবে, দুর্যোগের একমাত্র সাথী রতনকে পর্যন্ত ছেড়ে চলে আসাটা তার হঠকারিতাই হলো কিনা কে জানে!

কিন্তু আগন্তুকের কণ্ঠস্বরের মধ্যে যে নিঃসংশয়তা ফুটে উঠেছিল, তাকে সে অবহেলা করতে পারেনি। এক এক সময় নির্দেশ এমন ভঙ্গীতে উচ্চারিত হয় যে তাকে মাথা নত করে গ্রহণ না করা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথই বুঝি থাকে না।

BanglaBook.org

কিন্তু লোকটি কে? অতর্কিতে অন্ধকারে তাদের পশ্চাৎ দিক হতে এসে মুহূর্তে সমস্ত প্ল্যানটা উল্টেপাল্টে দিল!

প্ল্যান! কি প্ল্যানই বা তার ছিল! সে সামান্য একজন মেয়েমানুষ বই তো নয়, একমাত্র রতনের সাহায্যে শশাংককে যে উদ্ধারই করা যেত তারও তো কোন স্থিরতা নেই। তাছাড়া উনি বোধ হয় ঠিকই বলেছিলেন—এভাবে হঠাৎ শত্রুর ডেরায় আসা মেয়েমানুষ হয়ে তার পক্ষে খুব বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি।

আচ্ছা আশ্চর্য, হঠাৎ শশাংকর জন্যই বা কেন সে এতখানি ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

জানা নেই শোনা নেই সম্পূর্ণ অচেনা এক যুবক। কে শশাংক তার—কেউ তো নয়!

গায়ে পড়ে এভাবে উপকার করতে যাওয়া, সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে, না—যে জন্য সে শশাংকর বিপদে এসে মেয়েমানুষ হয়েও মাথা গলিয়েছে তা শশাংকর জন্য আদপেই নয়। কারণটা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

কিন্তু এখন! আগে না-হয় তাই ছিল, এখন! অবচেতন মনের মধ্য হতে ক্ষীণ কণ্ঠ যেন একটা শোনা যায়, নীলিমা তুমি মিথ্যা কথা বলছো!

মিথ্যা কথা কখনো না। সক্রিয় সজাগ মন প্রতিবাদ করে ওঠে তীব্র কণ্ঠে।

মিথ্যা কথা বলছি কে বললে?

মিথ্যা কথা! আমি বলছি।

কিন্তু সত্যি শশাংকবাবু লোকটি যাকে বলে ইংরাজীতে একেবারে সিম্‌পিলটোন!

অন্ধকারে ঝোপটার মধ্যে কতকগুলো জোনাকি পোকা আলোর বাতি ক্ষণে ক্ষণে জ্বালাচ্ছে আবার নিবিয়ে দিচ্ছে। চারিদিকে রাত্রির অন্ধকার যেন ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। শ্রান্ত ধরিত্রী দুপুররাতে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। মাথার উপরে রাত্রির আকাশের যতটুকু চোখে পড়ে—কেবল তারা আর তারা, চাঁদ অনেকক্ষণ ডুবে গিয়েছে।

রাত কত হলো তাই বা কে জানে! তাড়াতাড়িতে হাতঘড়িটা আনতেও ভুল হয়ে গিয়েছে। শশাংককে কি ওরা উদ্ধার করতে পারল? যদি না পারে?

রাতটা না-হয় অপেক্ষা করতে করতেই এখানে কাটিয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু দিনের আলোয় এখানে এভাবে ঝোপের ধারে একাকী গাড়ি নিয়ে পুরুষের এই অদ্ভুত বেশে বসে থাকা—তাও তো সম্ভব হবে না কোনমতেই।

তাছাড়া গাড়িটাই বা কার? এবং গাড়িটা সে রাখবেই বা কোথায়?

রাত শেষ হওয়ার পূর্বে বাড়িতেও তো ফেরা প্রয়োজন। এ বেশে আর যাই হোক্ দিনের আলোয় বাড়িতে প্রবেশ করা যাবে না!

তবে?

দূর ছাই! অত ভেবেই বা কি হবে? যা হবার তা হবে।

নীলিমা দেবী! নীলিমা দেবী!

চাপা সতর্ক কণ্ঠের ডাকে চম্‌কে ওঠে নীলিমা।

অন্ধকারে সামনেই বোধ হয় কেউ তাকে ডাকছে।

আবার ডাক এলো, নীলিমা দেবী! আপনি কোথায়?

কে?

BanglaBook.org

আমি শশাংক।

এই যে আমি। চট্ করে লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেল নীলিমা।

সামনেই শশাংক দাঁড়িয়ে। দু'জনের সর্বাঙ্গে হঠাৎ একটা তীব্র আলোর ঝাপ্টা এসে পড়লো। একটা ট্রেন আসছে, তারই সন্ধানী আলোর রশ্মি।

নীলিমা দেবী! শশাংক নির্বাক বিস্ময়ে নীলিমার অদ্ভুত বেশভূষার দিকে তাকিয়ে ছিল।

আলোর রশ্মিটা আবার ততক্ষণে একটা ঝাপটা দিয়েই অপসারিত হয়েছে।

গাড়ি কই? আবার শশাংক প্রশ্ন করে।

আসুন। দু'জনে অগ্রসর হয়।

বন্ধু বলেছেন—আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আপনাকে গ্যারেজে গাড়িটা রেখে বাড়ি চলে যেতে। বলতে বলতে এ দুর্যোগেও হেসে ফেলে শশাংক বললে, কিন্তু তিনি সম্ভবত ভুলে গিয়েছিলেন তাড়াতাড়িতে যে আমিও গাড়ি চালাতে জানি!

কেন?

কারণ তাহ'লে আপনাকে পৌঁছে দিতে না বলে, বলতেন আমাকেই পৌঁছে দিতে আপনাকে। তা যা হোক, আমিই না হয় সেটা শুধরে নেবো, অর্থাৎ আপনাকে আগে পৌঁছে দিয়ে আমিই না হয় গ্যারেজে গাড়িটা রেখে যাবো।

কিন্তু বন্ধুটি আবার কে?

যাঁর গাড়ি অর্থাৎ আপনার জিম্মায় এখন যে গাড়িটা আছে তার মালিক বলতে পারেন—এবং আমার ত্রাণকর্তা।

নীলিমা বললে, আপনি হঠাৎ ওভাবে ঘুরিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন কেন বলুন তো শশাংকবাবু?

যাতে করে আমার বক্তব্য আপনার বুঝতে কষ্ট না হয়।

তার মানে?

মানে বুঝছেন না নীলিমা দেবী! আমি ভেবে বিস্মিত হচ্ছি, এভাবে আপনি আমার জন্য নিজেকে riskয়ের মধ্যে ফেলেছিলেন কেন? দেখুন নীলিমা দেবী, কৌতূহল জিনিসটা ভাল—কিন্তু কৌতূহল যখন তার সীমারেখাটা অতিক্রম করে, তখনই সেটা আর কৌতূহল থাকে না, হয়ে ওঠে বিশ্রী একটা ভণ্ডুলে ব্যাপার।

নীলিমা কিন্তু শশাংকর কথার কোন জবাবই দেয় না। সত্যি সে যেন কেমন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। নীলিমাকে ড্রাইভিং সীটে বসবার কোন অবকাশ মাত্র না দিয়ে সোজা নিজেই গিয়ে শশাংক ড্রাইভিং সীটে আসীন হয়ে মৃদু হেসে আহ্বান জানায় নীলিমাকে, আসুন দেবী, উপবেশন করুন। ড্রাইভিংটা আমার যখন নিজের নেহাৎ অরপ্ত নয়, lady আপনি—আপনাকে কেন আর কষ্ট দিই!

নীলিমা বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়িতে উঠে শশাংকর পাশের সীটে উপবেশন করে।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে শশাংক প্রশ্ন করে, বলুন দেবী, কোথায় অর্থাৎ কোন্ দিকে যেতে হবে এবার?

নারকেলডাঙ্গা ব্রীজের সামনে আমাকে নামিয়ে দিলেই চলবে। মৃদু কণ্ঠে নীলিমা জবাব দেয়।

শশাংক সত্যিই চমৎকার ড্রাইভ করে। নির্জন পীচ-ঢালা মসৃণ সরল পাকা সড়কের উপরে গাড়ি পড়তেই শশাংক স্পীড্ বাড়িয়ে দেয় গাড়ির।

BanglaBook.org

গাড়ির ড্যাস্ বোর্ডের সবুজ আলোর মৃদু একটা দীপ্তি পার্শ্বে উপবিষ্ট নীলিমার অবনত মুখখানির উপরে স্নিগ্ধ কোমল একটি ছোঁয়া দিয়েছে যেন।

নীলিমা দেবী! হঠাৎ ডাকে মৃদু কণ্ঠে শশাংক।

বলুন? নিস্তব্ধ হয়ে বসেই নীলিমা প্রশ্নের জবাব দেয়।

কি হলো আপনার? হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন যে একেবারে? মনে হচ্ছে যেন ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছেন বহু দূরপথে যাত্রীর মত অস্পষ্ট হয়ে! বলতে বলতে নিজের মনেই শশাংক হেসে ওঠে। তারপর আবার বলে, শত্রুর কবল থেকে মুক্তি পাওয়া অবধি কি যে হয়েছে আমার নীলিমা দেবী, কেবলই কথা বলতে ইচ্ছা করছে। সেদিন প্রথম যখন আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, আপনি ছিলেন বক্তা আর আমি ছিলাম শ্রোতা। আজ আপনি শ্রোতা আমি বক্তা। তাই বলে মনে করবেন না যেন আমি লোকটা বাচাল। এটা আমার আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতার একটা আনন্দমুখর অভিব্যক্তি মাত্র। সেদিন আপনার কথায় বিশ্বাস করতে পারিনি, মানে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে আপনাকে গ্রহণ করতে পারিনি, কিন্তু আজ আর সংশয়ের লেশমাত্রও নেই মনের কোথাও, আজ বুঝতে পেরেছি সত্যিই আপনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী, পরম শুভাকাঙ্ক্ষী।

ঠাট্টা করছেন নাকি?

ঠাট্টা! আপনার কি তাই মনে হচ্ছে নাকি নীলিমা দেবী!

নয়তো হঠাৎ আপনার এ বিশ্বাস হওয়ার কারণ? চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এমন কি ঘটলো যার দ্বারা আপনার সন্দেহটাই আমার ওপর থেকে উবে গেল! আমার আসল পরিচয়টুকুও তো এখনো পর্যন্ত আপনি পাননি।

দেখুন নীলিমা দেবী, মানুষের আসল বা সত্যিকারের পরিচয় ব্যাপারটা এমন জটিল যে, তার মধ্য হতে নকলটুকু বাদ দিয়ে আসলটুকুর সন্ধান পাওয়া বিশেষ কঠিন। কিন্তু সেই আসলটুকুই আবার যখন ধরা দেয় না, হঠাৎ যেন সবটুকুই প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই যেমন ধরুন না আপনার কথাই, প্রথম দিকে আপনি যেন ছিলেন একটা কুয়াশার জাল দিয়ে ঘেরা। হঠাৎ কখন এক ঝলক রোদ এসে আপনার সর্বাঙ্গে পড়তে না পড়তেই সব যেন পরিষ্কার হয়ে গেল।

কিন্তু এই তো আপনার সঙ্গে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ; কোন্ আকাশপথে রোদ উঠলো হঠাৎ শুনতে পারি কি?

যদি বলি মনের আকাশে! তবে কি বলবেন অতিশয়োক্তি করছি নীলিমা দেবী!

অতিশয়োক্তি না করলেও বলবো এটা আপনার একেবারেই অর্থহীন উক্তি এবং যার কোন সত্যিকারের মূল্যই নেই।

সে যাক্, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি অবশ্য ঠিক জবাব পাই—

কথাটা না শুনে বলতে পারছি না, মানে কথা দিতে পারছি না। নীলিমা বলে।

কেন বলুন তো? আমি—কিন্তু বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না—আপনাকে পুরোপুরি বন্ধুভাবেই গ্রহণ করেছি।

নীলিমা কোন জবাব দেয় না।

কি হলো? শশাংক শুধায়, বন্ধুত্বের আহ্বান কিন্তু প্রথমে আপনার দিক থেকেই এসেছিল!

তা এসেছিল মানি, কিন্তু তার মধ্যে যে আমার স্বার্থ ছিল না তাই বা আপনি নিঃসংশয়ে মেনে নিলেন কি করে!

BanglaBook.org

স্বার্থ? আপনার আবার কি স্বার্থ থাকতে পারে?

স্বার্থ যে মানুষের কত প্রকারের থাকতে পারে, তা কি আপনি জানেন মিঃ মিত্র? বিশেষ করে মেয়েমানুষের স্বার্থ—

এবারে কিন্তু সত্যিই হার মানতে বাধ্য হচ্ছি নীলিমা দেবী। কারণ ওই জাতটারই সঙ্গে পরিচয়টা তেমন বিশেষ কিছুই আমার নেই। ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি, কলেজে পড়তে পড়তে হারিয়েছি বাবাকে। বাড়ির মধ্যে মেয়ে বলুন, পুরুষ বলুন—ছোটবেলা হতেই দুটি লোককে দেখে এসেছি, একজন আমার স্বর্গত বাবা, দ্বিতীয় আমাদের আদি ও অকৃত্রিম সুহৃদ শ্রীস্বরূপদা the great! অতএব বুঝতেই পারছেন! কিন্তু থাক সে কথা—স্বার্থের কথা একটু আগে বলছিলেন, সত্যিই যদি বিশেষ কোন আপত্তি না থাকে বলুন না কি এমন স্বার্থ ছিল আপনার গায়ে পড়ে আমার ওভাবে উপকার করবার?

ধরুন আমার কোন বিশেষ একজন প্রিয়জনের স্বার্থের জন্যই আপনার উপকার করতে আমি গিয়েছিলাম এমনও তো হতে পারে।

দাঁড়ান, দাঁড়ান। প্রথম ব্যাপারটি অত্যন্ত ঘোলাটে ও জটিল বলে মনে হচ্ছে এবং দ্বিতীয় ব্যাপারটি আমাকে একান্তভাবে নিরাশ করে দিল।

নিরাশ করে দিল!

তা বইকি। আপনার কথা শুনে স্পষ্টই মনে হচ্ছে আপনার আমার উপকার করবার যে সাধু ইচ্ছাটি আজ সন্ধ্যা পর্যন্তও প্রবল ছিল, এখন বোধ হয় সেটা আর নেই।

তার মানে?

অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল। আপনার ক্ষণপূর্বের শেষ কথাটির মানে করলে তো তাই দাঁড়াচ্ছে। আপনি বলছেন—উপকার করতে চেয়েছিলেন অর্থাৎ সাদা বাংলায় এই দাঁড়ায়, ইচ্ছাটা অতীত—

তাই বুঝি মানে হলো? বলতে বলতে সত্যিই এতক্ষণে নীলিমা হেসে ফেললে।

যাক্, আমি সত্যিই বাঁচলাম। একটা আরামের নিশ্বাস নেয় শশাংক।

কেন? এতক্ষণ কি মরে ছিলেন নাকি? স্মিত হাস্যস্ফুরিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে নীলিমা।

তা ছিলাম বই কি।

তা হঠাৎ বেঁচেই বা উঠলেন কি করে?

কেন এই যে একটু আগে আপনি হাসলেন! হাসি তো নয়—মৃতসঞ্জীবনী! বাবাঃ, যা গোমড়া মুখ করে এতক্ষণ বসে ছিলেন!

BanglaBook.org

॥ ১৯ ॥

নির্জন সারকুলার রোড ধরে গাড়ি তখন মানিকতলার দিকে ছুটে চলেছে।

কলকাতা শহর ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল জেগে আছে তখনও রাস্তার দু'ধারে ইলেকট্রিক বাতিগুলো। তা সেগুলোও স্পষ্ট দেখা যায় না। চাপ চাপ ধোঁয়ায় চারিদিক যেন ভারী থমথমে হয়ে আছে। শ্বাস নিতে পর্যন্ত কষ্ট হয়। চোখ জ্বালা করে।

মানিকতলার মোড়ে আসতেই নীলিমা বললে, এখানেই গাড়ি থামান।

এইখানেই নাকি বাড়ি আপনার?

না, এখান হতে আমি হেঁটে যেতে পারবো বাকি পথটুকু।

শশাংক গাড়ি থামিয়ে দিয়েছিল, একবার মধ্যরাত্রির ধুম্রাচ্ছন্ন চারিদিককার নির্জন রাস্তাগুলো দেখে বললে, কিন্তু এই নির্জন রাস্তা ধরে এত রাত্রে আপনি একা একা যাবেন!

হ্যাঁ, এই তো একটুখানি পথ বই তো নয়!

কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন নারকেলডাঙ্গা ব্রীজের কাছে!

না, অতটা আর যেতে হবে না। এখান থেকেই স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারবো।

আপনি যে টাইপের মেয়ে—চলেও যেতে পারেন! কিন্তু আমি কি করে আপনাকে একা যেতে দিই, বলুন তো?

দেখুন মিঃ মিত্র, উপকার বৃত্তিটা যখন সীমাকে লঙ্ঘন করে তখন সেটা অত্যন্ত—

পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে! এই তো বলতে চান? কথাটা শেষ করে দেয় শশাংকই।

কতকটা তাই। তাছাড়া ভুলে যাবেন না, এই রাত্রেই আমি আপনাকে শত্রুর হাত হতে রক্ষা করতে গিয়েছিলাম! মনের জোর ও সাহস না থাকলে সেটা নিশ্চয়ই সম্ভব হতো না। আর তাছাড়া আপনি তো জানেন—সাধারণ বাঙালী মেয়ে বলতে আপনারা যা বোঝেন, সে শ্রেণীভুক্ত আমি ঠিক নই। পাঞ্জাবে মানুষ আমি—

বেশ। আমার আর কিছু তাহলে বলবার রাখলেন না নীলিমা দেবী। তবে বন্ধু বলে যখন পরস্পর আমরা পরস্পরকে গ্রহণ করেছিলামই—সঙ্গে আপনার এই পথটুকু যাবার অনুমতি দিলে পরস্পরের আমাদের বন্ধুত্বের দাবী সম্পর্কে অন্ততঃ সত্যিই নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।

ভয় নেই মিঃ মিত্র, এ ব্যাপারের দ্বারা সে সম্পর্কটা ক্ষুণ্ণ হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। সত্যিই আজ থেকে আমরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু হলাম। তারপর একটু থেমে বলে, ভুল বুঝবেন না আমাকে, কোন বিশেষ কারণেই আপনাকে আমার সঙ্গে বাকী পথটুকু আসবার জন্য সঙ্গী হিসাবে নিতে পারলাম না। নির্ভয়ে আপনি যেতে পারেন। তারপর একটু থেমে স্মিতভাবে আবার বলল, বিশ্বাস করুন অন্ততঃ এই পথটুকু অতিক্রম করতে আমার কোন বিপদই হবে না। আচ্ছা চলি—Good Night!

Good Night! মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় শশাংক।

শশাংক গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে বসে রইলো, নীলিমা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সত্যিই পথটা এত নির্জন, চারিদিকে চাপ চাপ ধোঁয়া যে এক হাত দূরবর্তী ব্যবধানে পর্যন্ত কিছু দেখবার উপায় নেই!

নীলিমা ক্লান্ত শ্লথ পায়ে এগিয়ে চলে বাড়ির দিকে।

আজ রাত্রের সমগ্র ঘটনাটা দ্রুত এমনভাবে মোড় নিল যে শশাংক নিজেও কম বিস্মিত হয়নি। কিন্তু কে ঐ অজ্ঞাতনামা পরিচয়দানে অনিচ্ছুক বন্ধুটি—কি ওঁর সত্যিকারের পরিচয়! ঐ অজ্ঞাতনামা বন্ধুটিই সেই দুর্যোগের রাত্রে শশাংককে প্রথমবার ডায়মণ্ডহারবারের সেই পোড়ো বাড়িতে শত্রুদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আজও তিনিই আবার এসে শেষ মুহূর্তটিতে শত্রুদের কবল হতে ওকে ছাড়িয়ে আনলেন।

একদিকে ঐ অজ্ঞাতনামা বন্ধুটি—অন্যদিকে ঐ নীলিমা দেবী—দুজনাই তার বন্ধু ও দুজনের একজনেরও আসল পরিচয় না জানতে পারলেও এখন পর্যন্ত বুঝতে পারছে ওরা পরস্পর

BanglaBook.org

পরস্পরকে চেনে—বেশ ভাল ভাবেই চেনে। দূর হোক গে ছাই, ও নিয়ে আর শশাংক মাথা ঘামাবে না!

বোঝা যাচ্ছে, ঐ ভদ্রলোকটি—শত্রুপক্ষের সমস্ত সংবাদই তাঁর নখদর্পণে। তা যদি না হতো, যদি ওদের সমস্ত গতিবিধি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল না হতেন—তাঁর পক্ষে তবে আজ ঠিক সময়টিতে সেখানে আসা সম্ভব হতো কি করে?

সঙ্গে সঙ্গে আবার এও মনে হয় শশাংকর, তবে কি ঐ ভদ্রলোক শত্রুপক্ষেরই কেউ একজন? অথবা ওদের দলে ভিড়ে গিয়ে কাজ করছেন?

এমন দৃষ্টান্তেরও তো অভাব নেই!

রতন সিংকে নীলিমা সেই ভদ্রলোকের হাতে ছেড়ে দিয়ে এলো—সেইটাই বা ভাল হলো কি না কে জানে!

বাড়িতে প্রবেশ করে সোজা নীলিমা নিজের ঘরে এসে প্রবেশ করল। আলো জ্বেলে দেখলে, টেবিলের উপরে টাইমপিস্‌টায় রাত্রি সাড়ে তিনটে বাজে।

রাত্রিও প্রায় শেষ হয়ে এল। জামাকাপড় ছেড়ে সাধারণ একখানি মিলের শাড়ি পরে নীলিমা দর্পণের সামনে এসে বসল। সাদা হাতীর দাঁতের চিরুনিটা দিয়ে চুলটা আঁচড়াচ্ছে—দর্পণে কার ছায়া প্রতিবিম্বিত হলো।

ভাল করে না দেখেই চকিতে নীলিমা পিছনের দিকে ফিরে তাকাল, মা।

এ কি, মা!

হ্যাঁ, সরমাই।

এখনো তুমি ঘুমোওনি মা? আমার জন্য জেগে বসেছিলে বুঝি?

সরমা এগিয়ে এসে মেয়ের পাশে দাঁড়ালেন, এত রাত করে ঐ সব অদ্ভুত বেশভূষা করে কোথায় গিয়েছিলি রে?

নীলিমা উঠে এসে মাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সস্নেহে বললে, লক্ষ্মী মা, আজ নয়, শিগ্‌গিরি সব কথা তোমাকে বলবো। এখন বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

নীলিমা তাড়াতাড়ি মাকে যেন কতকটা এড়াবার জন্যই ঘুমের ভান করে একটা হাই তোলে।

মা কিন্তু মেয়ে এড়াতে তাঁকে চাইলেও তিনি তাকে এড়াতে দেন না, আরো একটু এগিয়ে এসে মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন, নীলু!

কেন মা?

আজ চল্—আমার কাছে শুবি।

মা যে কেন সঙ্গে করে তাকে শুতে ডাকছে নীলিমা বুঝতে পারে। তাই বলে, না মা, এ ঘরেই আমি বেশ ঘুমুতে পারবো'খন!

তা হোক। চল্, আমার সঙ্গে শুবি।

কি ভেবে নীলিমা বলে, বেশ। চল মা তাই শুইগে। অনেকদিন তোমার সঙ্গে শুই না।

নীলিমা এসে শয্যায় মা'র পাশে শোয়। সরমা মেয়ের চুলে আঙুল চালাতে চালাতে হঠাৎ একসময় প্রশ্ন করেন, ঘুমোলি?

নীলিমার চোখে সত্যিই ঘুম ছিল না। অন্ধকার খোলা জানলাপথে রাতের আবছা আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল।

BanglaBook.org

তবু মায়ের প্রশ্নে কোন সাড়াশব্দও দেয় না ইচ্ছা করেই।

মা'র কিন্তু বুঝতে কষ্ট হয় না মেয়ে ঘুমোয়নি, জেগেই আছে, সাড়া দিচ্ছে না। মেয়ে জেগে আছে বুঝতে পেরেই সরমা একসময় বলতে শুরু করলেন, তোর স্বাধীন ইচ্ছায় আমি কোনদিনই বাধা দেব না নীলু। কিন্তু একটা কথা তোর মায়ের মনে রাখিস মা। উচ্ছৃঙ্খলতাই অনেক সময় মানুষকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যায়—

কেন মা, হঠাৎ একথা বলছো কেন? সত্যিই কি আমার চরিত্রে তুমি উচ্ছৃঙ্খলতা দেখেছো?

না, এখনো তেমন কিছু দেখিনি—তবে হাজার হলেও তুমি মেয়েমানুষ! তাই একজন পুরুষের পক্ষে যা শোভন, তোমার পক্ষে মোটেই হয়ত তা শোভন নয় এবং লোকের চোখেও অশোভন ঠেকতে পারে।

লোকের বলায় কি আসে যায় মা! আমি যতক্ষণ জানছি আমি ঠিকই আছি—

যায় বইকি! সমাজে দশজনের সঙ্গে একত্রে বাস করতে গেলে, দশজনের মতামতটা শুনতেই হবে। মূল্যও তার দিতে হবে! দেখ, আমার কোন ছেলে নেই। ছেলের অধিক তুই আমার কাছে। আর সেই কারণেই শিশুকালেই তোকে বাবার হাতে তুলে দিয়েছিলাম। বাবাকে আমি জানতাম—অমন নির্মল চরিত্রবান্ পুরুষ জীবনে আর আমি খুব কমই দেখেছি। জানতাম সেই বাবার হাতে মানুষ হতে পারলে তোর সম্পর্কে আমার আর কোন দুঃখই থাকবে না, কোন দুশ্চিন্তাই থাকবে না।

নীলিমা মায়ের কথায় হঠাৎ পাশ ফিরে মা'র গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সস্নেহকণ্ঠে বললে, বল মা—সত্যি করে বল, কোন দুঃখ কি সত্যিই আমার জন্য তোমার আছে?

না, নীলু। পুত্রসন্তান কতজনার হয় না—কন্যাসন্তান ও পুত্রসন্তানের মধ্যে তফাৎ আছে বটে, তবে আমার চোখে সন্তান যদি আদর্শচরিত্রের হয় তা সে পুত্রই হোক বা কন্যাই হোক, সন্তানলাভের গৌরব কিছুমাত্র তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না।

তবে বল মা, আজ এসব কথা হঠাৎই বা তোমার মনে পড়ছে কেন!

কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছি, তুই যেন কি একটা বিশেষ কথা আমার কাছ থেকে গোপন করবার চেষ্টা করছিস—

মুহূর্তের জন্য নীলিমা সমস্ত ব্যাপারটা একবার ভেবে নেয়। তারপর মৃদু স্বরে বলে, সত্যিই তাই মা। তবে আর গোপন করবো না। আজ সব কথাই অকপটে তোমার কাছে স্বীকার করবো। কিন্তু আমার কথা তোমাকে খুলে বলবার আগে, তোমার কাছেও আমার একটা অনুরোধ আছে মা—বল, আমার অনুরোধটি তুমি রাখবে?

বেশ, তাই হবে। আর ভবিষ্যতে তুইও তাহলে আমার কাছে কোন কথা গোপন করবি না, কেমন তো?

বেশ।

বল্ তোর কি অনুরোধ!

আমার চলার পথে তুমি বাধা দিতে পারবে না।

বেশ।

তবে শোন মা—নীলিমা বলতে শুরু করে, আমি জানি মা, তুমিও জান—আমাদের সংসারে

BanglaBook.org

পাপ প্রবেশ করেছে। যতদিন আমি তোমাদের কাছ থেকে দূরে ছিলাম, তোমাদের সংস্পর্শে আসিনি—এসব জানতামও না আর এসব নিয়ে মাথা ঘামাবারও আমার প্রয়োজন হয়নি। তুমি হয়ত এই পাপের সংস্পর্শ হতে আমাকে বাঁচাবার জন্যই একদিন এ সংসার হ'তে আমাকে সরিয়ে দিয়েছিলে। ছোট অবোধ ছিলাম তখন, তোমার বিধানই মাথা পেতে নিয়েছিলাম। দীর্ঘকাল পরে আবার যখন এই গৃহে ফিরে এলাম, আমার পরিণত মনই আমাকে মুহূর্তে সব কিছুর সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিল এবং আমার সহজাত কর্তব্যবোধ ও নীতিবোধ আমাকে প্রতিনিয়ত অঙ্কুশের মত বিদ্ধ করতে লাগলো সেই থেকে! প্রতি মুহূর্তে আমার ভিতরের আসল মানুষটা এই অন্যায় ও পাপের বিরুদ্ধে আমাকে উত্তেজিত করতে লাগল।

কিন্তু কতটুকু তুই তার জানিস নীলু?

হয়ত সবটা জানি না মা, কিন্তু যতটুকু জেনেছি তাতেই আমি জর্জরিত হয়ে উঠেছি। আর বিস্মিত হয়েছি, এতদিন ধরে কেমন করে এ দুঃসহ যাতনা তুমি সহ্য করে আসছো!

এ ছাড়া আর যে আমার দ্বিতীয় কোন পথই ছিল না মা।

কিন্তু একথা কি তুমি বোঝনি মা, তোমার এই নীরবতাই অন্যদিকে আর একজনের পাপের বোঝাকে উত্তরোত্তর পর্বতপ্রমাণ করে তুলছে!

তুই তো জানিস নে মা, প্রথম প্রথম কি ভাবে আমি সংগ্রাম করেছি এ সবের বিরুদ্ধে! কিন্তু দুর্বুদ্ধি যখন ধ্বংসের পথে ছুটে চলে—কোন কিছুই তার গতিকে রোধ করতে পারে না। অনুরোধ, উপরোধ, অনুনয়, তর্জন-গর্জন, অভিমান কিছু দিয়েই যখন দুর্বুদ্ধির সে দুর্বার গতিকে রোধ করতে পারলাম না, হাল ছেড়ে দেওয়া ভিন্ন দ্বিতীয় আর কোন পথই সামনে আমার খোলা রইল না। সে যে আমার পক্ষে কত বড় মর্মান্তিক, কতখানি দুঃসহ, কত বড় লজ্জা—যা ছিল জীবনের আমার সবচাইতে বড় গর্ব, সেই গর্বই যখন বালুর প্রাসাদের মত ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ল, আমি—আমি যেন পাষাণ হয়ে গেলাম।

এখানে এসেই তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম, মা। এবং তোমার বর্তমান মনের ব্যথা বুঝেই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, যেমন করে যে উপায়েই হোক এ কলংক হতে মুক্তির পথ একটা খুঁজে বের করতেই হবে আমাকে। শুরু হলো আমাদের কাজ।

কিন্তু—

ভয় নেই মা। এমন কিছু আমি করবো না, যাতে করে কোন দুঃখের বা লজ্জার ব্যাপার ঘটতে পারে। তারপর একটু থেমে বলে, কিছুদিন থেকে যে আমাকে অন্যমনস্ক দেখছো সেও ঐ কারণেই এবং আজ যে পুরুষের বেশে বের হয়েছিলাম সেও ঐ জন্যই।

নীলু—

হ্যাঁ মা—তুমি জান না—ধ্বংসের পথে মানুষ যখন ছুটতে থাকে তখন তার বিবেক বিবেচনা বুদ্ধি সব কিছু কেমন করে গুলিয়ে যায়। আর তাইতেই আজ এরা সকলে মিলে যে হীন ষড়যন্ত্র করেছে—

ষড়যন্ত্র! কিসের ষড়যন্ত্র নীলু! চমকে ওঠে সরমা।

BanglaBook.org

॥ ২০ ॥

শশাংক সেই অজ্ঞাতনামা বন্ধুর নির্দেশমত যথাস্থানে তাঁর গাড়িটা গ্যারেজে রেখে হাঁটাপথেই বাড়ির দিকে চলল। রাত্রি তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শীতরাত্রি-শেষের অন্ধকার ক্রমে তরল হয়ে আসছে। চাপা আলোর একটা অস্পষ্ট আভাস প্রকৃতি জুড়ে।

পথ চলতে চলতে শশাংক নীলিমার কথাই ভাবছিল। আশ্চর্য মেয়েটি ওই নীলিমা! হোক পাঞ্জাবে মানুষ তবু তো বাঙালীরই মেয়ে। একজন বাঙালীর মেয়ে ঠিক এমনটি হতে পারে ইতিপূর্বে ওর ধারণাই ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য সংযম মেয়েটির। কিছুতেই নিজেকে ঠিক ধরা-ছোঁয়া দিল না।

রাত্রির মতই রহস্যময়ী মেয়েটি! হঠাৎ মনে হয় যেন কথাটা। সত্যি, ওর নাম নীলিমা না হয়ে রাত্রিই হওয়া উচিত ছিল! বললে নিজের স্বার্থেই নাকি সে তার এত বড় বিপদের মধ্যে মেয়ে হয়েও মাথা গলাতে দুঃসাহসী হয়েছে।

স্বার্থ! কি এমন তার স্বার্থ থাকতে পারে—যে স্বার্থ শশাংকর সঙ্গে জড়িত!

কোনমতেই ভেবে পাচ্ছে না শশাংক এ ব্যাপারে কোন্ সূত্রে কোন্ স্বার্থে নীলিমার সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকতে পারে। শশাংকর তো মনে হয় সম্পূর্ণ কৌতূহলের বশেই নীলিমা তার সঙ্গে এসে জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু নীলিমার মত প্রখর বুদ্ধিমতী মেয়ে এভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ এক অপরিচিত তৃতীয় ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপারে এভাবে জড়িত করবে তাও যেন বিশ্বাস করতে মন চায় না।

মাথাটার মধ্যে দপ্ দপ্ করছে, ক্লান্ত স্নায়ু আর চিন্তা করতে পারে না।

শশাংক হনহন করে হাঁটতে লাগল। কোনমতে এখন সোজা বাড়িতে পৌঁছে শয্যার উপরে ক্লান্ত দেহভারটা এলিয়ে দিয়ে দীর্ঘ একটা নিদ্রার প্রয়োজন যেন ও একান্ত ভাবেই দেহ ও মনে অনুভব করে।

কিন্তু নীলিমার চিন্তাটা মন থেকে গিয়েও যেতে চায় না। ঘুরেফিরে কেবলই নীলিমার মুখখানা মানসপটে ভেসে ভেসে ওঠে বার বার।

গৃহে পৌঁছে কিছুক্ষণ দরজার কড়া নাড়াতে নাড়াতে স্বরূপের ঘুম ভাঙল। নিদ্রাকাতর চক্ষু দুটি রগড়াতে রগড়াতে এসে সদর দরজাটা খুলে দিল।

উঃ, কালঘুম ঘুমোচ্ছিলে নাকি স্বরূপদা? পাড়ার সকলের ঘুম ভেঙে যাবার যোগাড়!

হাসপাতালের ধারে বড় গাছটার ডালে ঘুমভাঙা কাকগুলো একসঙ্গে ডেকে ওঠে কা-কা করে ঐ সময়।

তোর ব্যাপার কি বল্ তো শংকু?

স্বরূপদার তীক্ষ্ণ প্রশ্নে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে থম্‌কে দাঁড়াল শশাংক।

কেন?

আবার জিজ্ঞাসা করছিস কেন? এত রাত পর্যন্ত নেমন্তন্ন খাচ্ছিলি বলতে চাস?

তবে কি হাওয়া খাচ্ছিলাম তোর ধারণা?

BanglaBook.org

দেখ্, মিথ্যে কথা বলিস না। দিগেনবাবুর বাড়ি থেকে তো অনেকক্ষণ চলে এসেছিলি। তবে এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলি?

শশাংক বুঝলে স্বরূপদার প্রশ্নের তাৎপর্য আছে, সে যে এতক্ষণ দিগেন সান্যালের বাড়িতে ছিল না তা ও যে করেই হোক জানতে পেরেছে।

আয়, উপরে আয়। সঙ্গে এক কাপ চা নিয়ে আয়। সব বলছি তোকে স্বরূপদা।

শশাংক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

অস্পষ্ট ভোরের তরল আলো খোলা জানালাপথে এসে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করেছে, সেই সঙ্গে আসছে ভোরের স্নিগ্ধ ঝিরঝিরে হাওয়া।

শশাংক তার শয়নকক্ষে একটা সোফার উপরে গা এলিয়ে চোখ বুজে পড়েছিল। চিন্তা করবো না আর স্থির সংকল্প হলেও মনের পাতায় সেই মুখখানিই বার বার ভেসে উঠছিল যেন।

নীলিমা—নীলিমা!

একজন স্বল্পপরিচিতা ভদ্রমহিলা সম্পর্কে মনে মনে তাকে চিন্তা করাও পাপ। শশাংকর মনের মধ্যে কে যেন বলে ওঠে।

কেন? তাকে আমার ভাল লেগেছে চিন্তা করবো না কেন?

তার সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলতে পারবে ঐ কথাটা?

যাঃ, তাই কি বলা যায়! কি ভাববে সে!

যা সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারো না, আড়ালে উচ্চারণ করছো কেন? বুঝতে পারছো না যুবক, এ তোমার একান্তই চোখের নেশা!

না, এ নেশা নয়, তাকে সত্যিই আমার ভাল লেগেছে।

আবার প্রশ্ন ঃ এত তাড়াতাড়ি?

ভাল লাগার আবার কম-বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় নাকি?

মা উঠে গিয়েছে—তার পূজার সময় হয়েছে।

একা নীলিমা শুয়েছিল শয্যায় এবং ভাবছিল ঃ শশাংক ভারি বোকা! এ যুগে শশাংকর মত অমন ঢিলেঢালা প্রকৃতির কেউ আবার থাকে নাকি!

তাতে তোমার কি বাপু! শশাংক ঢিলেঢালা হোক বা ডানপিটেই হোক! তোমার তাতে কি এসে গেল শুনি?

আশ্চর্য! কেবল ঘুরেফিরে শশাংকর কথাই বা কেন মনে পড়ছে! মনের মধ্যে কার যেন চাপা হাস্যোৎফুল্ল কণ্ঠস্বর শোনা যায় ঃ নীলিমা দেবী, তুমি মরেছো!

তীব্র প্রতিবাদ— কক্ষনো না।

নিশ্চয়ই হ্যাঁ।

নিশ্চয়ই না।

নিশ্চয়ই না যদি, তবে শশাংকর জন্য তোমার এত মাথাব্যথা কিসের?

ভদ্রলোক কি ভদ্রলোকের বিপদে সাহায্য করে না?

BanglaBook.org

করে—কিন্তু অপরিচিতা একজন ভদ্রমহিলা যদি হঠাৎ অপরিচিত একজন ভদ্রলোকের জন্য এভাবে মনোযোগী হয়ে ওঠে মনোবিজ্ঞানে তাকে কি বলে জান?

কি আবার বলবে! আহা ভদ্রলোক বেচারী!

কিন্তু দুনিয়ায় শশাংক মিত্তিরের মত বেচারী ভদ্রলোকদের তো অভাব নেই! কই, আর কারও জন্য তো এতখানি ঝক্কি তুমি নিচ্ছ না, ভাবছো না তার কথা!

মা এসে কক্ষে প্রবেশ করলেন, চোখ বুজে মেয়ে শয্যার উপরে শুয়ে থাকলেও সে যে ঘুমোয়নি, জেগে আছে, মায়ের চোখে সে ফাঁকিটুকু কিন্তু ধরা পড়তে দেরি থাকে না।

মা মেয়ের মাথায় হাত রাখলেন। সস্নেহে বললেন, এবারে একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর্ নীলু। নইলে শরীর খারাপ হবে। আমি না হয় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

চোখ বুজে নীলিমা অনুভব করে সদ্যস্নাতা মায়ের ভিজে চুল থেকে স্নিগ্ধ একটি গন্ধ আসছে ভারি মিষ্টি মিষ্টি।

মায়ের প্রাতঃস্নান হয়ে গিয়েছে। নিশ্চয়ই এখন পরিধানে তাঁর লাল চওড়া পাড় সেই গরদের শাড়িটি। মায়ের পূজার সময় এটা।

নীলিমা কোন জবাব দেয় না। চোখ বুজেই নিঃশব্দে শয্যার উপরে পড়ে থাকে।

মা মেয়ের মাথার চুলে কয়েকবার হাত বুলিয়ে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান।

স্বরূপদা হাতে ধূমায়িত চায়ের কাপ নিয়ে কক্ষে এসে প্রবেশ করল, চা এনেছি।

চোখ না খুলেই শশাংক জবাব দেয়, ওইখানে রাখ্।

না, খেয়ে নে। এখুনি হয়ত বলবি চা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে!

শশাংক এবারে চোখ খুলে সোজা হয়ে বসে, দে।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে শশাংক বললে, হ্যাঁ, তুই কি করে জানলি বল্ তো—আমি দিগেন সান্যালের ওখান হতে চলে এসেছিলাম?

কেন, রাত বারোটার সময় সুব্রতবাবু ফোন করে যখন জানলেন তুই তখনও ফিরিসনি, আমার কাছে সব শুনে দিগেন সান্যালের ওখানে ফোন করেন। সেখানেই উনি জানতে পারেন, সেখান হতে রাত এগারটার পরই তুই খেয়ে বাড়ি চলে এসেছিস। এই সংবাদ পেয়ে সুব্রতবাবু আবার আমাকে ফোন করে জানতে চান তুই বাড়ি ফিরেছিস কি না এবং তখনও ফিরিসনি শুনে বললেন—তুই ফিরলেই যেন ফোন করে তাকে সংবাদ দেওয়া হয়।

হুঁ। তাহলে এই ব্যাপার!

কিন্তু এই সুব্রতবাবুটির সঙ্গে তোর এত মাখামাখি কিসের খোকা! শুনেছি লোকটা একসময় পুলিসের টিক্‌টিকির চাকরি করত! যত সব চোরখুনেদের নিয়ে লোকটার কারবার। তুই বা কদিন ধরে এসব কি শুরু করেছিস বল্ তো?

কেন রে! ভয় পেয়েছিস নাকি? শশাংক হাসতে হাসতে বলে ওঠে।

তুই যা-তা করে বেড়াবি আর আমি ভয় পাবো না? কলকাতা বড় পাজী জায়গা। হাতে তোর অনেক কাঁচা টাকা, কোথায় কে কোন্ ধান্ধায় ঘুরছে কে জানে! হুট্ করে কখন সাংঘাতিক বিপদে পড়বি!

BanglaBook.org

No fear স্বরূপদা! অর্থাৎ মা ভৈষী—বুঝলে না তো? অর্থাৎ ভয়ের কোন কারণ নেই, বুঝলি?

না খোকা, এসব মোটেই ভাল লাগছে না আমার। কাকাবাবুও কলকাতায় নেই। তোর মাথার ওপরে এখন অভিভাবক বলতে কেউ নেই।

খোকা বলে ডাকলেই কি এখনো সেই ছোট্ট খোকাটিই আছি রে।

না, একেবারে ঠাকুর্দা হয়েছিস! কিন্তু সারাটা রাত কোথায় ছিলি বল্ তো?

বলবো রে বলবো। ব্যস্ত হচ্ছিস কেন?

পাশের ঘরে সহসা এমন সময় ফোনের ঘণ্টি বেজে উঠলো ক্রিং ক্রিং!... শশাংক উঠে রিসিভারটা তুলে নিল ঃ হ্যালো! অ্যাঁ! হ্যাঁ। শশাংকই কথা বলছি। কে, সুব্রতবাবু? সুপ্রভাত! না, কোন বিপদ-আপদ হয়নি। অ্যাঁ, হ্যাঁ! তবে সামান্য কিছু ঘটেছে বৈকি। আসবেন? আসুন না। সাক্ষাতেই সব বলবো। বেশ বেশ।

শশাংক ফোনটা নামিয়ে রাখলো। এবং স্বরূপের দিকে ফিরে বলল, চায়ের যোগাড় কর্ স্বরূপদা। সুব্রতবাবু আসছেন। আমি ততক্ষণ হাতমুখ ধুয়ে নিই।

হাতমুখ ধোয়াই শুধু নয়, শশাংক একেবারে স্নান-পর্বটাও সেরে নিল।

স্নান সমাপনান্তে জামাকাপড় বদলিয়ে শশাংক শয়নকক্ষের ড্রেসিং টেবিলের বড় আরশিটার সামনে দাঁড়িয়ে কেশ প্রসাধন করছে। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। নিশ্চয়ই সুব্রতবাবু এসে গেলেন।

হ্যাঁ, তাই। সুব্রতবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেলঃ মিঃ মিত্র! শশাংকবাবু!

আসুন—আসুন সুব্রতবাবু। শশাংক সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ায়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তৃতীয় অধ্যায়

॥ ১ ॥

দক্ষিণেশ্বরের পোড়োবাড়িতে সেই ভদ্রলোক রতনের পাশে দাঁড়ায় শশাংককে বিদায় দিয়ে।

রতন!

জি--

আচ্ছা, আভি তুম্ ওয়াপস্ যাও। আর থোড়া দের বাদ কলকত্তা যানে কি ট্রেন স্টেশন পর মিল যায়গি। সিধা কলকত্তা চল যানা। এই রূপেয়াঠো তোমরা পাস রাখ।

নেহি সাব্ রূপেয়া হামারা পাস হ্যায়। লেকেন সাব্, এহি শয়তান কো কেয়া ফায়সালা হোগা?

ইসিকো হামরা জিম্মা পর ছোড় দো। হাম খুদ ইসিকো সামাহালেঙ্গে।

আচ্ছা সাব্। চলতে চলতে আবার রতন ফিরে দাঁড়ায়, সাব্, দিদিমণি--

ইসিকাবাৎ দিদিমণি জরুর কোঠি পৌঁছ গেয়ি হোগি!

সেলাম সাব্! রতন চলে গেল।

ভোরের আলো ফুটতে আর বড় জোর ঘণ্টাখানেক বাকী আছে। তবে আগেই অরিন্দমের একটা বিলিব্যবস্থা শেষ করে ফেলতে হবে। বন্দী অরিন্দমের পাশে এসে দাঁড়ায় আগন্তুক।

তারপর পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে বন্দী অরিন্দমকে সম্বোধন করে বলে, অরিন্দম সরকার, তুমি আমার পরিচয় না জানলেও বর্তমানে তোমার সব কিছু আমার নখদর্পণে। ইতিপূর্বে গত এক মাসের মধ্যে আর দু-দু'বার তোমাকে আমি সাবধান করে পত্র দিয়েছিলাম, কিন্তু দুর্বুদ্ধি তোমার—এ পথ এখনো তুমি ছাড়তে পারলে না।

কথা বলবার উপায় নেই।

আবছা আলো-আঁধারিতে কটমট করে অীব্র দৃষ্টিতে তাকায় বন্দী অসহায় অরিন্দম বক্তার মুখোশ-ঢাকা মুখের দিকে। হিংস্র বাঘ খাঁচার মধ্যে বন্দী অবস্থায় খাঁচার বাইরে হতে খোঁচা খেলে যে দৃষ্টিতে তাকায় ক্রুদ্ধ আক্রোশে, অরিন্দমের চোখের দৃষ্টিটাও তেমনি।

আজ তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে এবং সে কথাগুলো না বলে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারছি না। কিন্তু এখানেও সে সব কথা তোমার সঙ্গে আপাততঃ হতে পারে না। নেশাগ্রস্ত অনুচরেরা তোমার উপরের ঘরে বন্দী। নেশা ভাঙলে তারাও হয়ত গোলমাল শুরু করতে পারে, তাছাড়া এ আড্ডাটাও তোমাদের। তোমাদের দলের অন্য কেউ হুট করে এসে তোমাকে এ অবস্থায় বন্দী এবং আমাকে সামনে দেখতে পেলে তাদের মনোভাবটা যে প্রীতির হবে তাও নয়। অতএব তোমাকে আমি চোখ বেঁধে তোমারই গাড়িতে করে নিরাপদ একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে আমার কথাগুলো তোমায় আমি বলতে চাই। আশা করি এতে তোমার আপত্তি হবে না, কি বল?

কেন যেন অরিন্দম আগন্তুকের প্রস্তাবে আপত্তি জানায় না। তাছাড়া লোকটা সম্পর্কে একটা কৌতূহলও থেকে থেকে পীড়ন করছিল। কে লোকটা? কি লোকটার পরিচয়? আগে দুটো চিঠি সে পেয়েছে সত্যি। তাকে সেই চিঠিতে সাবধান করা হয়েছে। তাহলে ঐ ব্যক্তিই তাকে সে চিঠি দিয়েছে?

BanglaBook.org

তবে একটা কথা, কোথায় তোমাকে আমি নিয়ে যাবো সেটা তোমাকে আমার জানতে দিতে ইচ্ছা নেই বলেই চোখ দুটো বেঁধে দিতে চাই তোমার।

অতঃপর নীচু হয়ে রুমালটা দিয়ে আগন্তুক অরিন্দমের চোখ দুটো বেঁধে দেয়। তারপর অক্লেশে তাকে একটা বোঁচকার মত কাঁধের উপরে তুলে নেয়।

অরিন্দম শান্তশিষ্ট হয়েই থাকে। বিশেষ কোন আপত্তি জানায় না।

অরিন্দমকে কাঁধে করে বয়ে এনে বাইরে দণ্ডায়মান গাড়ির পিছনের সীটে বসিয়ে দিয়ে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল আগন্তুক।

ইঞ্জিন গর্জে ওঠে।

বেলেঘাটা অঞ্চলে একটা নতুন দ্বিতল গেটওয়ালা বাড়ির মধ্যে এসে গাড়িটা প্রবেশ করল।

গাড়ির শব্দ শুনে ভোজপুরী এক বিশালদেহী দরোয়ান গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়।

মুখে তখন কিন্তু মুখোশ ছিল না ভদ্রলোকের।

দারোয়ানের নাম বিষণ সিং।

বিষণ সিংকে উদ্দেশ্য করে ভদ্রলোক বললে, বিষণ, গাড়ির মধ্যে যে বাবুটি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আছেন তাকে আমার বসবার ঘরে নিয়ে আয়!

প্রভুর আদেশে বিষণ গাড়ির দরজা খুলে অরিন্দমকে অবলীলাক্রমে বোঁচকার মতই কাঁধের উপর তুলে নিয়ে একতলার নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে এনে একটা চেয়ারের উপরে বসিয়ে দিল।

ভদ্রলোক একটু পরেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, বিষণ, বাবুর হাতের পায়ের বাঁধনগুলো খুলে দে। হ্যাঁ, আগে দেখে নে পকেটে কোন অস্ত্র আছে কিনা। চোখের বাঁধন ও মুখের বাঁধনটা থাক, আমি খুলে দেবো'খন।

প্রভুর আদেশে বিষণ সিং সর্বাগ্রে অরিন্দম সরকারের পকেট হাতড়ে প্রথমে একটা ছ-চেম্বারের ওয়েভারলি পিস্তল ও তারপর তিনফলার একটা ছুরি বের করলে।

ওগুলো আপাততঃ তোর কাছেই থাক বিষণ। যাবার সময় বাবুকে ওগুলো দিয়ে দিস। দে, হাত-পায়ের বাঁধনগুলো খুলে দে বাবুর!

বিষণ হাত-পায়ের বাঁধনগুলো খুলে দিল।

ভদ্রলোকের চোখের ইঙ্গিতে অতঃপর বিষণ ঘর হতে বার হয়ে গেল।

অরিন্দম, এবার তোমার চোখের ও মুখের বাঁধন আমি খুলে দেবো। তোমার হাত-পায়ের বাঁধন আমি খুলে দিচ্ছি তবে ভদ্রলোকের মতই ব্যবহার আশা করি তোমার কাছে!

বলতে বলতে ভদ্রলোক পুনরায় আবার নিজের মুখোশটা মুখে এঁটে এগিয়ে গিয়ে উপবিষ্ট অরিন্দমের মুখ থেকে প্রথমে খুলে দিল তার চোখের রুমাল, পরে তার মুখের বাঁধন।

একান্ত প্রয়োজনবোধে তোমার প্রতি এ রূঢ় ব্যবহারের জন্য আমি লজ্জিত ও দুঃখিত মিঃ সরকার। এখন তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত। কিন্তু তবু সাবধান করে দিচ্ছি, এটা আমার বাড়ি এবং আমার শক্তির সঙ্গে তোমার নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে পরিচয়ও হয়েছে— so don't try to show any dirty tricks ! জেনো, নোংরামি করলে আমার কাছেও নোংরা ব্যবহার পাবে। আমি তোমাকে আটকে রাখবো না। আমার বক্তব্য হয়ে গেলেই তোমাকে তোমার ইচ্ছামত জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো।

চোখের বাঁধন খোলা হতেই অরিন্দম প্রথমটা সব ঝাপসা দেখে, চোখ দুটো তখনও টনটন করছে। হাত-পায়ের বাঁধন অপসারিত হওয়া সত্ত্বেও দেহটা এখনো কেমন আড়ষ্ট বলে মনে হয়।

BanglaBook.org

প্রথমেই দৃষ্টিশক্তি সহজ হয়ে আসতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অরিন্দম বক্তার দিকে তাকায়, লোকটির মুখে মুখোশ আঁটা। মুখোশের অন্তরালে নাকের নিম্নাংশ পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে।

অতএব মুখ দেখে চেনবার কোন উপায় নেই বক্তা কে!

দীর্ঘ ঋজু চেহারা। কিন্তু গায়ে যে প্রচুর শক্তি ধরে লোকটি বুঝতে কষ্ট হয় না। শিরা-জাগানো হাত, চওড়া কব্জি। মোটা মোটা লম্বা লম্বা আঙুল। পরিধানে ধূসরবর্ণের ফ্লানেলের ট্রাউজার ও গায়ে কালো রংয়ের পুলওভার একটা।

বিষণ একটা ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম ও কিছু রুটিমাখন নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল।

ঘরের এক কোণে একটা ত্রিপয় ছিল, ট্রে-টা সেই ত্রিপয়ের উপর রেখে সেটা উপবিষ্ট অরিন্দমের নিকটে এগিয়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

Now have your tea first, মিঃ সরকার! একটু ফ্রেশ হয়ে নাও, তারপর আমাদের আলোচনা শুরু করা যাবে।

কথাটা বলে মুখোশধারী একটা গদি-আঁটা চেয়ারে উপবেশন করে পকেট থেকে একটা টেবাকো পাউচ ও সুন্দর দামী একটি পাইপ বের করে। পাইপটার গহ্বরে খানিকটা টোবাকো ঠেসে পাইপটা মুখে দাঁত দিয়ে চেপে অগ্নিসংযোগ করলে।

গোটা-দুই সুখটান দিয়ে পাইপে একরাশ ধোঁয়া উদগীরণ করলে। তারপর মৃদু হেসে অরিন্দমকে বললে, কি হলো, চা খাও!

না, চায়ের আমার প্রয়োজন নেই। এতক্ষণে অরিন্দম সরকার কথা বলে।

অরিন্দমের কথায় হঠাৎ হাঃ হাঃ করে উচ্চৈঃস্বরে প্রাণখোলা হাসি হেসে ওঠে ভদ্রলোক।

রোষকষায়িত চক্ষে তীব্রভাবে তাকায় অরিন্দম ওর দিকে।

রাগ করো না সরকার। আজ তুমি আমায় ভুলে গেলেও একদিন আমরা পরস্পর পরস্পরকে চিনতাম, তাই প্রথমে হতেই তোমায় আমি তুমি বলে সম্বোধন করেছি। নাম ধরে ডেকেছি।

ভদ্রলোকের কথায় অরিন্দম সহসা চমকে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে বক্তার মুখের দিকে তাকায়।

No-no! My dear friend, আজ আর তুমি আমায় চিনতে পারবে না। মুখের মুখোশটা খুলে ফেললেও চিনতে পারবে না— কারণ কালের বক্রপথ ধরে দু'জনে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছি। তোমার মত ও পথ আজ আমা হতে সম্পূর্ণ আলাদা।

কে—কে তুমি? উত্তেজনায় অরিন্দম সরকার চেয়ার ছেড়ে অজ্ঞাতেই যেন উঠে দাঁড়ায়।

বসো, বসো। অধীর হয়ো না। বললাম তো এইমাত্র আজ আর তুমি আমায় চিনতে পারবে না। যাক্ সে কথা, কাজের কথায় আসা যাক্।

অরিন্দম ততক্ষণে আবার চেয়ারের উপরে বসে পড়েছে।

শোনা অরিন্দম, বোস সাহেবের সঙ্গে ডাক্তার অজয় মিত্তিরের ফাংগাসের গবেষণার কপিটা তাঁর হাতে অর্থাৎ তোমার boss বোস সাহেবের হাতে তুলে দিতে পারলে কত টাকা তুমি পাবে অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কত টাকার কন্টাক্ট হয়েছে জানি না, টাকার কথায় আমি পরে আসবো— তার আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যিই কি তোমার বিবেক বলে আজ আর অবশিষ্ট কিছুই নেই? জাহান্নামের পথে আনাগোনা করতে করতে সবই কি তুমি বিসর্জন দিয়েছো? আজকের দিনে দেশ বলে, জন্মভূমি মাতৃভূমি বলেও কি তোমার মনে কোন কিছু রেখাপাত করে না? বুঝতে সত্যিই কি তুমি পারছ না, দেশের এত বড় একটা সম্মান তুমি সামান্য অর্থের লোভে এক

BanglaBook.org

ভিন্‌দেশীর হাতে তুলে দিতে উদ্যত হয়েছো? এর ঘৃণা কলঙ্ক নীচতা কিছু—কিছুই কি মনকে তোমার আজ স্পর্শ করে না?

বড় বড় লেকচার শোনাবার জন্যই তুমি আমাকে এভাবে ধরে নিয়ে এসেছো— তাহলে বলবো, don't waste your time! ওসব হিতোপদেশের বাছা বাছা গরম গরম বুলি— সারমন— I hate it, বুঝলে I hate!

ভদ্রলোক অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

হুঁ, বুঝতে পারছি যে কারণেই হোক পূর্বের অরিন্দমের বিন্দুমাত্র আজ আর অবশিষ্ট নেই বর্তমানের তুমি অরিন্দমের মধ্যে। বেশ, টাকার কথাতেই তা'হলে আসা যাক। বল, কত টাকা পেলে তুমি এ সর্বনাশা সংকল্প হতে সরে দাঁড়াবে?

ভুলে যাচ্ছ চোরডাকাতদেরও নিজস্ব একটা নিষ্ঠাবোধ আছে, একটা নীতিও আছে। অতএব ওতে কোন ফল হবে না।

কিন্তু টাকার জন্যই তো এ কাজে তুমি হাত দিয়েছো? অস্বীকার নিশ্চয়ই করতে পারো না?

নিশ্চয়ই করি না।

তবে যদি আমিই সে টাকাটা দিই এবং বেশী টাকাই দিই তোমায়?

ভুল। ও ধারণাও তোমার ভুল। তোমাদের প্রচলিত নিয়মের মধ্যে সাধারণ আমার শ্রেণীর লোকেরা পড়লেও, আমার সঙ্গে তাদের একটু তফাৎ আছে। তাছাড়া তোমার মত লোকের নিশ্চয়ই অজানা নেই, টাকা দিয়ে সব সময় সব কিছু কেনা যায় না। আশা করি বক্তব্য তোমার শেষ হয়েছে।

তুমি তাহলে কোনমতেই এ সংকল্প ত্যাগ করবে না অরিন্দম?

না। অরিন্দম সরকার কথার খেলাপ করে না।

বেশ। তবে আমিও তোমায় জানিয়ে রাখি, যে বস্তুর জন্য তুমি কুকুরের মত হন্যে হয়ে উঠেছো তা এ জীবনে তোমার করায়ত্ত হবে না, আমি যখন এতে হাত দিয়েছি।

আমার সংকল্প তা হলে শুনে রাখ। আমিও শশাংকর কাছ হতে ছিনিয়ে নেবোই!

চেষ্টা করে দেখ। আমারও আজকের পরিচয় তো তুমি জান না অরিন্দম। তাহলে বুঝতে এ আস্ফালনের মূল্য তোমার কতটুকু! বেশ। তবে চললাম।

বিষণ তোমাকে পৌঁছে দেবে। বিষণ!

বিষণ বলে ডাকতেই বিষণ এসে ঘরে প্রবেশ করল।

এঁকে এঁর গাড়িতে করে শিয়ালদার মোড়ে ছেড়ে দিয়ে আয়। হ্যাঁ মিঃ সরকার, এখান হতে যাবার আগে আর একবার তোমার চোখে বাঁধন পরাতে হবে— এবং হাতেও—

বলতে বলতে ভদ্রলোক এগিয়ে এসে প্রথমে অরিন্দমের চোখে রুমাল বেঁধে দেয়, তারপর হাত দুটোও তার শক্ত করে বেঁধে দেয়।

আশ্চর্য!

অরিন্দম বিন্দুমাত্রও বাধা দেয় না।

নিঃশব্দে বাঁধন স্বীকার করে নেয়।

BanglaBook.org

॥ ২ ॥

অরিন্দম সরকারকে বিদায় দিয়ে ভদ্রলোক পাশের ঘরে এসে প্রবেশ করে।

ঘরের মধ্যে একটা চেয়ারের উপরে বংশী বসে আপন মনে গোগ্রাসে একটা রোমাঞ্চ উপন্যাসের কাহিনী গলাধঃকরণ করছিল।

ভদ্রলোকের প্রবেশ টের পায় না।

ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করে একবার কৌতুকভরা দৃষ্টিতে অধ্যয়নরত উপবিষ্ট বংশী নাগের প্রতি তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, Well—Well মিঃ নাগ, তোমার ভিলেনের সংবাদ কি? ডিটেক্‌টিভ্ ব্যাটাকে ঘায়েল করেছে তো?

বংশী বই হতে চোখ তুলেই বলে, মাই গড্! ভীষণ serious, please don't disturb! সরু কার্নিস ধরে ঝুলতে ঝুলতে পাইথন্ এগুচ্ছে!

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে পকেট থেকে আর একবার টোবাকো পাউচটা বের করে মুখের নিবন্ত পাইপটা মেঝেতে ঠুকে পোড়া তামাকটুকু ফেলে দিল। তারপর নতুন করে আবার তামাক পাইপে ভরে পাইপে অগ্নিসংযোগ করলে। বংশী পড়ে চলেছে তখনো।

পাইপে কয়েকটা টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া নিয়ে রিং করতে শুরু করে।

পুবের খোলা জানালাপথে খানিকটা রৌদ্র ঘরের মেঝেতে এসে লুটিয়ে পড়েছে, ভদ্রলোক একটা চেয়ার টেনে নিয়ে উপবেশন করে।

বংশী নাগ যদি নিজের তাগিদেও একান্তভাবে এই সময় ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে আসত, তিনি জানতেন রোমাঞ্চ কাহিনীর উত্তেজনা থেকে মন সরিয়ে এ সময় বংশী নাগ কথা বলতো না। তা সে জরুরী ও যত প্রয়োজনীয়ই হোক না কেন। আর এ তো তারই কাজ।

কাজেই অপেক্ষা করতে হবে আপাততঃ। ভদ্রলোক কি আর করে, অপেক্ষা যখন করতেই হবে, ভৃত্য করালীচরণকে ডেকে চা দিতে বললে।

আরো কিছুক্ষণ পরে করালীচরণ দু'কাপ চা নিয়ে ঘরে এসে যখন ঢুকল, বংশী হাতের বইখানা মুড়ে পকেটে রাখতে রাখতে বললে, মাই গড্! ডেনজারাসলি উনডেড্! শালা বাঁচবে না— আরে এ যে গরম চা! করালীচরণ is a nice fellow!

বংশী অনুরোধের কোন অপেক্ষামাত্র না করে নিজেই এগিয়ে এসে একটা চায়ের কাপ তুলে নিয়ে বেশ আরাম করে তাতে চুমুক দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখ বিকৃতি করে ওঠে।

কি হলো হে বংশীবাবু?

করালীচরণের sugarয়ের হাতটা বিশেষ রকম পরিমিত!

কি করবে বল? কন্ট্রোলের চিনি—

মাই গড্! Again that blessed মুখোশ on your face মিস্টার?

এতক্ষণে ভদ্রলোকের মুখোশের প্রতি বোধ হয় বংশীর নজর পড়েছিল।

বলা বাহুল্য, ভদ্রলোক বংশীর সঙ্গে মুখোশ আঁটা মুখেই পরিচিত।

জান তো বংশীবাবু, একটা কথা আছে না— স্বভাব যায় না মলে, ইজ্জত যায় না ধুলে!

মাই গড্! কিন্তু যাই বলুন, বেশ একটা রোমাঞ্চও অনুভব করি আপনার মুখে ঐ মুখোশটি দেখলেই। তাছাড়া মনে মনে কতকটা স্বস্তিও পাই—

BanglaBook.org

স্বস্তি পাও! কেন বল তো?

ঐ মুখোশটা আপনার মুখে আঁটা আছে বলে! মানে—মানে পনের আনা পৃথিবীর লোকই তো মুখে মুখোশ আপনার মত না এঁটে থাকলেও অদৃশ্য মুখোশই পরে থাকে।

তাই বুঝি?

তাছাড়া কি আর বলুন? শালাদের মুখে এক মনে এক— All hypocrites!

মানুষের সম্পর্কে আজকাল তোমার এই ধারণাই হয়েছে নাকি?

মাই গড্! চা'টা ফুরিয়ে গেল— pure yellow Darjeeling মনে হচ্ছে!

আনান স্যার— আর এক কাপের নির্দেশ দিন!

মৃদু হেসে ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বলে, করালী, বংশীবাবুকে আর এক কাপ চা দিয়ে যা। চিনিটা একটু বেশী করে দিস।

অ্যাঁ, কি বলছিলেন। মানুষের কথা। হ্যাঁ, আমার মতে সব hypocrites! অবশ্য সকলে মুখে মুখোশ আঁটে না, দু'টি লোক ছাড়া—

একজন তো আমি! দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে?

কেন আমাদের বোস সাহেব!

বোস সাহেবও বুঝি মুখোশ পরে থাকতেই আমার মত ভালবাসেন?

হ্যাঁ। তবে আপনার আর বোস সাহেবের একটু তফাৎ আছে। তিনি একটি নয়, জোড়া মুখোশ পরে থাকেন।

অর্থাৎ?

উপরের মুখোশ যেটি মুখে আঁটা থাকে প্রভুর সেটা তবুও বোঝা যায়, কিন্তু তার তলায় যে নিজস্ব অদৃশ্য একটি মুখোশ আছে— he himself ও বোধ হয় সে মুখোশটি চেনেন না!

ভদ্রলোক হাসতে থাকে।

হাসছেন স্যার? হাসুন। বংশীধর নাগ চোরা কালো পথে আনাগোনা করে বটে, but without wearing any মুখোশ! এবং সত্যি কথাই বলবো, মুখোশের ব্যাপারটা বেশ interesting মনে হলেও কারো মুখে মুখোশ আঁটার যে মিস্ট্রিটা, বংশী নাগের ধাতে যেন ঠিক সয় না। চুরি করবো, ডাকাতি করবো, খুন করবো, পাচার করবো— স্রেফ নিজের স্বার্থেই করবো and with courage! কাজগুলো বেআইনী যখন, বুদ্ধি খাটিয়ে আইন বাঁচিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে করতে হবে। No risk no gain! আবার মুখোশ আঁটাআঁটি কেন রে বাবা! সাধু সেজে থাকবো, অথচ চোরা-গোপ্তা চালাবো এ hypocricy কেন?

করালীচরণ আবার চা নিয়ে এলো।

বংশী চায়ের কাপটা নিয়ে সাগ্রহে চায়ের কাপে চুমুক দেয়।

তারপর বংশীবাবু, What about your decision? কি ঠিক করলেন? আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখেছিলে?

মাই গড্! ভেবে দেখেছিলাম মানে? কদিন ধরে অনবরত ভাবছিলাম। ও শালা চিন্তাভূত সিন্ধবাদ নাবিকের সেই পাহাড়ী ভূতের মত। ঘাবড়ে দিয়েছিল স্যার, রীতিমত ঘাবড়িয়ে দিয়েছিল! মনে হচ্ছিল প্রাক্তন ও মৃত বংশীধর নাগের কিছুটা বোধ হয় এখনও অবশিষ্ট আছে, but I am safe now— ও শালার ভূতকে কাঁধ থেকে ঝেঁটিয়ে নামিয়েছি, একেবারে ঝাঁটা পেটা করে!

তা'হলে—

BanglaBook.org

নাঃ স্যার, সুবিধা হলো না। বংশীধর নাগ এক কথার মানুষ। বিপদের দিনে বোস সাহেব আমাকে সাহায্য করেছেন, I can't betray Mr. Bose! No, no!

হঠাৎ যেন বংশীর কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হয়, আপনাদের তথাকথিত সভ্য সোসাইটি, শিক্ষিত সমাজ— তারা আমার মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। একজন ক্ষুধার্ত শিক্ষিত ভদ্রবংশীয় নিরীহ প্রকৃতির যুবক অনাহারে তৃষ্ণায় দু'হাত পেতে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চেয়েও এতটুকু কৃপা পায়নি। কেন—কেন? তাদের একজনের পাশে যদি আমার এতটুকু মাথা গোঁজবার মত জায়গা সেদিন মিলত ক্ষতি তাতে কার কতটুকু হতো! After all আমার কি সে right বা দাবী আপনাদের সকলের কাছে—আপনাদের so-called societyর কাছে ছিল না?

ছিল বৈকি ভাই।

No, no—not that soft tone। আর্তস্বরেই কতকটা যেন বংশী চীৎকার করে ওঠে, বংশী নাগ is dead! Stone-dead! এ আর কঙ্কাল। শুষ্ক প্রাণহীন কঙ্কাল মাত্র। আপনাদের দেওয়া ব্যবস্থামতই আজ বংশী নাগ সুখী— তৃপ্ত।

বংশী।

না, না— আজ আর তা হয় না মিস্টার। I like you! I encourage you—no, no I can't betray Mr. Bose! বোসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না।

বিশ্বাসঘাতকতা করতে তো আমিও তোমাকে বলিনি বংশীবাবু! আমি শুধু সংবাদটা চাই। তুমি তো আর সে ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নও। তবে তোমার নীতিতে বাধে কেন?

প্রত্যক্ষভাবে আমি সে ব্যাপারে জড়িত না থাকলেও, বোসের সঙ্গে আমি পরিচিত। তার স্বার্থে আঘাত লাগে এমন কোন কাজই আমি করতে পারি না।

বেশ, একটা কথা নিশ্চয়ই তুমি স্বীকার করবে— দেশের এত বড় ক্ষতি সর্বনাশ করবার দেশের কারো কোন ব্যক্তিরই অধিকার নেই। না— তোমাদের কোন অধিকার নেই।

That's not my look out! জিঞ্জার মার্চেন্ট আমি, শিপের সংবাদে আমার কি হবে!

বংশী, অন্য কোন লোক হলে আমি টাকা অফার করতাম। কিন্তু তোমাকে আমি সামান্য পরিচয়েই চিনতে পেরেছি, তাই আবার তোমাকে অনুরোধ জানাচ্ছি— সংবাদটা আমাকে দিতে পার কি না আর একবার ভেবে দেখো।

দেখুন মিস্টার— আমার উপরে এভাবে অত্যাচার করবার আপনার কোন অধিকার নেই। No, no—you have no right! মাই গড্ you are really dangerous! চললাম স্যার। গুড্ ডে!

বংশী নাগ হঠাৎ উঠে পড়ে হন্‌হন্ করে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

হঠাৎ অমন আকস্মিকভাবে বংশী নাগ ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় ভদ্রলোক যেন কতকটা বিহ্বল হয়েই চেয়ারটার উপরে বসে থাকে।

॥ ৩ ॥

শশাংকর ওখানে।

চা-পান শেষ হতে না হতেই দরজার কলিং বেলটা ক্রি-রিং করে বেজে ওঠে!

আঃ! এই সক্কালে আবার কে জ্বালাতন করতে এলো! স্বরূপ আপন মনেই খিঁচিয়ে ওঠে।

BanglaBook.org

যা যা, দেখ্ বোধ হয় সুব্রতবাবুই হবেন বা—শশাংক বলল।

নাঃ, এই সক্কালে পারবো না বাপু আমি—

আঃ, কি হচ্ছে স্বরূপদা? যা যা, ভদ্রলোক হয়ত দাঁড়িয়ে আছেন।

অগত্যা স্বরূপকে নীচে দরজা খুলতে যেতেই হয়।

সুব্রতবাবুই।

স্বরূপের পিছু পিছু সুব্রতই এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

আসুন, আসুন সুব্রতবাবু—বসুন।

তারপর—নির্দিষ্ট চেয়ারটার উপরে বসতে বসতে সুব্রত বললে, কাল রাত্রে হঠাৎ মিঃ সান্যালের ওখানে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে অমন করে ডুব দিয়েছিলেন কোথায় অকস্মাৎ বলুন তো?

গত চব্বিশ ঘণ্টায় অনেক কিছুই ঘটে গিয়েছে সুব্রতবাবু। সব আপনাকে বলছি। আপনি এখন নিজে না এলে আমাকেই যেতে হতো হয়ত।

ব্যাপার কি বলুন তো?

শশাংক তখন সংক্ষেপে গত চব্বিশ ঘণ্টার যাবতীয় খুঁটিনাটি ঘটনা একে একে সুব্রতর গোচরীভূত করে।

সুব্রত নিঃশব্দে বসে শুনে গেল, কোন বাধা দিল না।

নিজের বিবৃতি শেষ করে শশাংক বলে, সেই মুখোশ পরা ভদ্রলোকও আপনার পরামর্শ নিতেই বলেছেন। এমন কি দিগেনবাবুও।

আপনার যদি বিশেষ কোন অসুবিধা না হয় শশাংকবাবু—তাহলে চলুন একবার দিগেনবাবুর বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। তার কাছে আপনার কাকা ডাঃ অজয় মিত্র সম্পর্কে আরো অনেক কথা জানবার আছে। তারপর সকলে মিলে পরামর্শ করবো এখন কি করা যেতে পারে।

বেশ। তাহলে আপনি এই ঘরে একটু অপেক্ষা করুন, আমি চট্ করে কাপড়টা বদলে আসি।

যান। দেরি করবেন না বেশী।

না— এখুনি তৈরী হয়ে আসছি।

শশাংকর মুখে গত চব্বিশ ঘণ্টার সমস্ত কাহিনী শুনে সুব্রতর মনের মধ্যে একটা উত্তেজনার স্রোত যেন বইতে শুরু করে।

নীলিমা দেবী! কে এই নীলিমা দেবী! তারপর মুখোশধারী উপচিকীর্ষু ঐ ভদ্রলোকটি! তিনি—তিনিই বা কে? কি তাঁর পরিচয়? রহস্য যেন হঠাৎ আরো ঘনীভূত হয়ে এলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শশাংক তৈরী হয়ে এলো। বললে চলুন। আমি তৈরী সুব্রতবাবু।

বাইরে সুব্রতর গাড়ি পার্ক করা ছিল। দু'জনে এসে গাড়িতে উঠে বসে। সুব্রত গাড়িতে স্টার্ট দিল। কিন্তু রহস্য যে ইতিমধ্যে আরো কতখানি গভীর হয়ে উঠেছে সুব্রত বা শশাংক কেউ তা স্বপ্নেও ভাবেনি।

ভাবতে পারেনি।

শ্যামপুকুরে দিগেন সান্যালের বাড়িতে এসে দারোয়ানের মুখে সংবাদ পেল, দু'জনেই হঠাৎ সে সংবাদে থ' বনে দাঁড়িয়ে গেল।

গতকাল মাত্র সন্ধ্যার দিকে যে লোকটা—বাবু অর্থাৎ দিগেন সান্যাল নামে পরিচয় দিয়ে এ বাড়িতে এসে উঠেছিল আসলে সে বেটা নাকি দিগেন সান্যালই নয়—স্রেফ ডাকু!

BanglaBook.org

আজই শেষরাত্রের দিকে একদল পুলিস এসে তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। এবং তারাই বাড়ির দরজায় তালা লাগিয়ে গিয়েছে। এবং পুলিসের হুকুম বাড়ির মধ্যে কেউ ঢুকবে না।

সিঁড়ির কোলাপসিবিল গেটেই প্রথম তালা পড়েছে। মজবুত এবং বেশ ভারী জার্মান তালা।

শশাংক বোকার মতই হাঁ করে যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

দারোয়ান বলে, ভিতর যানেকো হুকুম নেহি হ্যায়, তালা খোল্‌নেকো ভি হুকুম নেহি হ্যায়।

মোক্ষম দু'টি আদেশ জারী করে দণ্ডায়মান সুব্রত ও শশাংককে পোর্টিকোর নিচে না যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় রেখে নিজের ডেরায় গিয়ে ততক্ষণ আবার প্রবেশ করেছে দারোয়ান।

দ্রুত চিন্তা একটার পর একটা সুব্রতর মনকে মন্থন করে চলেছে। নিঃশব্দে স্থাণুর মত শশাংকর পাশটিতে দাঁড়িয়ে থাকলেও মন তখন তার তীব্র ভাবে সক্রিয়। দিগেন সান্যাল নামে পরিচয় দিয়ে যে ব্যক্তি গত সন্ধ্যায় মাত্র প্রবাস হতে ফিরে এ গৃহে প্রবেশ করেছিল তিনি পুলিস কর্তৃক বিতাড়িত। পুলিস তাকে কারাগারে নিয়ে গিয়েছে জাল সনাক্ত করে।

পুলিস! পুলিস তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে এবং বাড়িতে তালা লট্‌কে দিয়ে গিয়েছে অথচ শশাংক গতকাল সকালেই এখানে আসবার নিমন্ত্রণ পেয়েছিল দিগেন সান্যালের চিঠির মারফৎ!

চকিতে অন্ধকারে যেন একটা আলোর ঝাপটা এসে পড়ে। বিমূঢ় সুব্রত চম্‌কে যেন ঘুম হতে জেগে ওঠে।

তাই তো!

পুলিস লোকটিকে জাল বলে ধরেই যদি নিয়ে গিয়ে থাকে—থানাতেই নিয়ে গিয়েছে। এবং থানা হতেই সমস্ত সংবাদ চেষ্টা করলে এখনি তো পাওয়া যেতে পারে।

তাছাড়া এই বাড়ির চাকর, দরোয়ান ইত্যাদি এরাও কি তাদের মনিবকে চিনতে পারে নি। লোকটা সত্যি যদি জাল হবে—এতগুলো লোকের চোখে ধুলো দিয়ে সক্ষম হলোই বা কি করে?

আরো একটা কথা, পুলিশ এ বাড়ি থেকে দিগেন সান্যালকে ধরে নিয়ে যাবার পর দরজায় তালা লট্‌কে গেল অথচ একজন পুলিসও মোতায়েন করে গেল না।

না না—এ সম্ভব হতে পারে না। সম্ভব হতে পারে না।

ব্যাপারটা যেন কেমন আগাগোড়াই সন্দেহ-যুক্ত বলে মনে হচ্ছে।

চকিতে ফিরে দাঁড়ায় সুব্রত, শশাংকবাবু!

অ্যাঁ!

চলুন— এখুনি থানায় যাবো। The whole thing seems to be fishy! না-না— আর দেরি নয়। চলুন—চলুন।

শশাংককে কোন কথা বলবার বা প্রতিবাদ জানাবার সুযোগমাত্রও না দিয়ে একপ্রকার যেন টানতে টানতেই সুব্রত শশাংককে নিয়ে নিজের গাড়িতে এসে উঠে বসে আবার।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সোজা সে গাড়ি শ্যামপুকুর থানার দিকে ছোটাল।

থানা খুব কাছেই। থানায় পৌঁছাতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। থানায় প্রবেশ করে বড়বাবুর খোঁজ করতেই দারোয়ান বললে, বড়বাবু বাইরে গিয়েছেন কিছুক্ষণ আগে— ছোটবাবু আছেন।

ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা করে সুব্রত নিজের পরিচয় দিতেই তিনি সাদর আহ্বান জানান সুব্রতকে, আসুন, আসুন। বসুন মিঃ রয়।

সুব্রত সংক্ষেপে তার বক্তব্য পেশ করলে, কাল এই এলাকায় শ্যামপুকুর স্ট্রীটের—নং বাড়িতে এমন কিছু ঘটেছে জানেন?

BanglaBook.org

ভদ্রলোক সুব্রতর কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। সে আবার কি, কাল রাত্রে তো আমিই ডিউটিতে ছিলাম। এবং মিঃ সান্যাল ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশ ভাল পরিচয়ই আছে আমার। তাছাড়া শুনেছি গতকাল সকালে তিনি নিজে নাকি এখানে এসেছিলেন বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে—অনেকক্ষণ ধরে কত কথাও নাকি হয়েছে তাঁর সঙ্গে!

গতকাল তাহলে আপনার সঙ্গে দিগেন সান্যালের দেখা হয়নি?

না, বড়বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে।

আচ্ছা আপনি বলতে পারেন, বড়বাবু তাকে চিনতেন কিনা?

তা তো বলতে পারি না। তিনি নতুন এখানে বদলি হয়ে এসেছেন। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো?

বুঝতে পারছি— শয়তানরা একটা dirty trick খেলেছে।

অ্যাঁ, কি বললেন?

না, বিশেষ কিছু না—সুব্রত চট্ করে কথাটা চেপে যায়।

শশাংকর দিকে তাকিয়ে বললে, চলুন শশাংকবাবু—এখুনি একবার লালবাজার হেড কোয়ার্টারে গিয়ে পুলিসের বড়কর্তার সঙ্গে দেখা করতে হবে। চলুন—time is short! আচ্ছা বিনয়বাবু, informationয়ের জন্য ধন্যবাদ।

বসবেন না সুব্রতবাবু? বড়বাবু হয়ত এখুনি এসে পড়বেন।

না বিনয়বাবু, বড়বাবুকে বলবেন আজ সন্ধ্যার দিকেই আবার হয়ত এদিকে আসতে পারি। তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

সুব্রত বেশ দ্রুতপদেই থানা হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এসে গাড়িতে উঠে বসে।

বিস্মিত শশাংক ব্যাপারটা ঠিক ভাল করে বুঝে উঠতেও পারে না। কেবল একটা কথা বুঝতে পেরেছে, দিগেন সান্যালকে নিয়ে বেশ একটা গোলযোগ পাকিয়ে উঠেছে।

রহস্য বিশেষভাবে ঘনীভূত।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সোজা গাড়ি ব্যাক করে মুহূর্তে সুব্রত নয়া রাস্তার উপরে এসে পড়ল। এবং নয়া রাস্তায় পড়েই গাড়ি তীব্রগাতিতে ছুটলো লালবাজারের দিকে।

॥ ৪ ॥

লালবাজারে সুব্রতর গাড়ি যখন এসে পৌছাল বেলা তখন প্রায় সাড়ে নটা।

সুব্রত কমপাউণ্ডের একধারে পুলিশ ভ্যানগুলোর পাশে গাড়িটা পার্ক করে শশাংককে নিয়ে গাড়ি থেকে নামল, চলুন মিঃ মিত্র।

তিনতলায় ডি সি মিঃ স্মিথের অফিস।

সুইং ডোরের এধারে যে আর্মড পুলিসপ্রহরী দাঁড়িয়েছিল, সুব্রতকে সে বেশ ভালভাবেই চেনে। নাম তার তৈমুর। একগাল হেসে তৈমুর সুব্রতকে সম্বর্ধনা জানায়, ভাল আছেন তো স্যার! অনেকদিন দেখিনি আপনাকে—

সাহেব ভিতরে আছেন তৈমুর?

হ্যাঁ।

একবার খবর দাও।

BanglaBook.org

তৈমুর তখনই ভিতরে চলে গেল এবং তৈমুরের আগে আগে একটু পরেই স্বয়ং স্মিথ সাহেব সুইংডোর ঠেলে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে স্মিতভাবে সম্বর্ধনা জানায়, হ্যালো রয়! Good old boy, why waiting outside? Come in please!

সুব্রত স্মিথের সঙ্গে সঙ্গে কামরার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে।

please do sit down ! তারপর রয়— what's the big news? চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললে, তোমার বন্ধুদের তুমি ভুলে গিয়েছো।

ভুলিনি মিঃ স্মিথ। তোমাদের সঙ্গে সে আনন্দের দিনগুলো সে তো ভোলবার নয়! তবে সময় পাই না। জানই তো অলস জীবনে সময়ের একান্তই অভাব হয়।

কেন তুমি চাকরি ছেড়ে দিলে রয়?

ভাল লাগলো না। যাক্ গে সে কথা। একটা বিশেষ জরুরী কাজে তোমার কাছে এসেছি মিঃ স্মিথ।

Well–Well! I am always at your service! বল কি শুনি?

It's a long story. সংক্ষেপে তোমাকে বলছি শোন।

সুব্রত তখন বলতে শুরু করে ঃ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ অজয় মিত্রের নাম নিশ্চয়ই তুমি শুনেছো! তিনি বহুদিন ধরে তাঁর বাড়ির বিজ্ঞানাগারে তাঁর এক বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে মিলে ফাংগাসের'র উপরে একটা গবেষণা করছিলেন। আসলে ব্রেনটা ছিল ডাঃ মিত্রেরই— বন্ধুটি ছিল তাঁর কর্মে ও গবেষণায় সহায়ক অর্থাৎ অ্যাসিস্ট করত। দীর্ঘকাল ধরে রাত্রিদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে ডাঃ মিত্র এমন একটি ঔষধ আবিষ্কার করলেন, যার দ্বারা যে কোন বিষাক্ত পচন ও কোন কোন কক্কাই ও ব্যাসিলাইজানিত দুর্দান্ত ব্যাধিকে অতি দ্রুত নিরাময় করা যেতে পারে। আবিষ্কারটি নিয়ে জনসাধারণের সামনে দাঁড়ানোর পূর্বে তাঁর ইচ্ছা হলো, ইউরোপের বিদগ্ধ সমাজের গুণী ও জ্ঞানীদের সামনে তাঁর গবেষণা নিয়ে একটা আলোচনা করবেন ও ঐ আবিষ্কার সম্পর্কে লণ্ডনে একটা থিসিস্ পেশ করবেন। কাগজপত্র প্রায় সব তৈরী, গবেষণার কতগুলো জটিল অঙ্কশাস্ত্রের ব্যাপার নিয়ে তিনি তখন বিশেষ ব্যস্ত—এমন সময় ঐ যে সহকারী বন্ধুটি, হঠাৎ তার বন্ধুত্বের আড়াল হতে একটা কুৎসিত বীভৎস লোলুপ শয়তান আত্মপ্রকাশ করলো—

সে কি! শেষ পর্যন্ত বন্ধু যে—

হ্যাঁ। কিন্তু আত্মভোলা সরল বিশ্বাসী ডাক্তার তার বিন্দুবিসর্গও জানতে পারলেন না। অর্থাৎ তাঁর সেই সরল বিশ্বাসের আড়ালে আড়ালে ঐ শয়তান, যে বন্ধুর এতদিনের পরিশ্রমলব্ধ গবেষণাটি আর একদল শয়তানের সঙ্গে যোগসাজস করে বহু অর্থের বিনিময়ে বিদেশের কাছে বিক্রয় করবার জন্য বদ্ধপরিকর হচ্ছে—এক্সপেরিমেন্টের সব কিছুই সে জানত, ঘটনাচক্রে ডাক্তার মিত্র হঠাৎ ঐ সময় সন্দেহক্রমে সজাগ হয়ে উঠলেন। বন্ধুটি তখন কয়েকদিন ধরে অনুপস্থিত।

একটা চিঠি হতেই সন্দেহটা জেগেছিল। কিন্তু একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার যখন ব্যাপারটা টের পেলেন বন্ধুটি তখন সিংগাপুরে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। ডাক্তার তখন মরীয়া হয়ে উঠেছেন, তিনিও তখন সিংগাপুর যাত্রা করলেন। এবং যাবার পূর্বে তাঁর অ্যাটর্নীকে সব কথা জানিয়ে, সাংকেতিক তালা লাগিয়ে একটা আয়রন সেফে আসল কপির ১/৩ অংশ ও অন্য একটা আলমারিতে একটা বইয়ের মধ্যে বাকী ১/৩ অংশ রেখে গেলেন। বাকী ১/৩ অংশ সেই বন্ধুটি ইতিমধ্যে সরিয়ে দিয়েছিল। ডাক্তার কিন্তু সিংগাপুর যাত্রার পূর্বে ঐ সাংকেতিক তালা খুলবার

BanglaBook.org

সংকেতটা বলে গেলেন না তাঁর অ্যাটর্নীকে। শুধু বলে গেলেন প্রয়োজন হলে সেই সংকেতটা তিনি সময়ে জানাবেন, আর যদি না ফিরে আসেন তাহলে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি তাঁর একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র পাবেন, এই শশাংকবাবুই। যদিও অ্যাটর্নী ডাঃ মিত্রের বহুকালের বন্ধু, তথাপি তালা খোলবার যে সংকেতটা তাঁকে জানাননি তার কারণ হয়ত একবার এক বন্ধুর কাছ হতে আঘাত খেয়ে অন্যান্য বন্ধুদেরও হয়ত মনে মনে তখন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এবং সেটা এক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক।

তারপর?

তারপর—তার পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। কিছুদিন বাদে, যুদ্ধের তখন খুব সঙ্গীন অবস্থা—সিংগাপুর ফল করার ঠিক কিছু আগে এভ্যাকুইর দল সিংগাপুর ছেড়ে দলে দলে চলে আসছে, ডাক্তারের অ্যাটর্নী বন্ধু তাঁর ক্লায়েন্টের কাছ হতে সিংগাপুর যাবার জন্য হঠাৎ এমন সময় একটা জরুরী তার পেলেন।

তার পেয়ে নিশ্চয়ই অ্যাটর্নী সিংগাপুর গেলেন?

হ্যাঁ। কিন্তু সিংগাপুর পৌঁছে আর অ্যাটর্নী তাঁর ডাক্তার বন্ধুর কোন পাত্তাই পেলেন না দুটো দিন। এবং খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত নাকি আবিষ্কার করেন বন্ধুটি দিনসাতেক আগে কোন এক অদৃশ্য আততায়ীর দ্বারা ভীষণভাবে জখম হয়ে হাসপাতালে মারা গিয়েছে। এ দুটো দিন তিনি হোটেলেও থাকেন নি। বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বন্ধু যে হোটেলে ছিলেন সেই হোটেলেও ফিরে এসে সেখানকার ম্যানেজারের হাতে পেলেন একখানা চিঠি। বন্ধুর শেষ চিঠি। এবং সেই চিঠিতেই ছিল তাঁর শেষ নির্দেশ—

কিন্তু সেই সায়েনটিস্টকে খুন করলে কে?

এখনো সল্‌ভ্ করা যায়নি। তবে এটা ঠিকই— এবং ঘটনাচক্রের দ্বারাও অনুমান হয়, যে গ্যাঙ্ ঐ গবেষণার কাগজপত্রগুলো হাতাবার চেষ্টা করছিল এ তাদেরই কীর্তি। যাক্, এদিকে ডাক্তারের আয়রন সেফ্ খুলবার সংকেতটা Ace of Spades কেমন করে না-জানি গ্যাঙ্ টের পেয়ে যায়। এবং একই সময়ে শশাংকবাবুও সংকেতটি জানতে পারে। ডাক্তারের নারকেলডাঙ্গার বাড়ি থেকে বিপক্ষ দল পৌঁছবার আগেই একস্‌পেরিমেন্টের ১/৩ অংশ কপিটা আয়রন সেফ্ হতে সরিয়ে ফেলেন এবং প্রকৃতপক্ষে ঘটনার এইখান হতেই এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে যোগাযোগ হয়—

তারপর?

সুব্রত বাকী অংশটুকু এবারে আরো সংক্ষিপ্তভাবে মিঃ স্মিথের নিকটে বিবৃত করে গেল, দিগেন সান্যালের রহস্যজনকভাবে গতকাল শেষরাত্রে পুলিসের ছদ্মবেশধারী দুর্বৃত্ত কর্তৃক—যেটা সে ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছিল—অপহৃত হওয়ার ব্যাপারটা পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা।

সুব্রত বলে, একটা মস্ত বড় গ্যাঙ্ এদের দলপতি এবং যে সাধারণতঃ নিজের পরিচয় দেয় 'নেকড়ের থাবা' বলে।

নেকড়ের থাবা!

হ্যাঁ। লোকটার খুন করবার পদ্ধতিটাও বিচিত্র। শিবাজীর গোপন অস্ত্র যেমন 'বাঘনখ' ছিল, এরও তেমনি একটা অস্ত্র আছে যাকে দলের লোকেরা বলে থাকে—'নেকড়ের থাবা'। এবং দলপতিকেও ঐ নামেই সকলেই জানে।

Interesting!

BanglaBook.org

হ্যাঁ। সত্যি Interesting! 'নেকড়ের থাবা' নামটাই যেন একটা মিস্ট্রি। দীর্ঘদিন ধরে ঐ নামটার পিছনে পিছনে আমি ঘুরছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত ঐ নামধারী আসল আদি ও অকৃত্রিম ব্যক্তিটির কিনারা আমি করে উঠতে পারলাম না।

বল কি রায়, এ যে অত্যাশ্চর্য ব্যাপার!

অত্যাশ্চর্যই বটে! 'নেকড়ের থাবা' আজ ক্রাইম জগতের যেন একটা ভীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তারপর একটু থেমে বলে, আলেয়ার মত একটা সত্য-মিথ্যায় জড়ানো মিস্টিরিয়াস ব্যাপার! হয়ত এমনও হতে পারে, এবারে যে 'নেকড়ের থাবা' নামে পরিচয় দিচ্ছে সেও আসল নয়, বহু মেকী 'নেকড়ের থাবা'রই সমগোত্র একজন।

তাহলে আসল ও সত্যকারের ব্যাপারটা তোমার কি বলে মনে হয় রয়?

সমস্ত ব্যাপারটাই এত foggy যে কোন স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পারছি না। শশাংকবাবুর ব্যাপারে কতকটা প্রথমে আমি অলস মুহূর্তের কৌতূহলের বশেই interest নিয়েছিলাম, কিন্তু ঐ বিশেষ নামটি যে মুহূর্তে আমার কানে এসেছে, আমার ইন্‌টারেস্ট যেন হাজার গুণে বেড়ে গিয়েছে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, ঐ নেকড়ের থাবা'র মিস্ট্রি যেমন করে যে উপায়ে হোক এবার solve করবোই। একই নামে কতকগুলো লোকের পরিচয় একটা illusion গড়ে উঠেছে, না সত্যিই একজন লোক দশজন লোককে ঐ নামে খাড়া করে নিজে অন্তরালে আত্মগোপন করে থেকে এই সব সাংঘাতিক ক্রাইম করে যাচ্ছে একটার পর একটা!

আমার কি মনে হচ্ছে জান রয়?

কি?

আসলে তোমার ঐ নেকড়ের থাবা' নামে সত্যিকারের কোন particular Personই হয়ত নেই!

হয়ত তোমার অনুমান সত্য হতে পারে— আবার নাও হতে পারে মিঃ স্মিথ। তা সে যা হোক, আমি তোমার full co-operation চাই এ ব্যাপারে।

নিশ্চয়ই by all means তুমি পাবে!

॥ ৫ ॥

চিৎপুর রোডের একটা চারতলা বহু পুরাতন বাড়ি। বাড়িটার নীচের তলায় তিনটি লুঙ্গি ও টুপির দোকান। দোকানের মালিক সবাই পাঞ্জাবী মুসলমান। বাড়িটার দোতলায় তিনটি ফ্ল্যাট—তিনটি পশ্চিমী মুসলমান পরিবার ফ্ল্যাট তিনটিতেই থাকে।

তিনতলায় একটি ফ্ল্যাট।

সম্পূর্ণ ফ্ল্যাটটি নিয়ে থাকে তিনটি লোক।

একজন তাদের মধ্যে বাঙালী হিন্দু। লোকটার বয়েস হয়েছে—পঞ্চাশ প্রায় পার হতে চলেছে। রোগা হাড়গিলে প্যাটার্নের হাড়সর্বস্ব দীর্ঘ দেহ, একটু কুঁজো হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটা অভ্যাস।

গায়ের বর্ণ গোরাদের মত উজ্জ্বল টক্‌টকে। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা— কাঁচায়-পাকায় মিশানো। মুখটা লম্বাটে ধরনের, দীর্ঘ উন্নত নাসা, দৃঢ় চৌকো চোয়াল, ডানদিকের গালে ডান চক্ষু

BanglaBook.org

হতে চোয়াল পর্যন্ত দীর্ঘ বিশ্রী একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। বার্মিজদের মত ছোট ছোট গোল চক্ষু। চক্ষুর কণীনিকা ক্ষুদ্র। দাঁতগুলো বড় বড়, কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে নিকোটিনের কালো দাগ।

পরিধানে বেশীর ভাগ সময়ই থাকে সিল্কের ঢোলা পায়জামা—গায়ে একটা অনুরূপ সিল্কের ঢোলা পাঞ্জাবী। পায়ে ঘাসের বার্মিজ চটি।

লোকটির নাম নিশিকান্ত চৌধুরী বলেই তার পরিচিতজনেরা জানে। এবং নিশিকান্তই সমস্ত বাড়িটার মালিক। দোকনঘর ও অন্যান্য ফ্ল্যাট নিয়ে চার-পাঁচ ঘর ভাড়াটিয়া তারই।

দ্বিতীয় লোকটি হচ্ছে ইরসাদ। জাতিতে মুসলমান হলেও বাঙালী ও বর্মীর রক্তের একটা মিশ্রণ আছে দেহে। আকারে বেঁটে, ছোট ছোট চোখ—দৃঢ়বলিষ্ঠ গঠন, গাত্রবর্ণ তামাটে। বয়েস চল্লিশ পার হয়ে গিয়েছে বলেই মনে হয়।

নিশিকান্তর ভৃত্যের কাজ করে ইরসাদ।

তৃতীয়টি পুরুষ নয়—নারী। জাতে বর্মী—পরিচয় ইরসাদের স্ত্রী। অন্ততঃ লোকে তাই বলে জানে। দীর্ঘকাল বাংলাদেশে বাস করার দরুন চমৎকার বাংলা কথা বলতে পারে মেয়েটি। বয়সে ইরসাদের সমবয়সী, কিন্তু চেহারা দেখে আদপেই সেটা বোঝবার উপায় নেই। দেহের কমনীয়তা ও লাবণ্য এখনও অটুট আছে—আছে চোখের বিলোল চাউনি। মেয়েটির নাম কিটি।

নিশিকান্ত নির্বাক প্রকৃতির লোক।

ইরসাদ চব্বিশ ঘণ্টাই আপন মনে বকর বকর করে। ওটা ওর স্বভাব।

কিটি এমনিতে বেশ ধীরশান্ত, কিন্তু হঠাৎ এক-একদিন রাত্রে মেয়েটার মাথায় যেন খুন চাপে। থেকে থেকে চিৎকার করে ওঠে চিলের মত তীক্ষ্ণ ধারালো কণ্ঠে এবং হাতের কাছে কেউ এলে বড় বড় নখ দিয়ে আঁচড়ে খিমচে একেবারে রক্তাক্ত করে দেয় তাকে। ওকে তখন আর নারী তো নয়ই, মানুষ বলেই মনে হয় না। মনে হয় যেন একটা হিংস্র বাঘিনী। কিটির পাগলামিটা সাধারণতঃ অমাবস্যার রাত্রেই যেন বৃদ্ধি পায় গঙ্গার জোয়ার-ভাঁটার মত।

পাগলামিটা যখন খুব বেশী বাড়ে নিশিকান্তর গম্ভীর গলা শোনা যায়, ইরসাদ!

হন্তদন্ত হয়ে নিশিকান্তর ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়।

কিটিকে এই ঘরে দিয়ে যা ইরসাদ!

নিশিকান্তের আদেশ শুনে কেন জানি ইরসাদের মুখে একটা বিষণ্ণ কাতর ছায়া নেমে আসে। ঠোঁট দুটো অকারণে কাঁপতে থাকে।

যা, হারামজাদীকে নিয়ে আয়।

ইরসাদ হয়ত তবু চুপ করে মাথা নীচু করে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকে।

বাঘের মত গর্জে ওঠে এবারে নিশিকান্ত, এই উল্লুক, কানে কথা যাচ্ছে না—না?

এবারে সভয়ে এক-পা এক-পা করে পিছন দিকে হাঁটতে হাঁটতে ইরসাদ নীচে যে ঘরে কিটি পাগলের মত গর্জাচ্ছে সেই ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে।

কিটির তখনকার অবস্থা সত্যিই ভয়ংকর। হাতের কাছে যা পায় ছুঁড়ে ভেঙে তছনছ করে সব ছত্রখান করে দিচ্ছে।

ইরসাদ প্রথমে কিটিকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে, কিন্তু আঁচড়ে কামড়ে কিটি ইরসাদকে অস্থির করে তোলে।

উপর থেকে আবার গম্ভীর আদেশ ভেসে আসে, ইরসাদ!

প্রবলভাবে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে কিটি তীব্র সক্রিয় প্রতিবাদে।

BanglaBook.org

অসুরের মত শক্তি ইরসাদের শরীরে। সক্রিয় বাধা সত্ত্বেও ইরসাদ অবলীলাক্রমে কিটিকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে নিশিকান্তর ঘরের মধ্যে এনে নামিয়ে দেয় ভয়ে ভয়ে।

যা, তুই বাইরে যা! তীক্ষ্ণকণ্ঠে নিশিকান্ত আদেশ দেয়।

ইরসাদ ঘর হতে ভয়ে ভয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

নিশিকান্ত এবার দেওয়ালে টাঙানো একটা চামড়ার চাবুক টেনে হাতে নেয়। চাবুকটা অদ্ভুত। সরু সরু করে মোটা শনের মত কাটা একগোছা চামড়ার ফালি গুচ্ছ করে বাঁধা একটা চাবুক।

চাবুকটা হাতে নিয়ে সজোরে চাব্‌কাতে শুরু করে নিশিকান্ত কিটিকে তখন। হাতের চাবুক থামে না, নির্মমভাবে হুইস হুইস শব্দে কালো একটা সাপের মত কিটির সর্বাঙ্গে আছড়ে পড়তে থাকে।

নিদারুণ যন্ত্রণায় মেয়েটা কুঁচকে কুঁকড়ে গড়াগড়ি দিয়ে চাবুকের আঘাতগুলো যেন নিতে থাকে সর্বাঙ্গে। একটি শব্দও মুখ দিয়ে বের হয় না। তার চিৎকার, পাগলামি সব যেন তখন থেমে গিয়েছে।

আর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে যন্ত্রণায় থেকে থেকে যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে ইরসাদ। চাকুকের আঘাতগুলো যেন ওরই পিঠের উপরে এসে একটার পর একটা পড়ছে।

ক্রমান্বয়ে অর্থাৎ প্রায় পনের-কুড়ি মিনিট ধরে চাবুক-পেটা করে হঠাৎ একসময় নিশিকান্ত যেন কতকটা ক্লান্ত হয়েই চাবুকটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

কিটি মাটির উপরে উবুড় হয়ে শুয়ে নিথর হয়ে পড়ে থাকে তখন।

অতঃপর নিশিকান্ত এগিয়ে গিয়ে কিটির দেহটা বুকের উপরে তুলে নিয়ে পাশের একটা ছোট্ট সংলগ্ন কামরার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে। স্প্রিংয়ের গদী বিছানো ধবধবে একটা শয্যার উপরে পরম যত্নে শুইয়ে দিয়ে কি একটা যেন injection দেয়। ঘুমোয় না, কিন্তু নিঃসাড়ে ৮/৯ ঘণ্টা পড়ে থাকে কিটি।

হঠাৎ নিশিকান্ত ঐ সময় ওষুধের-প্রভাবে-নিঃসাড় কিটির দেহটাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে মুখটা ওর বুকের মধ্যে গুঁজে আদর করতে শুরু করে।

ব্যাপারটা মাসে একবার ঠিক অমাবস্যার রাত্রে হয়ই।

এরপর ৮/১০ দিন কিটি অত্যন্ত শান্তশিষ্ট থাকে।

যদিও নিশিকান্তকে কখনো বাড়ি হতে বেরুতে কেউ দেখেনি, আসলে কিন্তু একটানা দু-একদিনের বেশীও বাড়িটায় নিশিকান্ত থাকে না।

মাঝে মাঝে দু-চারদিনের জন্য কোথায় যেন ডুব দেয়—আবার ফিরে আসে নিশিকান্ত।

কখনো কখনো স্নানের ঘরে ঢুকে দু-চার ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। অবশ্য এ রহস্য একমাত্র ইরসাদ ও কিটি ভিন্ন কেউ জানত না। সকলেই জানত নিশিকান্ত বাড়ি থেকে কখনো কোথাও বের হয় না।

উপরের তিনখানা ঘরের মধ্যের বড় হলঘরটা বন্ধই থাকে। ঘরটার মধ্যে একটি মাত্র সিঙ্গল খাটে স্প্রিংয়ের গদী-বিছানো দুগ্ধফেননিভ শয্যা বিছানো। আর একটি আরামকেদারা ও একটা দেওয়াল-আলমারি।

আলমারিটার মধ্যে যে কি আছে কারও জানবার উপায় নেই। অন্য ঘরটি নিশিকান্তর

BanglaBook.org

শয়নকক্ষ। এ কক্ষটিও বেশ প্রশস্ত, ভিতরে প্রকাণ্ড একটা মেহগনী পালংকের উপরে শয্যা বিছানো।

এক কোণে একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল ও একটি লোহার সিন্দুক। একটি মাত্র লাল ঘেরাটোপে-ঢাকা টেবিল-বাতি ও একটা সিলিং ফ্যান ও একটা কাপড়ের আয়না-বসানো আলমারি ও জুতো রাখবার শেল্‌ফ। জুতোর শেল্‌ফের উপরে ৯/১০ জোড়া দামী দামী চক্‌চকে নানাশ্রেণীর জুতো সাজানো। শয়কক্ষের সংলগ্ন একটি বাথরুমও আছে।

জুতোগুলির তলা পরীক্ষা করলে বোঝা যায় জুতোগুলো নিয়মিত ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কিন্তু কখন যে নিশিকান্ত সেগুলো ব্যবহার করে কেউ জানেও না, দেখেও না।

মধ্যের বসবার হলঘরটিতে আসবাবপত্রে কিছুটা ভরে আছে—চার-পাঁচটি নানাজাতীয় পুস্তকে ঠাসা আলমারিই সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। বসবার কুশন-চেয়ার সোফা কাউচ, ছোট গোল ২/৩টি শ্বেতপাথরের ত্রিপয়। মেঝেতে পুরু কার্পেট বিছানো। ঘরের সমস্ত জানালাগুলোতে ভারী গরম কাপড়ের দামী কালো রংয়ের পর্দা টাঙানো। দিনের বেলাতেও সূর্যের আলোর প্রবেশ নিষেধ যেন এখানে।

ঘরের এক কোণে একটা ব্রোঞ্জের তৈরী বীভৎস ড্রাগনের মূর্তি। সেই মূর্তির ঠিক নীচে দিবারাত্র সর্বক্ষণ জ্বলছে একটি সবুজ ঘেরাটোপে-ঢাকা উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাতি।

সর্বক্ষণ ঘরটার মধ্যে আলো জ্বলে। একটা স্তিমিত সবুজ আলো সমগ্র কক্ষখানিকে যেন সর্বক্ষণ একটা রহস্য দিয়ে ঘিরে রয়েছে।

যতক্ষণ এ বাড়িতে সে থাকে তার বেশীক্ষণই প্রায় দেখা যায় ঘরের দক্ষিণ কোণে একটা প্রকাণ্ড আরামকেদারার উপরে নিশিকান্ত বসে বসে বই পড়ছে।

ঠিক পাশের ছোট্ট একটি বাতিদান হতে খানিকটা আলো এসে কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকটিই আলোকিত করে রাখে।

পাশে ত্রিপয়ের উপরে থাকে একটা টেলিফোন ও কতকগুলো বই। ঘরের মধ্যে কেউ দেখাসাক্ষাৎ করতে এলে নিশিকান্ত কক্ষের একমাত্র ঐ সবুজ আলোটিও নিভিয়ে দিয়ে ছোট্ট কেবল সেই বাতিটিই জ্বেলে রাখে।

স্বল্পান্ধকারে দূর হতে নিশিকান্তকে কেমন যেন একটা রহস্যের মতই মনে হয়।

॥ ৬ ॥

নিশিকান্তর সঙ্গে দেখা করতে আসে অনেকেই। এক-একজন করে আসে এবং ঐ বসবার ঘরে বসেই কথাবার্তা হয়।

নানা জাতের নানা শ্রেণীর লোক দেখা করতে আসে। ধনী হতে শুরু করে দীনদরিদ্র কুলি-মজুর শ্রেণীর লোক পর্যন্ত। কেউ আসে মোটরে, কেউ রিক্‌শায়, কেউ পায়ে হেঁটে। বাঙালী, মাদ্রাজী, পাঠান, উড়িয়া থেকে শুরু করে সকল জাতিই যাতায়াত করে।

কেউ যখন নিশিকান্তর সঙ্গে দেখা করতে আসে, ইরসাদ ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়।

সাধারণতঃ রাত্রি দশটার পর হতে শুরু করে রাত্রি তিনটে পর্যন্ত নিশিকান্ত কারও সঙ্গে বড় একটা দেখা করে না। বিশেষ করে আগে হতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করা থাকলে!

BanglaBook.org

রাত্রি দশটা হতে এগারটা পর্যন্ত নিশিকান্ত তার ছোট ঘরখানির মধ্যে আরামকেদারাটার উপরে বসে বসে পান চিবোয়—অর্থাৎ সেটাই তার কোকেন সেবনের সময়!

সে-সময় পাশে থাকে তার কিটি।

নিশিকান্তর বাড়িতে প্রবেশের সদর দিয়ে কোন রাস্তাই নেই। সরু একটা গলিপথ বড় বড় সুউচ্চ বাড়িগুলোর মধ্যখান দিয়ে, নোংরা আবর্জনায় দুর্গন্ধে বিষিয়ে থাকে, সেটাই একমাত্র ঐ গৃহে প্রবেশের বা যাবার পথ।

এ বাড়িতে লোকের আনাগোনা ঐ সংকীর্ণ পথ ধরেই চলে।

রাত্রি বারোটা হবে।

মধ্যের সেই বসবার প্রশস্ত হলঘরটায় আরামকেদারার উপরে ঝিম্ দিয়ে বসে আছে নিশিকান্ত। কোমর হতে পা পর্যন্ত ঢাকা একটা দামী কাশ্মিরী শাল। ঘরের সবুজ আলোটা জ্বলছে।

হঠাৎ ঘরের কোণে দেওয়ালে একটা লাল বাল্‌ব বার-দুই-তিন জ্বলে আবার নিভে গেল। নিশিকান্ত পায়ের নীচে একটা গুপ্ত সুইচে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দিল।

নীচে ইরসাদের ঘরে একটা ঘণ্টি ক্রিং ক্রিং করে বেজে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে!

ইরসাদ সদর দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

দরজা খুলতেই দেখলে বংশী দাঁড়িয়ে সামনে।

বংশী কোন কথা না বলে ইরসাদের পাশ কাটিয়ে সোজা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। নিশিকান্তর ঘরের দরজা ভেজানো ছিল, চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল।

সবুজ আলো ঘরে। দূরে অস্পষ্ট ছায়ার মত দেখা গেল নিশিকান্ত বসে চুপটি করে। মুহূর্তের জন্য মাত্র, সঙ্গে সঙ্গে সবুজ আলোটি নিভে এবং জ্বলে উঠল সেই ছোট বাতিটি।

নিশিকান্তর ঊর্ধ্বাংশ সেই আলোয় দেখা যায় না। কেবলমাত্র দামী কাশ্মিরী শালে আবৃত নিম্নাংশ দেখা যাচ্ছে।

বসুন বংশীবাবু!

মাই গড্! হঠাৎ এত জরুরী তলব কেন দাদু?

নীলিমা না অনিলা—কি যেন মেয়েটার নাম বলছিলে সেদিন?

নীলিমা!

মেয়েটা দেখতে শুনেছি ভালই, কি বল?

মাই গড্! ব্যাপার কি বলুন তো দাদু?

তাকে আমার চাই।

মাই গড্! ইউ আর এ greedy wolf দাদু!

টাকার জন্যে পরোয়া করো না বংশীবাবু, দশ হাজার, বিশ হাজার যা লাগে!

নো মাই ডিয়ার দাদু, বংশী নাগ আর যাই করুক, মাই গড্, স্ত্রীলোকের ইজ্জত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে না সে তো আপনি জানেন—

বংশীবাবু, এই কি তোমার শেষ কথা?

ইয়েস স্যার! মাই গড্! আপনার তো বহুৎ লোকলস্কর আছে—টাকার কুমীর আপনি, চোরা মাদকদ্রব্যের কালো ব্যবসা করে কোন অভাব নেই—

BanglaBook.org

নিশিকান্ত এবারে অন্ধকারেই হেসে ফেলে।

বিচিত্র অদ্ভুত সে হাসি—নিঃশব্দ আকর্ণবিস্তৃত হাসি। চোখ দুটো বুজে যায়, ক্ষতচিহ্নটা গালের আরো গভীর বলে মনে হয়।

সমস্ত শরীরটা সেই হাসির তালে তালে মৃদু মৃদু দুলতে থাকে!

হঠাৎ হাসি থামিয়ে নিশিকান্ত বলে, টাকার আমি কুমীর অর্থাৎ crocodile! সবাই বুঝি ঐ কথাই বলে বংশীবাবু!

তা বলে বইকি।

বেশ বেশ। তা তুমিও তো টাকা ভালবাস হে।

মাই গড্! ভালবাসি কি সাধে! শালা টাকা না পকেটে থাকলে যে একটি পাও চলবার উপায় নেই!

এবং সে টাকা তুমি সৎভাবে উপায় করো না—

না, তা করি না—।

কারণ—

খুব easy! কারণ সৎভাবে পারিনি আর অসৎভাবে উপায় করাটাও ঢের সোজা বলে!

তবে এক্ষেত্রেই বা তোমার আপত্তিটা কিসে? চোর যে তার ডাকাতিতে ভয় কেন?

ভয়! মাই গড্! বংশী নাগ ভয় কিছুতেই করে না। দুটো বস্তু বাদে যা আদেশ করবেন gladly always at your serivce! স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপার ও দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা—

আচ্ছা বংশী, তোমার দ্বারা যখন হবেই না তুমি যেতে পার।

বংশী জানে এবং বেশ ভালভাবেই জানে, ঐ কথার পর নিশিকান্ত একেবারে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ।

আর একটি বাক্যও তার মুখ দিয়ে বের হবে না।

বংশী উঠে পড়ল। দরজা ঠেলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখে ইরসাদ নিঃশব্দে দরজার ঠিক গোড়াতেই দেওয়ালে হেলান দিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে, নিত্যকারের মত তার প্রহরায়।

নিশিকান্ত একজনের সঙ্গে যখন কথা বলে, দ্বিতীয় কারো সেখানে প্রবেশ নিষেধ।

॥ ৭ ॥

বোস সাহেবের মন নানাবিধ দুশ্চিন্তার অবিশ্রাম জাল বুনছিল।

হীরা সিংয়ের মৃতদেহটা বংশীর সাহায্যে পাচার করা হয়েছে বটে, কিন্তু তবুও যেন মনে হচ্ছে, ব্যাপারটার মধ্যে বোধহয় সামান্য একটু গোলমাল ঘটে গিয়েছে। এবং সেটা যে ঠিক কি এবং কতখানি, বোস সাহেব এখনও সেটা বুঝে উঠতে পারেনি।

কলুটোলার বাড়িটার সামনে ওদিককার ফুটপাতে যে পান বিড়ি সোডা লেমনেডের দোকানটা আছে, আজকাল প্রায়ই সেই দোকানের সামনে জুলপীধারী ৩০/৩২ বৎসরের রোগা একটি নিরীহ ভদ্র যুবককে আন্‌মনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে।

বোস সাহেবের সেটাই একমাত্র অস্থিরতার কারণ নয়, শশাঙ্ক ছোঁড়াটা দুবার তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে এসেও ফস্‌কে গিয়েছে!

বোস সাহেবের মনে অরিন্দম সম্পর্কে এ ব্যাপারে বেশ একটু সন্দেহ আছে। অবিশ্যি সে

BanglaBook.org

সন্দেহের কথা বোস সাহেব অরিন্দমকে আজ পর্যন্ত জানতে দেয়নি। দলের অনেকগুলো বিশ্বস্ত লোক একে একে গিয়েছে, অরিন্দমকে আর সে বোধ হয় তাই হারাতে চায় না।

একে একে অনেকে গিয়েছে— রাসবিহারী, চন্দ্রমোহন, বিরাজমোহন, বিশ্বস্ত শশধর পর্যন্ত। হীরা সিংকে হারাবার ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু লোকটার ঔদ্ধত্য ক্রমেই যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল!

বোস সাহেবের চিন্তা জাল বুনে চলে।

এক্স্‌পেরিমেন্টের বাকী কপির অংশ এখনও হস্তগত করা গেল না।

সুনীল কর মাত্র গবেষণার কপির ১/৩ অংশ সরিয়েছিল টুকে, শশাংকর কাছেও অবশ্যি সেই অংশেরই original টা আছে—বাকী অংশ যে কোথায় আছে তারও আজ পর্যন্ত কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি। পার্টি original copy চাওয়াতেই সিংগাপুরে বিভ্রাট দেখা দেয়। তারা অন্য copy চায় না। তাই হীরা সিং অন্য copyটা জাহাজডুবির সময় জলে ফেলে দিয়েছিল—অন্ততঃ হীরা সিং তাই বলেছিল, অথচ original যেটা শশাংক সরিয়েছিল, এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে শশাংকর হাতেও সেটা আর নেই। কিন্তু নেই তো গেল কোথায়!

এদিকে যুদ্ধের সংকটময় পরিস্থিতির দরুন চারিদিককার অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। এখন সেটা পাওয়া গেলেও যে সেটা এখন জাপানে পাচার করতে পারা যাবে কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

পার্টি তো ধুয়ো ধরে বসে আছে এখনো আসল কপিই তারা চায়। এবং তা না হলে আগাম যে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছে সব ফেরত দিতে হবে। তার উপরে এ ব্যাপারে আজ পর্যন্ত নেহাৎ কম টাকা খরচও হয়নি!

এ যে কি আপসোসের ব্যাপার দাঁড়িয়েছে! যে অংশের সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি, শশাংক ছোঁড়া নিশ্চয়ই তার সন্ধান জানে। সুনীল করের সঙ্গে এখন একবার দেখা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সিংগাপুরে তার সঙ্গে যারা ছিল তাদের মধ্যে একমাত্র জীবিত—রাজেশ্বর। সেও কোন সন্ধান দিতে পারছে না লোকটার।

ললিতও মৃত। আসলে সিংগাপুরে কতটুকু কি ঘটেছিল এখন পর্যন্ত সেটাও জানা যায়নি। হীরা সিংয়ের চক্রান্তে অনেকটাই তার শেষ পর্যন্ত জানা হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু হীরা সিংই বা অমনভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করলে কেন?

হীরা সিং লোকটা বদ্ধ কালা হলেও অদ্ভুত একটা তার শক্তি ছিল, মানুষের lips movement থেকেই সমস্ত কথা বুঝতে পারত। বোবা হবার সে ভান করতো মাত্র এবং ঐ ভানটুকুও ছিল তার অদ্ভুত একটা শক্তি।

না। সত্যি ঝোঁকের বশে, রাগের মাথায় চট্ করে সেদিন হীরা সিংকে খুন করাটা যুক্তিসঙ্গত হয়নি। কতকটা যেন আত্মগতভাবেই বোস সাহেবের মুখ দিয়ে কথাটা উচ্চারিত হয়, না হীরা সিংকে খুন করে অন্যায়ই হয়েছে।

কিঞ্চিৎ বিলম্বে বোধগম্য হইয়াছে বন্ধু!

হঠাৎ আত্মগতভাবে নিজের উচ্চারিত কথাটার প্রত্যুত্তরে চমকে সামনের দিকে তাকায় বোস সাহেব।

বক্তা প্রৌঢ় ওঙ্কারনাথ।

শুদ্ধ পুস্তকী ভাষায় কথা বলাই ওঙ্কারনাথের স্বভাব।

BanglaBook.org

সবিস্ময়ে বোস সাহেব বলে ওঙ্কারনাথ!

ওঙ্কারনাথ এসে ঘরে প্রবেশ করল। লোকটার বয়েস মধ্য-পঞ্চাশ থেকে ষাটের কাছাকাছি হবে। মাঝারি দোহারা চেহারা, পরনে দামী সুট, মুখে ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি।

ওঙ্কারনাথ বলে, হ্যাঁ, ওঙ্কারনাথই বটে। বহুদিন হয় চৌধুরী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাতাদি নাই—তাই প্রভু আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় কিঞ্চিৎ উদ্‌গ্রীব হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন ও আপনার সমাচারের জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

ওঙ্কারনাথের শুদ্ধ পুস্তকী ভাষায় কথাবার্তার মধ্যে যেন একটা গুপ্ত ব্যঙ্গের হুল সর্বদাই সুস্পষ্ট থাকে।

বসুন ওঙ্কারনাথ।

অন্তরের বিরক্তি বাইরে বিন্দুমাত্রও না প্রকাশ করে বোস সাহেব ওঙ্কারনাথকে সাদর আহ্বান জানায়।

আসুন—বসুন মিঃ ওঙ্কারনাথ।

তা উপবিষ্ট হওয়া প্রয়োজন বৈকি। দণ্ডায়মান অবস্থায় আলাপ-আলোচনা প্রশস্ত তো নয়ই, বিধেয়ও নহে।

ওঙ্কারনাথ নির্দিষ্ট সম্মুখের চেয়ারটার উপরে উপবেশন করে।

তারপর কার্য কতদূর অগ্রসর হইল? ওঙ্কারনাথ প্রশ্ন করে।

কই আর, বিশেষ কিছুই এগোয়নি।

হেতু?

আপনি তো জানেন ওঙ্কারনাথ এবং চৌধুরী মশাইকেও বলেছি, শেষ কপিটা এখনও পাওয়া যায়নি।

তবে কি ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে আপনারা কেবল টাকাই ব্যয় করিয়াছেন—করিয়াছেন অষ্টরম্ভা! আবার সেই ব্যঙ্গোক্তি।

চেষ্টার কোনপ্রকার তো ত্রুটি হচ্ছে না।

চেষ্টার মধ্যে তো দেখিতেছি কেবল দলের লোকগুলিকে হুট্‌পাট করিয়া হত্যা করিতেছেন!

দেখুন ওঙ্কারনাথ—অধিকারেরও একটা সীমা আছে, জগন্নাথ বোস এ ধরনের ত্রুটিকে ক্ষমা করে না।

ওহো! তাই নাকি? তা বেশ তো, ইহার চাইতে আপনি যে অর্থ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে এই ব্যাপারে অর্থাৎ যে দশ হাজার টাকার মত আগাম লইয়াছেন প্রত্যর্পণ করুন, লেঠা মিটিয়া যাউক।

এটা কি চৌধুরীরই কথা?

চৌধুরী নয়, বলুন চৌধুরী মহাশয়। হ্যাঁ, আমার উচ্চারিত কথাগুলি তাঁহারই জবানী মাত্র বলিয়া জানিলেই বাধিত হইব।

বেশ। তাই হবে।

অতীব উত্তম প্রস্তাব। তবে দিন, মিটাইয়া দিন।

সে কি! এখুনি নাকি?

অবশ্য! বিলম্বের প্রয়োজন কি? বিশেষ করিয়া শুভকার্যে বিলম্ব বিধেয় নহে। যুক্তিসঙ্গতও নহে।

BanglaBook.org

টাকা তো আর আমার বাড়ির গাছের ফল নয় যে, বললেন আর পেড়ে দেবো আঁকসি দিয়ে! এক মাসের মধ্যে টাকা পাবেন।

শ্রীবিষ্ণু! শ্রীহরি! মহাশয় নিশ্চয়ই রসিকতা করিতেছেন না?

ওঙ্কারনাথ! বাঘের মতই গর্জিয়া ওঠে বোস সাহেব।

ধীরে রজনী—ধীরে! রক্তচক্ষু বিঘূর্ণন, সরোষ কণ্ঠে বিলাস এই দীনহীন ওঙ্কারনাথের জন্য নহে। ও সকল কৌশল দলীয় ব্যাপারের মীমাংসায় প্রয়োগ করিলেই সর্বধিক মঙ্গল জানিবেন। শ্রবণ করুন—শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ রাখিয়া শ্রবণ করুন, সপ্ত দিবসের অধিক একটি মুহূর্তও বেশী দিতে চৌধুরী মহাশয় সম্মত নন। আজ শুক্রবার—রাত্রি এগারটা, আগামী শুক্রবার রাত্রি ঠিক একাদশ ঘটিকায় চৌধুরী মহাশয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সর্বসমেত পনের হাজার টাকা যাহা আপনার নিকট প্রাপ্য—

পনের হাজার! মাত্র দশ হাজার দিয়েছেন তিনি!

এই দুই মাসে সুদে-আসলে পঞ্চদশ সহস্রই হইয়াছে।

চক্রবৃদ্ধি হারে নাকি?

না, জীবনবৃদ্ধি হারে। হ্যাঁ, যাহা হউক, উক্ত অর্থ পাইপয়সাটি পর্যন্ত না মিটাইয়া দিলে—

হ্যাঁ বলুন, শুনে রাখি সেটাও। না মিটিয়ে দিলে কি হবে?

চৌধুরী মহাশয় জীবের প্রাণহানি করেন না, প্রাণহানি করা অতীব ঘৃণিত কার্য। তবে হ্যাঁ, ইহার জন্য আপনার অঙ্গের দিক দিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইবে।

অর্থাৎ শাইলক দি জুর মত—

তা যা বলেন, উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি মাত্র কর্তন করিয়া লওয়া হইবে।

বোস সাহেবের এবারে সত্যই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে; ক্ষিপ্তের মতই বলে ওঠে, Get out! I say get out of this room!

ওঙ্কারনাথ ধীর মন্থর গতিতে উঠে দাঁড়ায়, একান্ত শান্ত নির্বিকার কণ্ঠে বলে, ক্রোধ চণ্ডাল! নীতিবাক্য স্মরণ রাখিবেন। কদাপি ক্রোধ করিও না, উহা অতীব ক্ষতিকারক। দেহ ও মন উভয়ের পক্ষেই। আচ্ছা নমস্কার, বিদায়।

ধীরপদে ওঙ্কারনাথ কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

স্কাউন্ড্রেল!

সশব্দে উচ্চারিত হয় একটিমাত্র কথা রাগত বোস সাহেবের কণ্ঠ হতে।

॥ ৮ ॥

কিটি নিশিকান্তর ছোট যে কক্ষটিতে একটিমাত্র পালঙ্ক পাতা এবং দেওয়াল আলামারি আছে—সেই দেওয়াল আলমারিটি খুলে তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল।

আলমারিটার মধ্যে সারি সারি সব নানাজাতীয় দুষ্প্রাপ্য নানা আকারের বিলাতী মদের বোতল সাজানো।

লোলুপ দৃষ্টিতে বোতলগুলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল কিটি। অনেকদিন সে নেশা করে না। নিশিকান্ত কিটির প্রতি হঠাৎ কেন না-জানি কিছুদিন হতে বিরূপ হয়ে উঠেছে, আজকাল আর পুরো একটা বোতল ওকে খেতে দেয় না।

BanglaBook.org

একদিন অন্তর অন্তর মাত্র দু'টি পেগ্ করে দেয়।

কিটির মদের সমুদ্রপ্রমাণ পিপাসা তাতে বিন্দুমাত্র তো প্রশমিত হয়ই না, যেন আরো দ্বিগুণ বেড়ে যায়। অথচ উপায় নেই, নিশিকান্ত না দিলে পাওয়ার উপায় নেই।

নিশিকান্তর শ্যেনচক্ষুকে এড়িয়ে এ ঘর থেকে মদ চুরি করে নিয়ে যাওয়াটাও দুঃসাধ্য। হঠাৎ আজ ও চাবিটা যোগাড় করেছে! অনেকদিন ধরে ঐ চাবিটার জন্য ওৎ পেতে ছিল। আজ মিলেছে চাবিটা। নিশিকান্তর এখন স্নানের সময়, কিছুক্ষণ আগে মাত্র নিশিকান্ত স্নানঘরে প্রবেশ করেছে। এই সুযোগটুকু সে নিয়েছে। চাবিটা কোথায় থাকে ওর জানাই। সেটা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকে আলমারিটা খুলেছে কিটি।

দুই-তিন ঘণ্টার আগে স্নানঘর হতে তো বের হবেই না, এমন কি অনেক সময় চার-পাঁচ ঘণ্টাও নিশিকান্ত স্নানঘরে থাকে।

কি যে এতক্ষণ করে লোকটা স্নানঘরে কিটির মাথায় ঢোকে না।

আত্মহারা বর্মী মেয়ে কিটি বোতলগুলো দেখছে। চোখে জ্বলছে লালসার আগুন।

এক দুই তিন চার পাঁচ— অনেক অনেক। কতগুলো বোতল হবে!

গোটা ষাটেক তো নিশ্চয়ই। গোটা তিনেক বোতল নিয়ে সোজা কিটি নীচে তার ঘরে গিয়ে বিছানার তলায় বোতল তিনটে লুকিয়ে রেখে এল। লোভ সামলাতে পারা যায় না। আলমারির সামনে এসে আবার দাঁড়াতেই লোভাতুর হাত দুটো অজান্তেই যেন আবার বোতলগুলোর দিকে এগিয়ে যায়।

আরো দুটো বোতল কিটি তুলে নেয়।

সে দুটোও নীচে গিয়ে লুকিয়ে রেখে আসে।

আবার দুর্নিবার লোভ হাত-ইশারা দেয়; আবার হাতটা ওর বোতলগুলোর দিকে প্রসারিত হতেই, একটা মৃদু অত্যন্ত হালকা স্পর্শ ওর কাঁধের উপর ছোঁয়া দেয়।

বিদ্যুৎগতিতে চমকে ফিরে দাঁড়ায় কিটি। দুর্নিবার একটা আতঙ্কে বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করে ওঠে। একটা ঠাণ্ডা স্রোত যেন শিরদাঁড়া বেয়ে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে! জিভটা যেন গলার মধ্যে টেনে নিচ্ছে।

সামনে দাঁড়িয়ে তার নিশিকান্ত। আর দু'চক্ষুতে তার যেন একটা ভয়ংকর পাশবিক হিংস্রতা ঘনিয়ে উঠেছে।

কিটি! নিশিকান্ত শান্ত কণ্ঠে ডাকে।

আমি—কিটির কণ্ঠে কথা জড়িয়ে যায়।

পাশের ঘরে চল। নিশিকান্ত বলে।

সে নির্দেশ লঙ্ঘন করবার কোন শক্তিই নেই কারো।

কিটি কতকটা যেন যন্ত্রচালিতের মতই এগিয়ে চলে, পশ্চাতে নিঃশব্দে অনুসরণ করে তাকে নিশিকান্ত।

হলঘরে প্রবেশ করে কঠোর কঠিন কণ্ঠে নিশিকান্ত বলে, যাও, দেওয়ালের গা থেকে চাবুকটা পেড়ে নিয়ে এসো, যাও!

চাবুকটা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ায় কিটি নিশিকান্তর সামনে।

দাও—হাত বাড়াল নিশিকান্ত।

BanglaBook.org

কিটি যন্ত্রচালিতের মত চামড়ার সেই ভীষণ চাবুকটা নিশিকান্তর হাতে তুলে দিল।

নিশিকান্ত হাতের চাবুকটা শূন্যে আন্দোলিত করতেই হুইস্ করে একটা ক্রুদ্ধ গোখরো সাপ যেন গর্জে উঠলো।

তারপরই বিদ্যুৎ গতিতে নেমে এলো কিটির গায়ের উপরে।

একবার—দুবার—

কিটি দাঁড়িয়ে।

বোবা—পাথর যেন।

চাবুকটা পড়ছে তার সর্বাঙ্গে হুইস্ হুইস্ শব্দ করে।

॥ ৯ ॥

শশাংক ভাবছিল।

সুব্রতবাবু বিকেলের দিকেই আবার আসবেন বলে গিয়েছেন। অলসভাবে একটা সোফার উপরে গা এলিয়ে দিয়ে শশাংক আজকের সকালের ঘটনাগুলিই আর একবার মনে মনে ধীরভাবে আলোচনা করছিল। দিগেন সান্যালও শত্রুর হাতে এখন বন্দী। পুলিসের ছদ্মবেশে এসে কৌশলে তারা দিগেন সান্যালকেও বন্দী করেছে।

শয়তানরা ঠিক করেছে কাউকেই বোধ হয় বাদ দেবে না। কাকা নিহত, বলদেব কাকা নিহত, দিগেন সান্যাল নিজে নিখোঁজ। দু'বার সে নিজে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছে। এবং তাতে করে শত্রুপক্ষের আক্রোশ তাঁর উপরে হয়েছে আরো দ্বিগুণ। হাতের মুঠোর মধ্যে এবারে পেলে হয়ত ছিঁড়ে খাবে।

সুব্রতবাবুর কঠোর আদেশ, একাকী হাজার প্রয়োজনেও সে কোথাও যাবে না। বিপদের সম্ভাবনা এখন প্রতি মুহূর্তে। কখন কোন্ পথে কোথা থেকে যে বিপদ আসবে কেউ বলতে পারে না। কারণ ওরা এখন মরীয়া হয়ে উঠেছে। অথচ তার একবার কাকার নারকেলডাঙার বাড়িতে যাওয়া অতি অবশ্য দরকার।

লাইব্রেরী ঘরের দক্ষিণ দিকের ২ নং আলমারির মধ্যস্থিত ১৯০ নং বইয়ের ভিতর গবেষণার যে অংশটা আছে সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়ে আসা দরকার।

সদর দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ শোনা গেল। কে এলো আবার হঠাৎ এই দুপুরে! একান্ত কৌতূহলবশেই শশাংক সোফা হতে উঠে রাস্তার দিকের জানলাপথে নীচে তাকাল।

কে? নীলিমা দেবী না?

হ্যাঁ, নীলিমাই তো!

আবার কড়ানাড়ার শব্দ।

একটু অপেক্ষা করুন নীলিমা দেবী, আমি আসছি।

নীলিমা শশাংকর কণ্ঠস্বর শুনে উপরের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

চোখোচোখি হতেই নীলিমার মুখে হাসি জেগে ওঠে।

শশাংককে আর যেতে হলো না নীচে। ততক্ষণে স্বরূপই দরজা খুলে দিয়েছে।

ভাল আছ তো স্বরূপদা?

BanglaBook.org

স্বরূপদারও কেমন যেন নীলিমার কণ্ঠের ঐ আত্মীয়তার সুরটুকু শুনে মনটা অকারণ খুশিতে ভরে ওঠে।

মৃদু হেসে বলে, ভাল। তুমি ভাল তো দিদিমণি?

হ্যাঁ দাদা। তোমার দাদাবাবু নেই?

হ্যাঁ, উপরেই তো আছে। যাও না।

উপরের সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে নীলিমা বলে, তোমার হাতের চা ভারী চমৎকার স্বরূপদা। এক কাপ আজও চাই কিন্তু।

নিশ্চয়ই। তুমি উপরে যাও দিদিমণি, আমি আনছি।

নীলিমা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে থাকে।

শশাংক এসে আবার সোফার উপরে পূর্বের মত গা এলিয়ে দিয়ে চক্ষু বুজে সিঁড়িতে একটি পরিচিত পায়ের শব্দ শোনার জন্য কান ও মন উৎকর্ণ করে রাখে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে সোফার উপরে এলায়িত, মুদ্রিত চক্ষু শশাংকর দিকে তাকিয়ে স্মিত হাস্যোৎফুল্ল মুখে নীলিমা দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ চুপটি করে।

তারপর মৃদু কণ্ঠে ডাকে শশাংকবাবু!

শশাংক চোখ খুলে তাকাল।

আমাকে দেখেও আপনি চোখ বুজে বসে ছিলেন কেন? এর অর্থ এই নয় তো যে অবাঞ্ছিতা—চলে যান!

সে কি? কে বললে সেকথা? কিন্তু দাঁড়িয়ে কেন—বসুন, please–

আপনার কিন্তু attitude দেখে মনে হচ্ছিল যেন—

বসুন, বসুন। আপনার কথাই ভাবছিলাম।

কি সৌভাগ্য! সত্যি—

সত্যিই আপনার পাত্তা তো বলবেন না, নচেৎ এতক্ষণে কখন আপনার ডেরায় গিয়ে হাজির হতাম!

বলেন কি? হঠাৎ আমার উপরে আপনার বিশ্বাসটা যেন অত্যন্ত দ্রুত গাঢ় হয়ে উঠছে বলে মনে হচ্ছে?

এখনো সংশয় আছে নাকি!

না। আপনার ওকথা শোনবার পরে অন্ততঃ থাকাটা উচিত নয়। বসতে বসতে জবাব দেয় নীলিমা।

ঠিক এমনি সময় আবার জুতোর শব্দ শোনা গেল।

কে যেন আসছে! নীলিমা বলে।

কে আসবে আবার? কই, সদর দরজা খুলবার শব্দ তো পাইনি? জবাব দিল শশাংক।

কিন্তু ততক্ষণে সিঁড়িতে গলার শব্দ শোনা যায়, শশাংকবাবু!

আরে, এ যে সুব্রতবাবু! আসুন—আসুন।

সত্যি সুব্রতই এসে ঘরে প্রবেশ করল এবং ঘরের মধ্যে মুখোমুখি নীলিমাকে বসে থাকতে দেখে কেমন যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই শশাংক বলে ওঠে, সুব্রতবাবু আসুন এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনিই আমাদের নীলিমা দেবী।

ও নীলিমা দেবী! নমস্কার। সুব্রত হাত তুলে নমস্কার জানায়।

BanglaBook.org

প্রতি নমস্কার করে নীলিমা।

বসুন সুব্রতবাবু, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? শশাংক বলে।

সুব্রত একটা সোফায় উপবেশন করে।

এতবার শশাংকবাবুর মুখে আপনার নামটা শুনেছি নীলিমা দেবী যে চাক্ষুষ না হলেও মনে মনে আপনার সঙ্গে বহুক্ষণ পরিচয় হয়ে গিয়েছে। হাসতে হাসতে সুব্রত বলে।

কি বলেছেন আমার সম্পর্কে শশাংকবাবু? বাচাল, গায়ে পড়া—বলেননি এসব কথা?

হাসতে হাসতে নীলিমা সুব্রতকে প্রশ্ন করে।

না, সেরকম কিছু আপনার সম্পর্কে বলেছেন বলে তো কই মনে পড়ছে না, বরং—

বরং?

না, থাক সে-কথা। সে আর একসময় শোনানো যাবে। অপ্রত্যাশিতভাবে আপনার সঙ্গে যখন হঠাৎ দেখা ও আলাপ হয়েই গেল কয়েকটা কথা আপনার সঙ্গে আমার সেরে নিই।

॥ ১০ ॥

স্বরূপ ট্রেতে করে তিন কাপ ধূমায়িত চা, কিছু নতুন গুড়ের সন্দেশ নিয়ে কক্ষে এসে প্রবেশ করল।

এ কি রে স্বরূপদা, সুব্রতবাবু এসেছেন তুই জানলি কি করে! বলে ওঠে, সবিস্ময়ে স্বরূপদার হাতের ট্রেতে ঠিক তিন কাপ ধূমায়িত চা দেখে শশাংক।

জবাবটা দিল কিন্তু সুব্রতই, বা রে! নীলিমা দেবী উপরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই তো একপ্রকার আমি এসে ঢুকেছি—ও যেমন দরজা বন্ধ করতে যাবে!

কিন্তু সুব্রতবাবু, আপনি বোধ হয় জানেন না, স্বরূপদা আপনাকে খুব সংশয়হীন চক্ষে দেখে না। কি রে স্বরূপদা—বলে দেবো নাকি সুব্রতবাবু সম্পর্কে তোর মতামতটা!

সর্বনাশ! বলে ওঠে সুব্রত, বলেন কি? আমার অপরাধ? তারপর স্বরূপের দিকে চোখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করে, কেন বল তো স্বরূপদা—আমার উপরে তোমার এত বিরাগ কেন?

স্বরূপ চায়ের কাপগুলো যথাস্থানে নামিয়ে দিয়ে কেমন যেন লজ্জিত হয়ে মুখখানা নীচু করে।

স্বরূপদার ধারণা এককালে আপনি টিকটিকির চাকরি করতেন! বলে ওঠে শশাংক।

হাঃ হাঃ করে সুব্রত হেসে ওঠে।—তাই নাকি! কিন্তু ভাই স্বরূপদা, আমি তো সে চাকরি অনেকদিন হল ছেড়ে দিয়েছি। ভুল মানুষ একবারই করে—

আঃ, খোকা! চাপা তর্জন করে ওঠে স্বরূপ।

না না, স্বরূপদাকে আর লজ্জা দেবেন না মিঃ মিত্র। এবারে নীলিমা বাধা দেয়, যাও স্বরূপদা, তোমার তৈরী চা-পান করতে করতে এবারে আমরা তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠি এবং অন্তরালে থেকে তুমি আত্মতৃপ্তি লাভ করো।

স্বরূপদা এর পর ঘর ছেড়ে চলে গেল।

পুরাতন ভৃত্য—সত্যি এদের তুলনা নেই! মৃদু কণ্ঠে বলে সুব্রত।

এর পর চা-পান চলতে থাকে একটা লঘু পরিবেশের মধ্য দিয়ে।

এক সময় আবার সুব্রতই আগেকার আলোচনায় ফিরে আসে এবং শশাংকর দিকে তাকিয়ে আড়চোখে প্রশ্নটা করে নীলিমাকে, নীলিমা দেবী, যদি কিছু মনে না করেন সবার আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এবং আপনার সঙ্গে এখন যে কথাগুলোর আমি আলোচনা করতে চাই তার

BanglaBook.org

জবাব দিতে হয়তো শশাংকবাবুর সামনে আপনার আপত্তি হতে পারে এবং তাই যদি ইচ্ছা করেন, তা'হলে না হয় আপাততঃ শশাংকবাবুকে কিছুক্ষণের জন্য—

সহসা নীলিমার সমগ্র মুখখানি লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। মৃদু সলজ্জ কণ্ঠে বলে, তেমন কোন কথা নাইবা জিজ্ঞাসা করলেন!

সর্বনাশ, আপনি যে গোড়াতেই কোপ বসাতে চান! সুব্রত হাসতে হাসতে বলে ওঠে।

না, না, আমিই না-হয় পাশের ঘরে—বলতে বলতে শশাংকই উঠে দাঁড়ায়।

না—না— বসুন মিঃ মিত্র। এমন কোন কথার আলোচনাই হতে পারে না এখন যেখানে আপনার উপস্থিতি বাধা ঘটাতে পারে! বাধা দেয় নীলিমা।

বেশ। তা'হলে তো কথাই নেই—উনি নিজেই যখন পারমিশান দিচ্ছেন! সুব্রত হেসে বলে।

সুব্রত বলতে শুরু করে, শশাংকবাবুর মুখে যতদূর শুনেছি আপনাদের গতরাত্রে অ্যাডভঞ্চারের কথা, তাতে এইটুকু বুঝেছি আপনি যে-ই হোন না আপনি আমাদের অর্থাৎ শশাংকবাবুর বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষিণী একজন। সেক্ষেত্রে আমাদের কি সর্বপ্রথম কর্তব্য নয় আপনার সত্যকারের পরিচয়—অর্থাৎ সত্যকারের পদবী ও গোত্রটা জানা প্রয়োজন, নীলিমা দেবী?

নীলিমা সবিস্ময়ে বলে ওঠে, গোত্র! গোত্র দিয়ে কি হবে?

বেশ, গোত্র বলতে আপনার আপত্তি থাকে, পদবীটা বলুন?

নীলিমা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলে, মুখে বলব না—কাগজে লিখে দেবো, এবং সেটা আপাততঃ গোপনই থাকবে between you and me!

বেশ, তাতেই রাজী। সুব্রত হেসে বলে।

নীলিমা কাগজের সন্ধানে এদিক-ওদিক চাইতে সহসা সুব্রত তার পকেট হতে ডাইরীটা বের করে এগিয়ে দেয় নীলিমার দিকে, নিন আমার ডাইরীর পাতায় লিখুন!

নীলিমা সুব্রতর হাত থেকে তার ডাইরী ও পেনসিলটা নিয়ে, ডাইরীর একটা খালি পাতায় খস্‌খস্ করে কি লিখে সুব্রতর হাতে আবার ফিরিয়ে দেয় ডাইরী ও পেন্সিলটা।

বারেকের জন্য ডাইরীর পাতার উপরে চোখ বুলাতেই নীরব হাস্যে চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সুব্রতর। এবং অতি মৃদু কণ্ঠে বলে, I knew—knew it!

বিস্মিত দৃষ্টিতে নীলিমা তাকায় সুব্রতর দিকে, আপনি জানতেন?

বুকপকেটে ডাইরীটা রাখতে রাখতে সুব্রত বলে, হ্যাঁ। শশাংকবাবুর মুখে আপনার সকল বৃত্তান্ত শোনা এবং তারপর আপনাকে আপনার বাড়ি পর্যন্ত একদিন follow করে কেন যেন আমার মনে হচ্ছিল—এ ছাড়া আর আপনার অন্য কোন পরিচয় থাকতে পারে না!

BanglaBook.org

॥ ১১ ॥

নিশিকান্তর হাতে বাতাসে আন্দোলিত চাবুকটা হুইস্ হুইস করে বার-দুই। কিটির গায়ের উপর পড়বার পর লগুড়াহত কুকুরের মত ভীতসন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকায় কিটি নিশিকান্তর ঘূর্ণায়মান রোষকষায়ত চক্ষুর দিকে।

তৃতীয়বার আবার চাবুকটা হাঁকড়াবার জন্য তুলে বলে, তা'হলে তুই-ই মাঝে মাঝে আমার আলমারির ভিতর থেকে মদ চুরি করে নিয়ে নেশা করিস! এতদূর স্পর্ধা—আমার অজান্তে তুই

আমার ঘরে প্রবেশ করে—চাবি তুই কোথায় পেলি? বল্, নাহলে আজ আর শুধু চাবুক নয়—বাঘনখ দিয়ে তোকে হত্যা করবো!

বলতে বলতে নিশিকান্ত চাবুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার জামার ভিতরকার পকেট হতে একটা চামড়ার খাটো দস্তানা মত বের করে সেটা ডানহাতে পরল এবং তারপরই দেওয়ালের গায়ে একটা বোতাম টিপতেই কক্ষের চতুর্দিককার দেওয়াল হতে মুহূর্তে অদৃশ্য সব উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে উঠল।

কক্ষের নীলাভ আলো অপসারিত হয়ে দিনের আলোর মত কক্ষখানি মুহূর্তে যেন যাদুমন্ত্রে চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

আর সেই অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুদিক আলোয় নিশিকান্তর ডানহাতের সেই দস্তানার পাঁচ আঙুলের অগ্রভাগে ধারালো বাঁকানো ইস্পাতের নখগুলো যেন বিদ্যুতের মত ঝিক্‌মিকিয়ে উঠলো।

শয়তানী, এই বাঘনখ দিয়ে তোকে আজ আমি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবো! এতদূর আস্পর্ধা তোর!

হঠাৎ ক্রুদ্ধ নিশিকান্তর দেহটাও সঙ্গে সঙ্গে যেন খাপমুক্ত তলোয়ারের মত সোজা ঋজু মনে হয়।

যে বর্মী মেয়ে নিশিকান্তর বহুদিনের নির্মম চর্মচাবুকের শত আঘাতেও একটি টুঁ-শব্দ পর্যন্ত কোনদিন করেনি, সর্বাঙ্গ বেত্রাঘাতে দাগা দাগা হয়ে ফুলে উঠলেও দাঁতে দাঁত চেপে সব যন্ত্রণাকে অদ্ভুত নীরবতায় সহ্য করেছে, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে পাশবিক যন্ত্রণায় তথাপি এতটুকু কাতরতা প্রকাশ করেনি—হঠাৎ এই মুহূর্তে সেই বর্মী মেয়েটিই যেন কোণঠাসা বেত্রাহত পশুর মত তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার করে ওঠে, না—না!

হাঃ হাঃ করে পৈশাচিক হাসি হেসে ওঠে নিশিকান্ত।

সমগ্র কক্ষখানি সেই হাসির শব্দে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে।

দু'হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে কাঁপতে কাঁপতে একটিমাত্র শব্দই কিটি বলতে থাকে, না—না—না!

তবে বল্—এখনও বল্ চাবি তুই কোথায় পেলি?

জানি না—জানি না!

ঠিক সেই মুহূর্তে ইরসাদ এসে কক্ষে প্রবেশ করে। হাতে ইরসাদের ধারালো একখানা বর্মীজ ছুরি।

ঘরের অত্যুজ্জ্বল আলোয় ধারালো ছুরির বক্র ফলাটা যেন ঝিকিয়ে ওঠে।

সে চাপা আক্রোশভরা কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, swine! ইরসাদ— কুত্তার বাচ্চা, তুই?

হ্যাঁ, আমি। অনেক তোর অত্যাচার সহ্য করেছি, আর না—

বাঘের মতোই নিশিকান্ত চিৎকার করে ওঠে আবার, ইরসাদ!

আরে যা! ইরসাদ আর তোর চোখ-রাঙানিকে ভয় করে না!

ইরসাদ ঘরের দরজাটা বন্ধ করে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নিশিকান্তর মুখের দিকে।

ইরসাদের পরিধানে আজ একটা ডোরাকাটা সাধারণ লুঙ্গি ও গায়ে ফতুয়া। দেহের সমগ্র পেশীগুলোর উপরে তীব্র আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। ইস্পাতের তৈরী স্প্রিংয়ের মতো দেহের পেশীগুলো যেন মনে হচ্ছে এখুনি এই মুহূর্তে সক্রিয় হয়ে উঠবে।

BanglaBook.org

এক পা এক পা করে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে এগিয়ে আসছে ইরসাদ। ঝোপের আড়াল হতে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র তাঁর শিকারের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বার পূর্বমুহূর্তে যেমন এগিয়ে আসে।

স্থির অকম্পিত দৃষ্টিতে ইরসাদের আক্রমণোদ্যত ভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে আছে নিশিকান্ত।

পোষা কুকুরের মত কতদিন পড়ে পড়ে চাবুকের আঘাত, লাথির পর লাথি, জুতার ঠোক্কর খেয়েছে মুখ বুজে যে ইরসাদ, কোনদিন এতটুকু ব্যতিক্রমও দেখেনি নিশিকান্ত, আজ সেই ইরসাদই রুখে দাঁড়িয়েছে।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নিশিকান্তর। রক্তপায়ী বাঘের বাচ্চাকে অঙ্কুশের আঘাত হেনে কেমন করে পায়ের নীচে দাবিয়ে রাখতে হয় তা সে জানে। ইরসাদ আক্রমণের চরম মুহূর্তের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে জেনেও নিশিকান্ত একান্ত নির্বিকার ভাবেই দাঁড়িয়ে— কেবল দু'চোখের দৃষ্টি ঐদিকে স্থিরনিবদ্ধ।

জমাট মৃত্যুর মতই স্তব্ধতা সমগ্র কক্ষটির মধ্যে যেন থম্‌থম্ করে। চরম মুহূর্তের পূর্বে মৃত্যুশীতল একটা অস্বোয়াস্তিকর স্তব্ধতা যেন। দু'জনের মাঝখানে মেঝের উপরে বসে বর্মী মেয়ে কিটি। সহসা কিটি ইরসাদের ভয়ংকর মুখের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ওঠে, এই না—না! এখান হতে তুই যা—তুই যা!

নিশিকান্তর মাথার মধ্যে এতক্ষণ অসংখ্য চিন্তা ঘূর্ণাবর্তের মতই দ্রুত পাক খেয়ে খেয়ে ফিরছিল। কিটির আর্ত তীক্ষ্ণ চিৎকারে হঠাৎ যেন নিশিকান্ত বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতই চম্‌কে ওঠে, এই আসতে দে— আসতে দে ওকে!

কিন্তু ততক্ষণ বিদ্যুৎ চমকের মতই দাঁড়িয়ে উঠে কিটি ছুটে গিয়ে দু'হাতে ইরসাদকে জাপটে ধরেছে, ইরসাদ, না—না—

প্রবল একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কিটির আলিঙ্গন হতে মুক্ত হবার চেষ্টা করে ইরসাদ। কিন্তু চোখের দৃষ্টি তার তখনও নিবদ্ধ থাকে অদূরে দণ্ডায়মান নিশিকান্তর প্রতিই।

॥ ১২ ॥

ওঙ্কারনাথ ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর বোস সাহেব ঘরের মধ্যে একাকী অশান্ত অস্থির পদে পায়চারি করে অনেকক্ষণ।

ওঙ্কারনাথ!

সাংঘাতিক হিংস্র শয়তান লোকটা!

চিবিয়ে চিবিয়ে হেসে হেসে কেতাবী ভাষায় কথাগুলো বলবে অসহ্য একটা মেয়েলী নাকিসুরে, কথা শুনলে মনে হবে অতীব নিরীহ ও শান্তপ্রকৃতির বুঝি লোকটা, কিন্তু ওই হাসির অন্তরালে মৃত্যুগরল ফেনিয়ে ফেনিয়ে ওঠে।

ওঙ্কারনাথ! ওঙ্কারনাথ! কতদিন ও মনে মনে ভেবেছে আচমকা একদিন একটা চোরা গুপ্তি চালিয়ে ওর পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করে শয়তানটাকে শেষ করে দেবে।

দারুণ জিঘাংসায় হাতের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠেছে। একটা পাশবিক লালসা দু'চোখের দৃষ্টিতে সাপের মত হিল হিল করে উঠেছে যেন, কিন্তু কি ভেবে আবার সব কিছু শান্ত হয়ে গিয়েছে।

BanglaBook.org

লোকটা টাকার কুমীর। যখনই প্রয়োজন হয়েছে হাজার দশ-পনের বিশ এক কথায় দিয়ে দিয়েছে। স্বর্ণডিম্বপ্রসূহংস!

মন চায়নি লোকটাকে তাই খুন করতে।

অথচ এও জানে বোস সাহেব, চিরকাল লোকটার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা চলবে না!

একদিন ধারালো ছুরির মুখে বোঝাপড়া একটা হয়ে যাবেই।

মনে পড়ছে দলের অন্যান্য লোকগুলোর কথা!

বিরাজমোহন, চন্দ্রমোহন, শশধর, হীরা সিং, ললিত কুণ্ডু ও রাজেশ্বর।

চন্দ্রমোহন মৃত—শশধরেরই হাতে, বিরাজমোহন কুমারের মামলায় জড়িয়ে ফাঁসিকাঠে ঝুলে প্রাণ দিয়েছে, শশধর আন্দামানে অন্ধকার কারাকক্ষে দিন কাটাচ্ছে।

হীরা সিং নিজের ঔদ্ধত্যে তারই হাতে নিহত, হতভাগ্য ললিত কুণ্ডুও কোন এক অদৃশ্য আততায়ীর অব্যর্থ গুলির আঘাতে রহস্যজনকভাবে মৃত। আজ পর্যন্ত বোঝা গেল না লোকটা কে—কে অমন করে ললিত কুণ্ডুকে মেরে গেল!

রাজেশ্বর দলের সঙ্গে সিংগাপুরে গিয়েছিল। লোকটা ফিরে এসেছে বটে, কিন্তু সেখানকার কোন সঠিক সংবাদই দিতে পারে না। আজ দলে অবশিষ্ট সে নিজে, অরিন্দম সরকার, দাশবাবু ও রাজেশ্বর। একে একে নিভিছে দেউটি! এবারে কার পালা কে জানে?

অকারণ আশংকায় হঠাৎ বোস সাহেবের সর্বাঙ্গে যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে। দলের মধ্যে যদিও এখনও তার প্রতিপত্তি অখণ্ড, মনে হয় তবু কোথায় যেন একটা চিড় খেয়েছে! অরিন্দমের সেই শক্তি ও ক্ষিপ্ততাও আর নেই, দু'দুবার শশাংক ছোকরাকে ধরলে—দু'দুবার অমন আশ্চর্য উপায়ে শশাংককে পালাবার সাহায্য করলে সেই লোকটাই বা কে?

ঠিকমত সমস্ত ব্যাপারটা ও আগে থাকতে জানতেই বা পারে কি করে?

কি করেই বা ওদের গুপ্ত সব কথাবার্তা, যা কারো জানা সম্ভব না সে-সব বাইরের একজন তৃতীয় ব্যক্তি জানতে পারে পূর্বাহ্ণে?

হঠাৎ মনের মধ্যে বোস সাহেবের যেন একটা সন্দেহের কালো ছায়া পড়ে। দলের মধ্যেই কেউ গোপনে বিশ্বাসঘাতকতা করছে না তো!

তাই যদি হয়, তবে কে—কে?

অরিন্দম? অসম্ভব। ব্রজলাল? না, তাও সম্ভব নয়। বেঁটে দাশবাবু? না, তাই বা কি করে হবে! বংশী নাগ? না, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে একেবারে গড়া লোকটা। তাছাড়া এ দলের মধ্যে সে থাকলেও যেন দলের কেউ নয় সে। কোন প্রকারের শয়তানীতেই বংশী পেছপাও নয়, অথচ তবু যেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে। টাকা দিয়ে লোকটাকে কেনা যাবে না! বিচিত্র এক চরিত্রের লোক।

কিন্তু তবে কে? অরিন্দম সরকার নয়, দাশবাবু নয়— সে নিজে নয়, বংশী নাগও নয়—

তবে কে—কে?

ঘরের মধ্যে দ্রুত পায়চারি করে ফিরতে থাকে বোস সাহেব।

মাই গড্! অমন বোঁ বোঁ করে লাট্টুর মত ঘুরপাক খাচ্ছেন কেন স্যার?

আচমকা ফিরে তাকায় বোস সাহেব, কে, বংশীবাবু!

ইয়েস স্যার! ইওর মোস্ট ওবিডিয়েন্ট—

বসো, বসো—তোমার কথাই একটু আগে ভাবছিলাম। একটা কথার জবাব দেবে বংশীবাবু?

BanglaBook.org

আজ্ঞা করুন!

আচ্ছা বেওয়ারিস লাশ সম্পর্কে তুমি এত নিষ্ঠুরভাবে দিলদরিয়া কেন?

বলেন কি স্যার! এর চাইতে আর পুণ্যকর্ম আছে নাকি? স্বয়ং যমরাজের এজেন্সি—কতখানি honourable and respectable post, বলুন তো? তাছাড়া ভবনদীর পারে যাওয়া মানেই এই সংসারের যাবতীয় জঘন্য ও ঘৃণ্যতম পরিস্থিতি হতে সশরীরে মুক্তি! চুরি নেই, জোচ্চুরি-জালিয়াতি নেই—সব চাইতে বড় কথা পেটের জ্বালা ও মাথা গোঁজার বালাই নেই, একেবারে তুরীয় অবস্থা যাকে বলে! না স্যার, আপনার দেখছি জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন হতে এখনো অনেক দেরি!

বসো না বংশী—ঐ চেয়ারটার ওপরে আরাম করে বসো! বোস সাহেব বংশীকে সাদর আহ্বান জানান।

চেয়ারটার উপরে বসতে বসতে বংশী বলে, মাই গড্! ব্যাপারটা ঠিক কি বলুন তো স্যার? হঠাৎ গজল থেকে একেবারে কীর্তনের ঢং!

পকেট হতে সোনার সিগারেট কেসটা বের করে, কেস হতে একটা 'হ্যাস্‌হিস্'য়ের তৈরী স্পেশাল সিগারেট বের করে বংশীর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বোস সাহেব বলে, নাও বংশীবাবু, তোমার সাদা পুরিয়া একটা খাও!

আরে, এ যে মেঘ না চাইতেই জল! নো, নো— very serious বলে মনে হচ্ছে! মাইরি বলছি বোস সাহেব, বংশীধর নাগের হার্টের পালপিটেশন শুরু হয়ে যাচ্ছে—

ধরাও না হে!

দিন। বংশী নাগ পরের দেওয়া সাপের বিষও খেতে পারে— তা এ তো সামান্য হ্যাস্‌হিস্!

বংশী হাত বাড়িয়ে হ্যাস্‌হিসের তৈরী সিগারেটটা নিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করে বেশ খোশমেজাজে প্রচণ্ড একটা টান দিয়ে কটু-গন্ধ খানিকটা ধূমোদ্গীরণ করে।

তারপর নেশার আমেজে দুটি চক্ষু মুদে বলে, পেন্নাম— পেন্নাম করি আমাদের কবি সুকুমার রায়চৌধুরীর গড়ে! আহা কি কবিতা রে—

আজব রকম কল করেছে বদ্যিনাথের খুড়ো!

কবি বেঁচে থাকলে request করতাম তাঁকে এমনি আর একটি কবিতা লিখে দিতে আমাদের বোস সাহেবের আজব পুরিয়াকে নিয়ে।

বংশী!

অ্যাঁ! সিগারেটটা টানের পর টান দিয়ে ধূমোদ্গীরণ করতে করতে বংশী নাগ কোনমতে জবাব দেয়।

BanglaBook.org

॥ ১৩ ॥

হঠাৎ একসময় প্রশ্ন করে বোস সাহেব, বংশীবাবু!

Yes মাই লর্ড!

আচ্ছা সে রাত্রে শশাংককে দক্ষিণেশ্বরের বাগানবাড়ি থেকে ও তার আগে ডায়মণ্ডহারবারের বাগানবাড়ি থেকে যে লোকটা পালাতে সাহায্য করেছিল সে লোকটা কে জান?

লোকটাকে চিনি, যাতায়াত আছে, কথাবার্তাও হয়—তবে আসল পরিচয়টি তাঁর আজও জানতে পারিনি, এবং জানবার জন্য আমার অবশ্য মাথাব্যথাও নেই!

তার আস্তানাটা—

উঁহু বাবা, তাতেও সুবিধা হবে না—কারণ সে যে কোথায় থাকে আর কোথায় থাকে না—শিবেরও father not know ! তাছাড়া লোকটা সত্যি সত্যিই জেন্টেল্‌ম্যান—

কিন্তু তাঁর পাত্তাটা যে আমার একান্তভাবেই প্রয়োজন।

খুঁজে দেখুন—সুকুমার কবিই তো বলেছেন, চেষ্টায় কি না হয়—

আমি তোমার help চাই বংশীবাবু।

সেটি হবে না স্যার! বেওয়ারিশ লাশ পাচার করতে বলো, গুম্ করতে বলো কাউকে— বংশী নাগ is always at your service, কিন্তু এক পার্টির সংবাদ অন্য এক পার্টিকে বেচা-কেনা—না স্যার, ওসব ভাল কাজ বংশী নাগের ধাতে সয় না!

টাকা পেলেও নয়?

উঁহু!

বোস সাহেব কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে কি যেন ভাবে, তার পর বলে হুঁ—আচ্ছা আর একটা কথা—

বলুন?

ওঙ্কারনাথকে চেনো তো?

কৌতুকে নেচে ওঠে বংশীর চোখের তারা দুটো হঠাৎ, মুখখানা যেন অকারণেই প্রসন্ন হয়ে ওঠে, বলে তা একটু-আধটু জানি বইকি—আপনাদের হিতৈষী যখন, কিন্তু হঠাৎ তাঁর কথা কেন বলুন তো স্যার?

তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চাই। তোমাকে খুলেই বলি তবে, শোন—

Good God! তা'হলে এতদিনে দলে ভাঙ্গন ধরেছে বলুন! বাহবা! তা না হলে আর ভারতীয় ভিলেন বলেছে কেন? একটা promise নেই, একটা strength of character নেই—সত্যি জাতটা একেবারে জাহান্নামে গিয়েছে! প্রায় দুশো বছরের পরাধীনতা ও ফিরিঙ্গীর দমননীতি জাতটার মেরুদণ্ডটাই একেবারে বেঁকিয়ে দিয়েছে। মুক্তিদাতা কোন সাধুপুরুষ তো দূরের কথা, অতি নিম্নস্তরের সত্যিকারের একটা ভিলেন হবারও আজ এদের শক্তি নেই। নাঃ, দেখছি আর একটা নয়া রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে! দিন দেখি স্যার, আর একটা শ্বেতপুরিয়া, নেশাটাই আজ দেখছি মাটি হয়ে গেল!

বোস সাহেব আর একটা হ্যাস্‌হিস্ সিগারেট সোনার কৌটো হতে বের করে বংশীর দিকে এগিয়ে দেয়।

শোন বংশীবাবু, ওঙ্কারনাথ সত্যিই অসহ্য হয়ে উঠেছে।

তা হওয়াটাই স্বাভাবিক, এসব ক্ষেত্রে শক্তি ও দলপতিত্বের মোহ সত্যিই সাংঘাতিক কিন্তু becareful বোস সাহেব, ওঙ্কারনাথ is a dirty venomnous snake!

হোক। পরোয়া করি না। আগে ওঙ্কারনাথ, তারপর তার সেই ঘুঘু কর্তাটি—

এবারে হা-হা করে হেসে ওঠে বংশী।

হাসছো কেন?

তার কারণ ভিলেন হিসাবে আপনার ওপর আমার অবশিষ্ট যেটুকু শ্রদ্ধা ছিল তাও আর রইলো না দেখছি আজ থেকে। একটু থেমে আবার বংশী বলে, না স্যার, এ পথ ছেড়ে দিন, এ পথ আপনার নয়। সত্যকারের ভিলেনের জাতই আলাদা।

বংশী! চাপা গর্জন করে ওঠে বোস সাহেব।

BanglaBook.org

বংশী ততক্ষণ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, চলি স্যার। Good night!

বোস সাহেব ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে, কণ্ঠস্বর মোলায়েম করে তাড়াতাড়ি বলে, চললে যে? আরো কথা আছে, বস—বস।

না স্যার, আর কোন কথা নয় আপনার সঙ্গে, অদ্যই শেষ রজনী—শেষ রজনীর শেষ কথা অদ্যই হয়ে গেল। তবে একটা কথা যাবার আগে বলে যাই, আপনাদের এবারকার প্ল্যান বোধ হয় তো শেষ পর্যন্ত ভণ্ডুল হয়েই যায় বুঝিবা—

দাঁড়াও বংশীবাবু, এ কথার মানে কি? শোন—শোন—

মানে অতি সহজ। নিশিকান্ত চায় নীলিমা, বোস সাহেব চান ওঙ্কারনাথের মৃত্যু এবং মাঝখানে কোথা হতে উদয় হয়েছেন এক মুখোশধারী যাদুকর এবং ঐ সঙ্গে জাল ফেলেছে সুব্রত রায়। তার চাইতে বলি কি, এবার এ সংকল্পটা ত্যাগ করে try your luck somewhere else! তাছাড়া দেশের ভাল না করতে পারেন, এমন ক্ষতিটা না-ই বা করলেন—

বংশীবাবু! তীক্ষ্ণ গর্জন করে ওঠে বোস সাহেব।

মাই গড্! চটছেন কেন? Poor বংশীধর নাগের সামান্য একটা suggestion মাত্র—accept করা না করা your honourয়ের সম্পূর্ণ মর্জি!

তাহলে কি বুঝবো বংশী, শেষ পর্যন্ত তুমিও—

চলি স্যার। মেজাজটা আজ আপনার যেন কেমন কেমন বলে মনে হচ্ছে। যত সব আবর্জনা ধুলোবালি নিয়ে একটা ঝড় উঠবে এ যেন তারই পূর্ব সংকেত!

বংশী সামরিক কায়দায় একটা স্যালুট দিয়ে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। বোস সাহেবও আর তাকে বাধা দেয় না।

বংশী ঘর থেকে চলে যাবার পরও বোস সাহেব অনেকক্ষণ চেয়ারটার উপরে গুম্ হয়ে বসে থাকে। সত্যি সত্যি মাথার মধ্যে যেন আগুনের ঝড় বইছে।

অকস্মাৎ যেন একটা অশুভ কালো ছায়া বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।

শেষ আশা ছিল বংশী—

আশা ছিল টাকার প্রলোভন দেখিয়ে ঐ বংশী নাগের সাহায্যেই ওঙ্কারনাথকে বুঝি শেষ করা যাবে, কিন্তু স্পষ্টই সে-ও অস্বীকার জানিয়ে গেল।

একমাত্র ওঙ্কারনাথকে জব্দ করতে ঐ বংশী নাগই পারত। অসহায় একটা ক্রোধে অপমানে বোস সাহেবের সমস্ত অন্তরটা যেন জ্বলে যাচ্ছে।

কিন্তু আর না, ওঙ্কারনাথও বোস সাহেব দু'জনের এ পৃথিবীতে আর এক সঙ্গে বেঁচে থাকা চলে না।

আগে ওঙ্কারনাথ—তারপর স্বর্ণডিম্বপ্রসূ রাজহংস নিশিকান্ত!

আর ঐ ফচ্‌কে ছোঁড়া সুব্রত রায়! বেটার দেমাক কি! একে একে তিন বেটাকে নিকেশ করতে হবে। বুকপকেট থেকে বোস সাহেব একটা চামড়ার দস্তানা বের করলে—তার আঙুলের অগ্রভাগ ধারালো চক্‌চকে বাঁকানো বিষাক্ত নখর-সংযুক্ত।

বাঘনখ! বাঘনখ!

হঠাৎ মনে পড়ে আর একজনের কথা—বংশী নাগ গেলেও সে আছে, হ্যাঁ, ঠিক—

হাতের পাশেই টেবিলের গায়ে সংলগ্ন একটা ছোট্ট বোতাম টিপতেই পাশের একটা একতলা বাড়িতে বেল বেজে ওঠে— টিং! টিং! টিং! টিং!

BanglaBook.org

ব্রজলাল গোদা হাতী একটা দড়ির খাটিয়ার উপরে শুয়ে ঘর-র শব্দে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল অর্থাৎ তাঁর নিজস্ব ভাষায় নিদ্রে দিচ্ছিল।

বেলের শব্দে বিরক্তিভরে পাশ ফিরে আবার শুল।—নাঃ, শালা একটু ঘুমুতেও দেবে না! বাজা শালা—বাজা কত বাজাবি! বলতে বলতে ঘুমোবার আবার চেষ্টা করে গোদা হাতী।

কিন্তু ঘণ্টি থামে না, ক্রমান্বয়ে টিং টিং করে বেজেই চলে একটানা। অবশেষে একান্ত বিরক্ত হয়েই উঠে বসে ব্রজলাল। একে শীতের রাত, ঠাণ্ডাটাও আজ রাত্রে বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে তার উপরে। গায়ের কম্বলটা ঠেলে ফেলে দিতেই খোলা জানলাপথে একঝলক ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়া এসে যেন হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়ে গেল।

দেওয়ালের গায়ে পেরেকের সঙ্গে ঝোলানো গরম জামাটা পেড়ে নিয়ে গায়ে দিয়ে নেয় ব্রজলাল। বেলটা কিন্তু তখনও মাঝে মাঝে বেজে উঠছে। হালার পো হালা কর্তার ব্যাপারটা কি! হালার ঘণ্টি বাজবার লাগছে তো লাগছেই!

ঠিক পরের বাড়িটাতেই ব্রজলাল থাকে, এ বাড়িতে আসতে তার বেশী সময় লাগে না।

নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে দেখে ক্রুদ্ধ সিংহের মত পায়চারি করছে বোস সাহেব। ওকে ঘরে ঢুকতে দেখেই থমকে দাঁড়াল। তারপর ডাকে, ব্রজ!

আইজ্ঞা করতা—

এখনি যা, দাশবাবুকে বলবি এখুনি এখানে আসতে। বলতে বলতে হাত-ঘড়ির দিকে বারেক চেয়ে বললে, রাত এখন সাড়ে এগারটা, সাড়ে বারোটার মধ্যে তার এখানে আসা চাই।

আইজ্ঞা—ব্রজলাল মাথা হেলিয়ে আবার থপথপ করে পায়ের শব্দ তুলে ঘর হতে বের হয়ে গেল।

হ্যাঁ, দাশবাবু আর সেই সঙ্গে ব্রজলাল—

একটা শিয়ালের মত ধূর্ত অন্যটা নিরেট গর্দভ। তবে দুজনে মিলে ঠিক কাজটা তার হাসিল করতে পারবে।

ওঙ্কারনাথ—আগে ওঙ্কারনাথ— তারপর নিশিকান্ত!

বোস সাহেব আবার পায়চারি করতে থাকে।

॥ ১৪ ॥

সুব্রতর আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ির শয়নকক্ষ। মুখোমুখি দুটো চেয়ারের উপরে বসে সুব্রত আর নীলিমা। রাত্রি দশটা।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন নীলিমা দেবী, ঘূণাক্ষরেও আপনার কথা প্রকাশ হবে না। আপনার পরিচয় পুরোপুরিই গোপন রাখা হবে শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু—

কাল রাত্রেই raid করা হবে আসল ঘাঁটি—

কিন্তু সত্যই কি আপনি মনে করেন সুব্রতবাবু, তাতে কোন ফল হবে?

দলপতিকে যদি ধরতে পারি—

আপনি তো এখনো জানেন না— আসলে দলপতি কে? who is the ring leader!

জানি না সত্যি, কিন্তু অনুমান একটা করেছি। এ ক'দিন যতপ্রকার অনুসন্ধান সম্ভব

BanglaBook.org

করেছি—তাতে এই বিশ্বাসই আমার হয়েছে বোস সাহেবই দলপতি এবং তার ঘাঁটির সন্ধানও পেয়েছি। একটু থেমে আবার বলে, ইরসাদের লোকটা মরবার সময়ও সেই কথাই বলে গিয়েছে!

কিন্তু সে যে স্রেফ একটা ধাপ্পা দিয়ে যায়নি, বুঝলেন কি করে?

ধাপ্পা! না না— তা সম্ভব নয়। আর তা যদি হয়ও, একটা আড্ডার সন্ধান যখন পেয়েছি— তাহলে কাল রাত্রেই!

হ্যাঁ। আপনি এখান হতে direct বাড়ি চলে যান। যদি নতুন কোন কিছু জানতে পারেন, আমাকে ফোনে জানাবেন।

বেশ।

নীলিমা উঠে দাঁড়াল।

সেই রাত্রে নিশিকান্ত চিৎপুরের বাড়িতে।

ইরসাদ বাঘের মতই চিৎকার করে ওঠে, না না— অনেক সহ্য করেছি, আজ ওরই একদিন কি আমারই একদিন!

ইরসাদ! এতক্ষণ পরে নিশিকান্তর গলা শোনা যায়, তুই এই মুহূর্তে কিটিকে নিয়ে আমার বাড়ি থেকে চলে যা!

অভাবনীয় আদেশ।

ইরসাদ মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ায়।

যা— এখুনি বের হয়ে যা। এ বাড়িতে আর তোর স্থান নেই।

তাই—তাই চল, এখান হতে আমরা চলে যাই। কিটি বলে ওঠে।

নিশিকান্ত দু'পা এগিয়ে আসে। আবার বলে, যা—এখুনি বের হয়ে যা হারামজাদা। বেরো—

কিটি ইরসাদের শরীরে একটা ধাক্কা দিয়ে বলে, চল চল—তাই চলে চল—

নিশিকান্ত এই ফাঁকে আরো দু'পা এগিয়ে আসে।

বজ্রকণ্ঠে ইরসাদ প্রতিবাদ জানায়, না! সরে যা কিটি—

ঠিক এই সময় চোখের পলকে যেন এক লাফ দিয়ে নিশিকান্ত এতদিনের খোঁড়া পঙ্গু লোকটা ইরসাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুহূর্তে তাকে বাঘনখ দিয়ে সজোরে আঘাত করে।

ইরসাদের বাঁ কাঁধের উপরে আঘাতটা লাগে।

ইরসাদও চকিতে ঘুরে তার হাতের তীক্ষ্ণ বর্মী ছোরাটা দিয়ে নিশিকান্তকে আঘাত করবার চেষ্টা করে, কিন্তু বিদ্যুৎগতিতে নিশিকান্ত হেলে পড়ে অবশ্যম্ভাবী আঘাতটা থেকে নিজেকে বাঁচায়।

পাশেই অতি সন্নিকটে ছিল কিটি, তারই পিঠের উপরে আঘাতটা কিছুটা লাগে।

আর্ত চিৎকার করে ওঠে কিটি।

হতভম্ব হতচকিত ইরসাদ মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ঠিক সেই সুযোগ অবকাশে নিশিকান্ত বাঘনখ দিয়ে ইরসাদকে দ্বিতীয়বার আঘাত করে।

কিটির আঘাতটা খুব বেশী না হলেও প্রচুর রক্তক্ষয় হতে থাকে ক্ষতস্থান হতে।

আঘাত খেয়ে নিরস্ত্র ইরসাদ দু'হাতে নিশিকান্তকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করে। কিন্তু নিশিকান্ত সে সুযোগ তাকে দেয় না। উপর্যুপরি বাঘনখ দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করতে থাকে ইরসাদের সর্বাঙ্গে উন্মাদের মত।

ইরসাদ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যন্ত্রণায় রক্তাক্ত অবস্থায়।

কিটিও তখন ঝিম মেরে পড়ে আছে মাটিতে। নিদারুণ রক্তক্ষয়ে ক্লান্ত।

BanglaBook.org

আরো আধ ঘণ্টা পরে।

অর্ধমৃত ইরসাদের রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহটা অক্লেশে কাঁধের উপরে তুলে নিয়ে নিশিকান্ত তার শয়নকক্ষের সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে প্রবেশ করল।

বাথরুমের মধ্যে চোরা দরজাপথ এবং লোহার বাঁকানো সিঁড়ি নীচে সরু একটা গলিতে শেষ হয়েছে। সেই দরজাপথ দিয়ে বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিশিকান্ত ইরসাদের জ্ঞানহীন দেহটা বয়ে নিয়ে গলির শেষপ্রান্তে যেখানে এসে দাঁড়াল, সেটা একটা গ্যারেজ।

একটা মেরুন রংয়ের রোভার গাড়ি গ্যারেজটার মধ্যে ছিল। চাবি দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে ইরসাদের দেহটা গাড়ির মধ্যে রেখে গাড়িতে উঠে বসে নিশিকান্ত স্টার্ট দিল।

অন্ধকার রাত্রি।

তথাপি চিৎপুর রোডে যানচলাচল একেবারে এখনও থেমে যায়নি।

গাড়ি এসে দাঁড়াল সোজা বোস সাহেবের কলুটোলার বাড়ির সামনে এবং সেই বাড়ির সিঁড়ির সামনে নিদারুণ রক্তক্ষয়ে অচেতন ইরসাদকে শুইয়ে দিয়ে নিশিকান্ত আবার গাড়িতে উঠে বসে স্টার্ট দিল।

সেখান হতে সোজা হাওড়া স্টেশনে এক পাবলিক টেলিফোন থেকে সুব্রতকে একটা ফোন করে বের হয়ে এল।

এদিকে অত্যাশ্চর্যভাবে এক ফোন-কল পেয়ে সুব্রত যখন বোস সাহেবের বাড়ির কিছুটা দূরে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে গাড়ি হতে নামল—রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটা তখন বেজে গিয়েছে।

রাস্তাটা একপ্রকার জনহীন বললেও অত্যুক্তি হয় না। অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা, মধ্যরাত্রি যেন ঝিম্‌ঝিম্ করছে। সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চলে।

ঐ তো সামনের ঐ বাড়িটার রোয়াকের উপরে কি একটা সাদামত পড়ে আছে না?

হ্যাঁ।

আরো একটু এগিয়ে যায় সুব্রত। আরো একটু।

একটা যন্ত্রণার অস্পষ্ট গোঙানি যেন ও শুনতে পায়।

আরো একটু এগিয়ে যায়। হ্যাঁ, মানুষই তো! তাহলে বেঁচে আছে নাকি এখনও লোকটা?

তবে যে ফোন করে বললে মৃত!

পকেট হতে শক্তিশালী একটা টর্চবাতি বের করে টর্চের বোতাম টিপল সুব্রত। একটা হঠাৎ আলোর রশ্মি।

সত্যিই একটা লোক রোয়াকের উপর পড়ে মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে।

সুব্রত এগিয়ে গিয়ে পাঁজাকোলা করে লোকটাকে তুলে নিল এবং গাড়িতে এনে তাকে তুলে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

কলুটোলা থেকে সুব্রত সোজা এল মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সীতে।

ইরসাদ মৃত্যুর পূর্বে শেষ কয়েকটা কথা বলে গেল বটে, তবে আশ্চর্য, নিশিকান্ত সম্পর্কে কোন কথা নয়!

বিচিত্র মানুষের মন, মৃত্যুর পূর্বে নিশিকান্তর বদলে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী করে গেল বোস সাহেবকে এবং তার কলুটোলার ঠিকানাটাও দিয়ে গেল।

ইরসাদ মারা গেল।

সুব্রত গায়ের কম্বলটায় ওর মুখটা ঢেকে দিল।

BanglaBook.org

॥ ১৫ ॥

আর কিটি!

জ্ঞান যখন তার হলো— দেখলে ঘরের সেই তীব্র উজ্জ্বল আলো নেই। তার বদলে জ্বলছে রোজকার মত সেই ঈষৎ নীলাভ আলোটা।

বাঁ কাঁধের উপরে অসহ্য যন্ত্রণা। টন্‌টন্ করছে। মাথাটার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করছে। একটু একটু করে অস্পষ্ট স্মৃতির ছায়া মনের মধ্যে আকার নেয়।

নিশিকান্ত! ইরসাদ!

বর্মী মেয়ের বর্মী রক্তস্রোত শিরায় শিরায় যেন সহসা দ্রুত আবর্তিত হয়ে ফেরে।

দেহের যন্ত্রণা ভুলে কোনমতে একসময় অতি কষ্টে উঠে বসল কিটি। উঠেও দাঁড়াল টলতে টলতে তারপর।

ঘরের দরজাটা খুলে টলতে টলতেই অতঃপর নীচে নিজের ঘরে চলে গেল।

এগিয়ে গিয়ে কোনমতে বিছানার সামনে বালিশের তলায় লুক্কায়িত মদের বোতল একটা টেনে বের করলে।

বোতলের মুখ খুলে প্রথমে নির্জলা খানিকটা তরল অগ্নি গলায় ঢেলে দেয়।

তীব্র ঝাঁঝাল আস্বাদ। গলনলী ও মুখবিবরের নরম ত্বক যেন জ্বলে গেল।

গলনলী-পথে তরল অগ্নি পাকস্থলীতে প্রবাহিত হতেই সেখানেও জ্বালা ধরায়। মাথার মধ্যে চন্‌চন্ করে ওঠে। সর্বাঙ্গের শিরা-উপশিরা দিয়ে যেন তপ্ত একটা অগ্নিপ্রবাহ বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলেছে। দেহের কোষে কোষে সেই প্রবাহ অগ্ন্যুত্তাপ ছড়িয়ে যাচ্ছে।

এবারে গেলাসটার মধ্যে খানিকটা মদ ঢেলে কিছুটা নির্জলা গলাধঃকরণ করে বাকিটায় খানিকটা ঠাণ্ডা জল মিশ্রিত করে নিল।

আরো খানিকটা মদ গলাধঃকরণ করে খানিকক্ষণ ঝিম্ দিয়ে বসে থাকে কিটি। তারপর একসময়ে উঠে শয্যায় বিস্তৃত তোশকের তলা থেকে বার করলে ছোট একটা ধারাল ছুরি।

॥ ১৬ ॥

সুব্রতর ডিমলার গাড়ি প্রায় ৬০ মাইল বেগে ছুটে চলেছে চন্দননগরের পথে। পাশে বসে শশাংক। সুব্রতদের গন্তব্যস্থান শশাংকর বসন্তকাকার চন্দননগরের বাড়ি।

কিন্তু এখনও আমি বুঝতে পারছি না সুব্রতবাবু, হঠাৎ বসন্তকাকার ওখানে যাচ্ছেন কেন? আপনি কি স্থিরনিশ্চিত যে এ ব্যাপারে বসন্তকাকাও সংশ্লিষ্ট!

সুব্রত শশাংকর প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না! মনের মধ্যে তখন তার কিছুদিন আগেকার শশাংকর বসন্তকাকাকে দেখে যে চিন্তাটির উদয় হয়েছিল সেই চিন্তাটিই কেবল ঘুরপাক খাচ্ছিল।

চিন্তাটি হচ্ছে ঃ কোন একটি বিশেষ ব্যক্তির অবয়ব ও মুখাকৃতির সঙ্গে আর একজনের অবয়ব ও মুখাকৃতির অপূর্ব নিখুঁত সামঞ্জস্য থাকতে পারে কি না!

বছর ৮/১০ আগে পূর্ববঙ্গের এক বিখ্যাত ধনী জমিদারকে নিহত করে তার বৈমাত্রেয় ছোট ভাই ফেরার হয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ওই ভায়ের নামে যে যৌথ পাটের কারবার ছিল তার

BanglaBook.org

অ্যাকাউন্টে নগদ এক লক্ষ টাকাও উধাও হয়েছিল। টাকাটা তোলা হয়েছিল অবশ্য দুই ভায়ের joint signatureয়েই—যদিও বড় ভাইয়ের সইটা তার ঐ ছোট ভাইটিই জাল করেছিল।

পরে বড় ভাই নিহত হবার পর ছোট ভাই উধাও হলে অনুসন্ধান করতে গিয়ে সব জানা গেল। পুলিসের সিক্রেট বইতে আজও অবিশ্যি সেই গুণধর জালিয়াত ও খুনী ছোট ভাই দ্বিজেনের ফটো ও আইডেনটিটি মার্ক রেকর্ড করা আছে। যদিও তার কোন সন্ধানই আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

মৃত ইরসাদের বডি সার্চ করে একটা পার্স পাওয়া গিয়েছিল। সেই পার্সের মধ্যে দুটি ফটো পাওয়া যায়। একটি তার ও কোন এক বর্মী তরুণীর। দ্বিতীয়টিতে দু'জন পুরুষ। দু'জনেরই পরিধানে বর্মী বেশ। তাদের মধ্যে একজন মৃত ইরসাদ। দ্বিতীয়টির ফটো দেখেই সুব্রতর মনে দেখা দেয় চাঞ্চল্য।

প্রথমটায় সে বুঝে উঠতে পারেনি—মনে হয়েছে কোথায় যেন ঐ মুখাকৃতি অবিকল দেখেছে আর একজনের কিন্তু মনে করে উঠতে পারছে না।

কোথায়? কোথায় দেখেছে?

দীর্ঘ একটা দিন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মতই মনে উদয় হয়েছে আর একখানা মুখ।

মাত্র—হ্যাঁ মাত্র কিছুদিন আগে ঠিক অমনি একখানা মুখাকৃতি দেখেই অন্য আর একটি মুখের সঙ্গে সৌসাদৃশ্যের কথা সুব্রতর মনকে চিন্তিত করে তুলেছিল।

একটি বা দুটি নয়—তিন-তিনটে মুখের আকৃতিই হুবহু এক রকম।

বেশ ও চেহারার এবং বয়েসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য একটু-আধটু অদল-বদল হলেও তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে বোঝা যায় অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য আছে তিনটি মুখাকৃতির— they are one and only one যেন! একে অন্য হতে পৃথক নয়!

এবং মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর কালবিলম্ব না করে সুব্রত শশাংককে নিয়ে চলেছে চন্দননগরে। তার মাথার মধ্যে বর্তমানে একটিমাত্র লোকের নামই ঘুরপাক খেয়ে ফিরছে—বসন্ত ঘোষাল! শশাংকর দূর-সম্পর্কীয় কাকাবাবু!

হঠাৎ সুব্রত প্রশ্ন করে, আচ্ছা শশাংকবাবু, এই বসন্ত ঘোষাল আপনার কি রকম কাকাবাবু?

শশাংক এবারে হেসে ফেলে, কেন পদবী দেখে বুঝতে পারেন না! উনি ঘোষাল আর আমরা মিত্র—উনি ব্রাহ্মণ আর আমরা কায়স্থ!

সুব্রত যেন চম্‌কে ওঠে, তাই তো—তাই তো! সামান্য অথচ এতখানি গুরুত্বপূর্ণ কথাটা তো ওর একবারও মনে হয়নি! আশ্চর্য!

উনি আমার কাকা ডাঃ মিত্রের বন্ধু ছিলেন। কাকার নারকেলডাঙ্গার বাসাতেই বছর দুই আগে ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। কাকার বন্ধু বলে ওঁকে আমি কাকাবাবু বলেই সম্বোধন করেছিলাম। এবং সেই থেকেই তাঁকে কাকাবাবু বলেই ডাকি। কতবার তিনি আমাদের ওখানে এসেছেনও। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও সত্যি তিনি আমায় ভালবাসেন। আমিও তাঁকে ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি এবং নিজের কাকার মতই ভালবাসি।

শশাংকর কাহিনী শুনে সুব্রত একটা আরামের নিশ্বাস টেনে বলে, যাক্ বাঁচা গেল। ব্যাপারটা আগাগোড়াই কেমন যেন ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে মনে হচ্ছিল, এতক্ষণে যা হোক একটা সত্যকারের আকার নিল।

ব্যাপার কি বলুন তো!

BanglaBook.org

আচ্ছা আপনার ঐ বসন্তকাকা সম্পর্কে কতটুকু কি জানেন আমাকে বলতে পারেন মিঃ মিত্র? মানে ওঁর অতীত ইতিবৃত্ত যতটুকু আপনি জানেন,—কোন কথা বাদ না দিয়ে সব বলুন!

আমি—আমি তো তেমন ওঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানি না। তবে কাকার মুখে যা শুনেছি ওঁর জীবন নাকি অত্যন্ত adventurous—রোমাঞ্চকর—

হতেই হবে। গুণী ব্যক্তিদের জীবন রোমাঞ্চপূর্ণই হয়। বলুন বলুন, শুনতে শুনতে যাওয়া যাক।

সুব্রতর গাড়ি তখন অন্ধকারে হেড লাইট জ্বালিয়ে শ্রীরামপুরের লেভেল ক্রসিং পার হয়ে ডাইনে মোড় নিয়ে শেওড়াফুলির দিকে ছুটে চলেছে।

প্রশস্ত রাস্তা এখানে নয় এবং মেটাল রোডও নয়। কাঁচা এবড়োখেবড়ো ধূলায় ভরা সড়ক। ওপাশে ঘন আগাছায় জোনাকির জান্তব আলোর চক্‌মকি আর দূরে পশ্চাতে দেখা যায় শ্রীরামপুর রেলওয়ে স্টেশন ইয়ার্ডের ক্রমবিলীয়মান বাতিগুলো কালো আকাশের বুকে আলোর চুমকির মত এখনো যেন পিছনে হতে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

সুব্রতর দৃষ্টি যদিও স্থিরনিবদ্ধ সামনের রাস্তার দিকে—কান রয়েছে তার শশাংকর দিকে।

মাঝে মাঝে দূরপথের দু-একটা মালবোঝাই লরি চলেছে পাশ কাটিয়ে, দু-একটা ফিরেও আসছে।

শশাংক বলতে শুরু করে ঃ সত্যি বসন্তকাকা লোকটির জীবনকথা যতটা কাকার মুখে শুনেছি—full of adventure! অল্পবয়সে ভাগ্যান্বেষণে একবস্ত্রে কপর্দকহীন অবস্থায় নাকি মগের মুলুকে পালিয়ে যান। সেখানে নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে প্রথমে মউচি মাইনে কাজ করেন, পরে এক চেট্টিয়ারের নজরে পড়ে তার ব্যবসায় গিয়ে ঢোকেন। ক্রমে ভাগ্য হয় সুপ্রসন্ন। ব্যবসায় অংশীদার পর্যন্ত নাকি তিনি হন। যুদ্ধের বছর তিন-চার আগে তিনি বর্মা মুলুক হতে ফিরে এসে চন্দননগরে বাড়ি কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কাকার বন্ধু সুনীল করের সঙ্গেই প্রথমে বসন্তকাকার আলাপ হয় এবং সুনীল করই একদিন বসন্তকাকাকে নিয়ে এসে কাকা ডাঃ মিত্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। বসন্তকাকা দুটো-তিনটে ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। এবং শুধু ভাষাই নয়—পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় তিনি নাকি ঘুরেছেন। একবার কাকাকে তিনি অনেক টাকা ধারও দিয়েছিলেন। সেই হতেই কাকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা খুব বেশী হয়।

আচ্ছা আপনার বসন্তকাকার ওখানে যে ভানুদেব বলে এক যুবককে দেখেছিলাম সেবারে—তাকে আপনি আর কখনো মানে তাঁর ঐ ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে দেখেছিলেন?

না, সেদিনই প্রথম আমি ভানুদেবকে দেখি।

আর ঐ ভৃত্য—বঙ্কিম?

তাকে আরো দু-একবার দেখেছি।

।। ১৭ ।।

সুব্রতর গাড়ি চন্দননগরে বসন্ত ঘোষালের বাড়ির সামনে এসে যখন পৌঁছাল—রাত্রি তখন সোয়া এগারটা। এর মধ্যেই ছোট শহর প্রায় নিঝুম হয়ে এসেছে। গেটটা খোলাই ছিল—গাড়ি নিয়ে সোজা বাড়ির পোর্টিকোর নীচে এসে না দাঁড়িয়ে গেটের বাইরে একটু আড়ালে গাড়িটা পার্ক করে সুব্রত শশাংককে নিয়ে গাড়ি হতে নামল।

BanglaBook.org

গাড়ি এখানেই দাঁড় করালেন—ভিতরে নিয়ে যাবেন না সুব্রতবাবু!

না। চলুন, হেঁটেই যাবো।

দরজার কড়া ধরে নাড়া দিতেই একটু পরে বঙ্কিম এসে দরজাটা খুলে দিল। আগেই বারান্দার আলোটা বঙ্কিম জ্বেলে দিয়েছিল।

বঙ্কিম, কাকাবাবু আছেন? শশাংক প্রশ্ন করে।

ভিতর হতে ভানুদেবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কে রে বঙ্কা!

ভানুদেবের 'বঙ্কা' ডাকে বঙ্কিম হঠাৎ যেন কেমন একটু বিব্রত হয়ে পড়েছে, ওর মুখের দিকে চাইলেই বোঝা যায়।

সুব্রত শশাংকর ঠিক পশ্চাতেই দাঁড়িয়ে সামান্য একটু আড়াল করে নিজেকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বঙ্কিমকে পর্যবেক্ষণ করছিল।

বঙ্কিমের বেশভূষার আজ যেন বেশ একটু চটক আছে। পরনে একটা দামী সিল্কের লুঙ্গি ও গায়ে গরম সোয়েটার। ঠিক ভৃত্যের বেশ নয়। বঙ্কিম ভানুদেবের প্রশ্নে কোন সাড়া না দেওয়ায় ভানুদেব বোধ হয় এগিয়ে আসছিল, কিরে শালা, রা কাড়ছিস না কেন!

ভানুদেব এসে দাঁড়াল বঙ্কিমের পাশেই এবং দরজার ঠিক সামনেই শশাংককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথমটায় বোধ হয় চিনতে না পেরে কেমন একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণেই শশাংককে চিনতে পেরে সোল্লাসে বলে ওঠে, আরে! কে ও, আমাদের শশাংকবাবু না? তা হঠাৎ এত রাত্রে এখানে কি মনে করে?

হঠাৎ এমন সময়ে পশ্চাতে সুব্রতর দিকে দৃষ্টি পড়ায় বলে ওঠে, ও কে, অ্যাঁ!

আড়াল থেকে এবারে সুব্রত এগিয়ে এসে আত্মপ্রকাশ করলে, আমি সুব্রত মিঃ ভানুদেব—

অ্যাঁ, তাই তো! তাই তো—তা হঠাৎ এই unearthly hourয়ে—এই চন্দননগরে!

এলাম।

তা তো বুঝলাম, কিন্তু ব্যাপার কি বলুন—

বসন্তবাবুর সঙ্গে বিশেষ একটা জরুরী কাজে—সুব্রত বলে।

এই রাত্রে! সমস্ত দিন সময় হলো না? কিন্তু মিঃ সুব্রত রায়, very sorry —তিনি তো এখানে নেই!

নেই? তবে কোথায়?

দেবা ন জানন্তি কুতঃ মনুষ্যা! সামান্য মানুষ আমি—কখন তিনি কোথায় থাকেন, কোথায় যান তা একমাত্র তিনিই জানেন!

কিছুই আন্দাজও করতে পারেন না কোথায় গিয়েছেন বা কোথায় গেলে তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে?

হয়ত কলকাতা—নয় দিল্লী নয় লক্ষ্ণৌ নয়ত লাহোর কিংবা রাওলপিণ্ডি অথবা কাশ্মীর! সর্বত্রই তিনি আছেন—বলতে পারেন বিরাজমান সর্বভূতে!

মিঃ ভানুদেব! তীক্ষ্ণ স্পষ্ট স্বরে সুব্রত বলে, আমি আপনার ঠাট্টা-ইয়ারের পাত্র নই। জানেন যদি তো বলুন—নয়ত আপনার রসিকতা শুনবার মত আমার সময়ও নেই, স্পৃহাও নেই।

ওঃ, নেই বুঝি। তবে আপনিই বা কোন্ রসিকতা করতে এই মাঝরাত্রে লোকের ঘুম ভাঙিয়ে বসন্তবাবুর সন্ধান করতে এসেছেন এখানে বলুন তো!

BanglaBook.org

ভানুদেবের কথায় সুব্রতর সর্বাঙ্গ যেন জ্বালা করে ওঠে, কিন্তু মনের দুঃসহ ক্রোধ মনেই চেপে রেখে শান্ত স্বরে বলে, প্রয়োজন ছিল বলেই এসেছিলাম। তা আপনি যখন জানেন না, চলুন শশাংকবাবু—

সুব্রত শশাংকর হাত ধরে আকর্ষণ করে।

হতবাক শশাংকর হাত ধরে একপ্রকার টানতে টানতেই সুব্রত বাইরের দিকে পা বাড়ায়। পশ্চাতে ভানুদেবের অট্টহাসি শোনা যায়।

ভানুদেব হাসছে—হাঃ হাঃ হাঃ!

তীব্র বিদ্রূপাত্মক সেই হাসির প্রতিটি শব্দ যেন ওদের পশ্চাতে পশ্চাতে ওদের তাড়িয়ে নিয়ে চলে সামনের দিকে।

রোষকষায়িত লোচনে অরিন্দম সরকারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে বোস সাহেব।

বোকার মতই আর একপাশে দাঁড়িয়ে ব্রজলাল গোদা হাতী ও তার পাশে দাঁড়িয়ে দাশবাবু।

অরিন্দম সরকার যেন কি বলবার চেষ্টা করে কিন্তু বলা হলো না, বাঘের মতই হঠাৎ গর্জন করে ওঠে বোস সাহেব, stop—stop you fool!

বোস সাহেবের চিৎকারে আচমকা যেন একটা হেঁচকি তুলে থেমে গেল অরিন্দম সরকার।

লজ্জা করে না—লজ্জা করে না তোমার অরিন্দম বোকার মত অমন করে হাসতে! রোগাপটকা একটা সেদিনকার ছোকরা শশাংক, আজ পর্যন্ত বেটাকে তোমরা সকলে মিলে জব্দ করতে পারলে না!

অরিন্দম সরকার তার হাসি থামিয়েছে বটে কিন্তু তার সমগ্র মুখখানা ব্যেপে যেন নেমেছে একটা বিষণ্ণ কাতর ছায়া।

জলের মত কেবল অর্থই ব্যয় হয়েছে অথচ এক্স্‌পেরিমেন্টের কপিটা আজ পর্যন্ত হাতানো গেল না! বলতে লাগল বোস সাহেব, যত সব অপদার্থ নিষ্কর্মার দল—

বোস সাহেব ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করতে থাকে, শেষে অরিন্দম সরকারের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে, শোন, সংবাদ পাওয়া গিয়েছে সুনীল করও নাকি হীরা সিংয়ের সঙ্গে একই জাহাজে সিংগাপুর থেকে চলে এসেছিল। এবং সে এখন কলকাতাতেই। বজবজে বোধ হয় তো কোথায়ও আছে। কারণ কয়েকদিন আগে মান্‌কে তাকে বজবজের গঙ্গার ধারে এক বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে, মান্‌কে নীচেই আছে— সে-ই বাড়িটা দেখিয়ে দেবে, তাকে সঙ্গে নিও। যেমন করে হোক কালকের মধ্যেই সুনীল করকে এখানে ধরে নিয়ে আসা চাই।

বেশ, যাবো। ব্রজলালও আমার সঙ্গে চলুক। অরিন্দম সরকার বলে।

না। ব্রজলাল আমার সঙ্গে যাবে, বিশেষ একটা জরুরী কাজ আছে।

বেশ, ব্রজলাল না যায় দাশবাবু চলুক আমার সঙ্গে!

না, দাশবাবুও যাবে না—তাকেও আমার প্রয়োজন। জবাব দেয় বোস সাহেব।

এবারে অরিন্দম সরকার আর কোন কথা বলে না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

চোখের ইশারায় বোস সাহেব অন্যান্য সকলকে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যেতে বলে। একমাত্র অরিন্দম সরকার ছাড়া সকলেই ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

অরিন্দম!

বোস সাহেবের ডাকে চম্‌কে মুখ তুলে তাকায় অরিন্দম সরকার, অ্যাঁ!

BanglaBook.org

কি হয়েছে তোমার বল তো সরকার? আজ ক'দিন হতেই দেখছি তুমি যেন সর্বদা চিন্তিত—কি যেন ভাবছ! What's the matter—আমাকে খুলে বল, টাকাকড়ির প্রয়োজন?

না।

তবে?

সে আপনি বুঝবেন না সাহেব, সে আপনি বুঝবেন না।—হঠাৎ যেন কথা বলতে বলতে কতকটা আত্মগতভাবেই বলে ওঠে, কিন্তু না না, এর একটা উপায় আমাকে করতেই হবে—একটা উপায় করতেই হবে—

অরিন্দম সরকার, you look tired—তোমায় যেন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বলে মনে হচ্ছে! তুমি বাড়ি যাও, সুনীল করের সংবাদ তোমায় আনতে হবে না—আমি নিজেই সুনীল করের সন্ধানে যাব।

না, না, আমি—আমিই যাবো। তা ছাড়া যে ব্যাপারের বহুদিন পূর্বেই মীমাংসা শেষ করে দিয়েছি—

কি হয়েছে তোমার বল তো! আজ ঘরে ঢুকতেই সেই ভদ্রলোক সম্পর্কে তোমায় জিজ্ঞাসা করতে তুমি বলে উঠলে, তুমি জানো না—কিছু জানো না সে লোকটা সম্পর্কে! সামান্য একটা কাজ সুনীল করকে ধরে আনা—তার জন্য তোমার আজ ব্রজলাল দাশবাবুর সাহায্যের প্রয়োজন হচ্ছে! কি হয়েছে তোমার? এত দুর্বল ভীরু কবে থেকে হলে, তুমি তো কোনদিনই এমন ছিলে না!

আমাকে ক্ষমা করুন বোস সাহেব। সত্যি আমার দুর্বলতাই—হ্যাঁ, আমি এ দুর্বলতাকে জয় করবো—জয় করবো। বলতে বলতে অরিন্দম সরকার ঘর হতে বের হয়ে যায়।

স্তম্ভিত ভাবে বোস সাহেব তাকিয়ে থাকে অরিন্দম সরকারের গমনপথের দিকে। মুখোশের অন্তরালে তার দু'চক্ষুর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ সংকুচিত হয়ে ওঠে।

॥ ১৮ ॥

বজবজে গঙ্গার ধারে একটা নতুন দোতলা বাড়ি।

উপরের তলায় ভাড়াটে থাকে। নীচে একটা দর্জির দোকান ও একটা রেস্টুরেন্ট পাশাপাশি। দু'খানা একই সাইজের ঘর। রেস্টুরেন্টটায় সব সময়ই প্রায় খদ্দেরের ভিড় থাকে। রেস্টুরেন্টের মালিক বলাই সিংহ।

লোকে বলে বলাইবাবুর রেস্টুরেন্ট। সেই রেস্টুরেন্টের এক কোণে আপাদমস্তক একটা সবুজ আলোয়ানে ঢেকে আধাবয়সী একটি লোক সামনে এক কাপ চা নিয়ে চা-পান করছে। এবং সবুজ আলোয়ানে আবৃত চা-পানরত লোকটির ঠিক কোনাকুনি ঘরের আর এক কোণে বসে আর একটি মধ্যবয়েসী ভদ্রলোক ঘন ঘন প্রথম ব্যক্তির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তির পরিধানে সাধারণ একটি গরম প্যান্ট, গায়ে একটা গলাবন্ধ কালো রংয়ের গরম কোট। মুখে চাপদাড়ি, চোখে পাতলা নীলরংয়ের কাঁচের চশমা।

দ্বিতীয় ব্যক্তির পাশে বসে ধুতি ও কোট পরা মধ্যবয়সী এক ব্যক্তি একটা চায়ের কাপে মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছিল। তাকেই সম্বোধন করে চশমাধারী ব্যক্তি চাপা স্বরে বললে, রাজেশ্বর, ওই যে ঘরের কোণে নীল আলোয়ান গায়ে লোকটা চায়ের কাপ নিয়ে বসে আছে. মাঝে মাঝে এদিক

BanglaBook.org

ওদিক সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, এবারে এদিক তাকাতেই ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখ তো ওকে চিনতে পার কি না?

কে লোকটা?

আগে দেখই না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আলোয়ানে আবৃত লোকটি এদিকে তাকাতেই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি চম্‌কে ওঠে এবং বিস্মিত কণ্ঠে বলে, আরে! আশ্চর্য! আমাদের সুনীল কর না?

চুপ! আস্তে। হ্যাঁ, সুনীল করই।

সুনীল কর তাহলে কলকাতায় ফিরে এসেছে?

হ্যাঁ, খুব সম্ভব ক্রিশ্চানা জাহাজেই অন্যান্য এভ্যাকুইদের সঙ্গে ফিরে এসেছে। ওকে যেমন করে হোক আমাদের ধরতে হবে—আজ ক'দিন ধরে ওর পিছনে পিছনে আমি ঘুরছিলাম।

কিন্তু—

এই বাড়িতেই দোতলায় ও থাকে। এখুনি হয়ত ও উঠবে। আমরা ওকে অনুসরণ করবো—বলতে বলতে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে—তুমি ওর ওপরে নজর রাখো, আমি গাড়িতে যাচ্ছি—বেশটা একটু অদলবদল করতে হবে। গাড়ির মধ্যেই আমি অপেক্ষা করবো, ওকে উপরের তলার দিকে যেতে দেখলেই তুমি আমায় গিয়ে খবর দেবে।

বেশ।

চশমাধারী ব্যক্তি রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে গেল। রেস্টুরেন্ট থেকে অল্পদূরে রাস্তার একপাশে অন্ধকারে প্রকাণ্ড একখানা ক্যাডিলাক গাড়ি পার্ক করা ছিল। ড্রাইভারের সীটে বসে একজন পাঞ্জাবী ড্রাইভার—চশমাধারী চট্‌পট্ এসে গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করল। গাড়ির ভিতরের আলোটা জ্বালিয়ে দিতেই উজ্জ্বল আলোয় গাড়ির ভিতরটা আলোকিত হয়ে ওঠে। সীটের একধারে ছোট একটা সুটকেস ছিল, সেটা খুলে ফেলে লোকটি। একটা আয়না, স্পিরিটগাম, নকল একটা নূরদাড়ি আর পাকানো একটা গোঁফ বের করে মুখের চাপদাড়িটা খুলে ফেললে। চাপদাড়ির বদলে মুখে এবারে এঁটে বসলো চমৎকার নূরদাড়ি ও পাকানো গোঁফ। চোখের নীল কাচের চশমাটা খুলে ফেলে চোখে বসিয়ে নিল কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমের সাধারণ একজোড়া চশমা।

সম্পূর্ণ অন্য চেহারা এবারে। পকেট হতে পাইপ ও টোবাকো পাউচটা বের করে, পাইপের মধ্যে খানিকটা টোবাকো ঠেসে, দাঁতের সাহায্যে পাইপটা মুখে চেপে ধরে পাইপে অগ্নিসংযোগ করলে। গাড়ির নরম ব্যাক্ সীটে আরাম করে হেলান দিয়ে বসে ধূমপান শুরু করলো।

প্রায় আধ ঘণ্টাটাক পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি হন্তদন্ত হয়ে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়, সুনীল কর তার শয়নকক্ষে ঢুকেছে—ঐ দেখুন ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে!

রাজেশ্বর! সম্বোধনকারীর নাম রাজেশ্বর।

বলুন?

তুমি গাড়ির মধ্যে এসো।

রাজেশ্বর গাড়ির মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে। গাড়ির ভিতরের আলোটা সঙ্গে সঙ্গে নিবিয়ে দেওয়া হয়।

অন্ধকারে সিগারেট কেস হতে একটা সিগারেট বের করে চশমাধারী ব্যক্তি বলে, তোমার ব্যবহার ও সততায় সত্যিই আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছি রাজেশ্বর। তোমার আমার মধ্যে যে চুক্তি

BanglaBook.org

হয়েছে সেই চুক্তি মত অর্ধেক পাঁচ হাজার টাকার একটা চেক আজই তোমাকে দেবো। বাকী টাকাটা কাজ শেষ হলেই পাবে—বলতে বলতে বুকপকেট থেকে একটা ভাঁজকরা চেক বের করে রাজেশ্বরের দিকে এগিয়ে দেয়, এই নাও—বেয়ারার চেক, ভাঙাতে কষ্ট হবে না। তাছাড়া ব্যাঙ্কে আমার instruction দেওয়া আছে। কালই সকালে 1st hour য়ে চেকটা ভাঙিয়ে নিও...এই টাকা মূলধন করে এবারে তুমি চেষ্টা কর নতুন জীবন গড়ে তুলবার জন্য।

আপনার এ ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারবো না স্যার!

রাজেশ্বরের দু'চোখের কোলে জল ভরে ওঠে।

অন্ধকারে নিঃশব্দে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে।

॥ ১৯ ॥

নিজের ঘরে—কলকাতায় ফিরে অবধি এইখানে দোতলায় যে ঘরটি সেইটাই ভাড়া নিয়ে সুনীল কর আছে। সেই ঘরের মধ্যেই বসে বসে একটা খাতায় খস্ খস্ করে কি যেন সে লিখছে।

না—আর নয়। সমস্ত চেষ্টাই তো ব্যর্থ হলো। সেদিন রাত্রে নির্জন সমুদ্রতীরে অজয়ের সেই শেষ আর্ত চিৎকার এখনো যেন কানের মধ্যে আমার বাজছে। শুধু টাকার লোভে যে পাপ কাজ করতে বিবেক মনুষ্যত্ব সব কিছু বিসর্জন দিয়েছিলাম, সেই পাপের অলঙ্ঘ্য অভিশাপ আজ দিবারাত্র সর্বক্ষণ আমায় প্রেতের মতই তাড়া করে নিয়ে ফিরছে। শয়নে স্বপনে জাগরণে সর্বক্ষণ দেখি সেই রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ বিভীষিকা।

ক্ষমা! ক্ষমা করো বন্ধু—ক্ষমা করো!

কিন্তু শুধু কি অর্থের লোভেই ও কাজ আমি করেছিলাম?

না না, হিংসা—তাঁর সৌভাগ্যের হিংসা আমায় পাগল করে তুলেছিল। মনে মনে হয়ত চিরদিনই তাঁর সৌভাগ্যকে, তাঁর গৌরবকে, তাঁর সাফল্যকে আমি হিংসা করেছি। হ্যাঁ, সেই হিংসাই আমায় এ সর্বনাশা পথে হাতছানি দিয়ে ডেকে এনেছিল।

সেদিন সিংগাপুরে মার্কেটের সামনে অজয়কে দেখে চম্‌কে উঠেছিলাম। তখন পালালেও শেষ পর্যন্ত ঠিক সে আমায় খুঁজে বার করলে। কপিটা পাওয়ার আর সহজ কোন উপায় নেই দেখে হীরা সিংয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা চিঠি দিয়ে তাকে নির্জন সমুদ্রতীরে দেখা করবার জন্য ডেকে পাঠালাম। জানতাম সে আসবে।

ওদিকে জাপানী কন্‌সাল বলে বসেছে—Original copy ছাড়া সে accept করবে না, তাছাড়া completeও নয় সেটা, আসল mathematical portion টুকুই নাকি তার মধ্যে নেই।

হীরা সিং বললে, ডাক্তার নিজে যখন এতদূর ছুটে এসেছে যেমন করে হোক ওর কাছ থেকে সব কিছু জেনে নিতে হবেই।

কিন্তু আমি জানতাম অজয় সে প্রকৃতির লোক নয়। মৃত্যুকে বরণ করে নেবে সে, তথাপি মুখ খুলবে না। তবু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি!

নির্দিষ্ট সময়েই অজয় এলো। তাকে সব বললে হীরা সিং। আমি আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে রইলাম আত্মগোপন করে।

অজয় বললে, কিন্তু where is Sunil? তাঁর চিঠি পেয়েই এখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমি। তাঁর সঙ্গেই আমার কথা হবে।

BanglaBook.org

বেশ তো—আমাদের বাসায় চলুন, সেখানেই সুনীলবাবুর সঙ্গে দেখা হবে এবং সেইখানেই সব কথা হবে। ললিত বলে।

অল্প দূরে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব আমি শুনতে পাচ্ছি ওদের কথা।

না, তোমাদের সঙ্গে আমার কোন কথাই নেই। তাছাড়া অন্য কোথাও যেতেও আমি রাজী নই। অজয় বলে।

যেতে রাজী নন? ললিত বলে।

না।

যদি এখন জোর করে ধরে নিয়ে যাই?

শান্ত দৃঢ় কণ্ঠস্বর, চেষ্টা করে দেখো!

হঠাৎ এমন সময় হীরা সিং ও ললিত কুণ্ডুকে বোধহয় অগ্রসর হতে দেখেই অজয় পালাবার চেষ্টা করে শেষবারের মত।

চকিতে হীরা সিং একটা পিস্তল বের করে, যাবেন কিনা ডাক্তার বলুন?

না।

হঠাৎ এমন সময় অতর্কিতে একপাশ থেকে ললিত কুণ্ডু অজয়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং অনায়াসেই অজয়কে ঘায়েল করে মাটিতে চিৎ করে তার বুকের উপরে চেপে বসল।

আমি তখন আড়াল হতে আত্মপ্রকাশ করলাম, আমি জানতাম একটা কালো রংয়ের মরোক্কো বাঁধাই ডাইরি মত সর্বদা অজয়ের পকেটে থাকত এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় কথা এমন কি অনেক সময় অনেক দুরূহ ম্যাথেমেটিকাল প্রবলেম ও গবেষণা-সংক্রান্ত pointsও ওর মধ্যে মাঝে মাঝে ও লিখে রাখত, ওটা মরে গেলেও কখনো কাছছাড়া করত না।

বললাম, ওর পকেটে একটা নোটবই সব সময় থাকে, দেখ তো সেটা খুঁজে আছে কিনা!

একটু খুঁজতেই বুক-পকেটে নোটবই পাওয়া গেল।

অজয় চিৎকার করে উঠলো, সুনীল! সুনীল! তুমি—

ললিত মুখটা অজয়ের চেপে ধরল।

টর্চের আলোয় নোটবইয়ের পাতাগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে গিয়ে আমার সন্দেহ যে মিথ্যা নয় টের পেলাম। হঠাৎ মাঝামাঝি জায়গায় দেখলাম—লেখা আছে প্রথম সিন্দুক ঃ সংকেত—Ace of Spades!

সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলাম, ইউরেকা—ইউরেকা! পেয়েছি! পেয়েছি!

বলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে আমি ছুটলাম, বেশী দূর যাইনি একটা গুলির শব্দ ও সেই সঙ্গে আর্ত চিৎকার কানে এসে বাজল।

থম্‌কে দাঁড়ালাম। আবার ঠিক সেই মুহূর্তে আর একটা গুলির শব্দ। নৈশ নিস্তব্ধ সাগর-কূল যেন সেই শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে। তারপরই সব চুপ।

ছুটে ফিরে এলাম। যা ভেবেছিলাম—ওরা অজয়কে গুলি করেছে। রক্তে অনেকটা জায়গা ভিজে গিয়েছে।

মুখ থুবড়ে পড়ে আছে অজয়। এবং তখনও তার পিঠের উপর ক্ষতস্থান দিয়ে ভলভল করে রক্ত বেরুচ্ছে। সহ্য করতে পারলাম না সে দৃশ্য। মাথার মধ্যে কেমন যেন ঝিম্‌ঝিম্‌ করে উঠলো।

বললাম, লোকটাকে মেরে ফেললেন মিঃ সিং?

Yes! শত্রুর শেষ রাখতে নেই!

BanglaBook.org

হোটেলে ফিরে এলাম সকলে।

কিন্তু নোট-বইয়ের মধ্যে ঐ Ace of Spades ছাড়া আর কোন লেখাই পাওয়া গেল না। তন্নতন্ন করে খুঁজলাম, কিন্তু না—আর কিছুই প্রয়োজনীয় লেখা নেই। কোথায় যে গবেষণার শেষাংশটুকু আছে তারও কোন সংবাদই নোট-বইতে নেই। আলমারিটার কথা অবশ্য আগে হতেই জানতাম আমরা—শুধু জানতাম না সেটা খুলবার সংকেত।

হীরা সিং ইতিমধ্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো কলকাতায় ফিরে যাবার জন্যে।

একদিকে যুদ্ধের দরুন সিংগাপুরের অবস্থা খুব খারাপ তখন। দলে দলে এভ্যাকুইরা তখন সিংগাপুর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। জাহাজে স্থান পেতেই ৮/৯ দিন লেগে গেল। ঠিক এমনি সময় হঠাৎ মার্কেটের ধারে একদিন দিগেন সান্যালের সঙ্গে দেখা। ছুটে পালিয়ে এলাম।

রাত্রে দেখলাম স্বপ্ন, রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত অজয় যেন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মাথাটা ফেটে ঘিলু ও রক্ত বের হয়েছে। পিঠে রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন, অজস্রধারায় রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

সুনীল, আমার Experimentটা দাও! ফিরিয়ে দাও ভাই!

চিৎকার করে উঠলাম ঘুমের মধ্যে। ঘুম ভেঙে গেল। সর্বাঙ্গ ঘামে সপ্‌সপ্‌ করছে ভিজে। তারপর হতে প্রতি রাত্রে সেই দুঃস্বপ্ন! চোখের ঘুম গেল—আহারের রুচি গেল—মনের শান্তি গেল!

সর্বক্ষণ কেবল কানে বাজে সেই অদেহীর আর্তস্বর, দাও—ফিরিয়ে দাও ভাই!

তারপর ক্রিশ্চানা জাহাজ—

জাহাজ টর্পেডো হলো। কোনমতে ডুবন্ত সেই জাহাজ হতে আমাদের সকলকেই প্রায় বাঁচাল অন্য একটা জাহাজ।

কলকাতায় ফিরে এলাম। কিন্তু কই, এখানে এসেও তো নিস্তার নেই! সেই দুঃস্বপ্ন! চোখে ঘুম নেই।

পাগলের মতই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। অজয়ের প্রেতাত্মা সর্বক্ষণ ছায়ার মত আমার পিছনে পিছনে যেন ফিরছে। ক্ষমা নেই! ক্ষমা নেই!

না—আর না!

পলে পলে এ অসহ্য যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারি না। মুক্তি—মুক্তি চাই!

অজয়—অজয়, আমায় ক্ষমা করো ভাই! আমায় মুক্তি দাও, এ অসহ্য যন্ত্রণা হ'তে আমায় মুক্তি দাও!

ছদ্মবেশধারী ভদ্রলোক যখন সুনীল করের ঘরের মধ্যে এলো, পিস্তলের গুলিতে সে আত্মহত্যা করেছে।

রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ নিষ্প্রাণ দেহটা তার টেবিলের উপরেই কাত হয়ে পড়ে আছে, আর সামনে খোলা সেই ডাইরীটা।

ভদ্রলোক ডাইরীটা টেনে নিয়ে নিঃশব্দে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

BanglaBook.org

॥ ২০ ॥

রাত্রি বোধ করি সাড়ে এগারোটা হবে।

নীলিমা সুব্রতর ওখান হতে ফিরে অল্পক্ষণ আগে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের শয়নঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে একটা ইংরেজি গল্পের বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল।

ভৃত্য এসে সংবাদ দিল, স্বরূপদা বলে কে একটা লোক বিশেষ জরুরী কাজে এখুনি দিদিমণির সঙ্গে দেখা করতে চায়।

স্বরূপদা! কোথায় সে?

গেটের বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে, দারোয়ান খবর দিতে বললে।

নীলিমা চট্‌পট্ নেমে এলো নিচে।

স্বরূপদাই!

দারোয়ান অপরিচিত স্বরূপকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়নি।

কি সংবাদ স্বরূপদা? এত রাত্রে? উদ্বিগ্ন নীলিমা প্রশ্ন করে।

দিদি, খোকার বসন্তকাকা আমাদের ওখানে এসে বসে আছেন চন্দননগর থেকে। খোকার নাকি কি বিপদ হয়েছে, তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান, এখুনি একবার চলুন। তাঁর গাড়ি নিয়েই আমি এসেছি।

দাঁড়াও, এখুনি আসছি। নীলিমা বলে।

শশাংকর বিপদের সংবাদ শুনে নীলিমা সত্যই চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি উপরে গিয়ে বেশভূষা সামান্য বদল করে চলে আসে। এবং আসবার সময় মাকে সব কথা বলে আসে। সরমা অবশ্য বাধা দেন না।

গাড়িতে উঠে প্রশ্ন করে, ইনি সেই চন্দননগরের বসন্তবাবু না?

হ্যাঁ। বড্ড ভালো লোক। এই কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ এসেই জিজ্ঞাসা করলেন, শশাংক কোথায়?

তা তুমি কি বললে?

আমি তো কিছুই জানি না। রাত্রি দশটা নাগাদ বিশেষ কি কাজে বের হয়ে গেল—বলে গেল সুব্রতবাবুর ওখানে যাচ্ছে!

সুব্রতবাবুর ওখানে খোঁজ করেছিলে?

হ্যাঁ। বসন্তবাবুই ফোন করেছিলেন, সুব্রতবাবুও বাড়িতে নেই।

বসন্ত ঘোষাল বাইরের ঘরে একটা সোফার উপরে বসে উদ্‌গ্রীব হয়ে পথের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

স্বরূপের সঙ্গে নীলিমাকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সোফা হতে উঠে দাঁড়ালেন, আপনিই বোধহয় নীলিমা দেবী?

হ্যাঁ।

শশাংকর সংবাদ কিছু জানেন?

না তো, গতকালের পরে আর দেখা হয়নি।

বিশেষ জরুরী একটা কাজ ছিল। ফোন করেছিলাম রাত্রে আসব, এসে দেখি বাড়িতে নেই, এদিকে কে এক সুব্রতবাবু চন্দননগরে নাকি ফোন করেছিলেন আমায় জানাতে যে, শশাংকর ভারী

BanglaBook.org

বিপদ। এখানকার হোটেলে ফোনে আমায় কিছুক্ষণ আগে চন্দননগর থেকে জানিয়েছে। শশাংকর মুখেই আপনার সংবাদ সব শুনেছিলাম কয়েকদিন আগে ফোন মারফৎ। স্বরূপকে পাঠিয়েছিলাম আপনাকে ডাকতে যদি আপনি কিছু জানেন। তা তো দেখছি আপনিও কিছু জানেন না! যা চঞ্চল—আবার কোন বিপদ-আপদ কি না—

বসন্তবাবুকে অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট দেখায়।

আশ্চর্য! স্বরূপদার মুখে শুনলাম তিনি নাকি রাত দশটায় সুব্রতবাবুর ওখানে যাচ্ছেন বলে বের হয়ে গিয়েছেন—

ফোন করেছিলাম সুব্রতবাবুর ওখানে, তা তিনিও তো শুনলাম বাড়ি নেই! এখন দেখছি মিথ্যে এত রাত্রে আপনাকে টেনে এনে কষ্ট দিলাম। ঘুমোচ্ছিলেন বোধ হয়—না?

না—কষ্ট আর কি, কিন্তু এ তো বড় চিন্তার কথা হলো!

চিন্তা করবেন না, আমি দেখছি। আপনি বরং বাড়ি ফিরে যান। স্বরূপ, ড্রাইভারকে বলো নীলিমা দেবীকে ওঁর বাড়ি পৌঁছে দিতে।

না, না—তার কোন প্রয়োজন নেই।

বিলক্ষণ! তা কি হয়? যান, কতটুকুই বা রাস্তা—ড্রাইভার পৌঁছে দিয়ে আসুক। আমি বরং আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি যদি এর মধ্যে ও এসে যায়!

এলেই কিন্তু স্বরূপদা আমায় একটা সংবাদ দিও। বড় চিন্তায় থাকবো। নীলিমা বলে।

নিশ্চয়ই দেবে, যান আর দেরি করবেন না। বসন্তবাবু বলেন।

নীলিমা বিদায় নিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। স্বরূপ ড্রাইভারকে নীলিমার বাড়ি পৌঁছে দিতে বলে ফিরে এলো।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ছাড়ল। কিন্তু গতি খুব শ্লথ। মানিকতলা স্ট্রীটের কাছাকাছি এসে গাড়িটা ডাইনে মোড় নিতে গিয়ে হঠাৎ গাড়ির ইঞ্জিন থেমে গেল আর সেই মুহূর্তে দু'দিক থেকে গাড়ির দরজা ঠেলে গাড়ির মধ্যে উঠে পড়ল দুজন লোক। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি আবার স্টার্ট দিয়ে স্পীড নিল।

তারপরের ব্যাপারটা যেন আবার দ্রুত ঘটে গেল। ভাল করে বুঝবার আগেই লোক দুটো মুহূর্তে নীলিমার মুখে কাপড় বেঁধে, তাকে কণ্ঠরোধ করে হাত পিছন দিকে ঘুরিয়ে বেঁধে বন্দী করে ফেলে।

গাড়ি তখন সারকুলার রোডের দিকে না গিয়ে সোজা শিয়ালদহের দিকে জনহীন খোলা রাস্তা ধরে প্রায় চল্লিশ মাইল বেগে ছুটে চলেছে।

দামী ওলডস্ মোবিল গাড়ি—নিঃশব্দে হাওয়ার গতিতে যেন উড়ে চলে!

নিশিকান্তর শয়নকক্ষ।

বাথরুমের দরজা খুলে নিশিকান্ত কক্ষের মধ্যে এসে প্রবেশ করলো।

রাত্রি সোয়া একটা। চারিদিক নিস্তব্ধ। যেন কবরের ঠাণ্ডা। নিঃশব্দ পরিবেশ নেমে এসেছে পৃথিবীর উপরে। গভীর রাতের কলকাতা শহর।

নিশিকান্ত তার বেশভূষা বদল করে এসে আবার তার পঙ্গু রূপ ধরেছে তখন। হলঘরে প্রবেশ করে দেখে আলো তেমনি জ্বলছে, কিন্তু ঘরে কিটি নেই।

তার বদলে একটা সোফার উপরে হাত পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় বসে আছে নীলিমা।

BanglaBook.org

নীলিমার চোখের উপরে কোন বাঁধন না থাকায় তার দৃষ্টি খোলা।

সুইচ টিপে তীব্র জোরালো আলোটা জ্বেলে দেয় নিশিকান্ত।

মুহূর্তে আলোয় আলোয় কক্ষখানি যেন ঝল্‌মলিয়ে ওঠে।

এদিকে নিচের একটা কক্ষে বসে বর্মী মেয়ে কিটি গতকাল রাত্রি থেকে মদ্য পান করে চলেছে আর পাশে শয্যার উপর একটা তীক্ষ্ণ ধারালো বাঁকানো ছোরা পড়ে আছে। চোখ দুটো নেশায় রাঙা। সমগ্র মুখখানাও যেন রক্তচাপে ফেটে পড়ছে।

বর্মী মেয়ের বর্মী রক্তে জেগেছে খুনের নেশা। মাঝে মাঝে আবার নেশায় রাঙা চোখে বাঁ হাতে ছোরাটা তুলে আলোর সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে।

এখনো—এখনো এলো না কেন? ও যে অনেকক্ষণ ধরে প্রতীক্ষায় আছে।

কখন—কখন জ্বলে উঠবে উপরের ঘরের সেই লাল আলোর বাল্বটা?

আরে এ কি! নীলিমা দেবী? আপনি এখানে, এ অবস্থায়—তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে নিশিকান্ত মুখের হাতের ও পায়ের বাঁধনগুলো খুলে নীলিমাকে মুক্ত করে দেয়। তারপর আবার বলে, আপনি আমাকে না চিনলেও আমি আপনাকে চিনি। কিন্তু সে কথা থাক্, আপনার এ অবস্থা কে করলে? এখানেই বা কে আনলে এ অবস্থায় আপনাকে? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না! আশ্চর্য, নীলিমা দেবী!

নীলিমা বোকার মতই তাকিয়ে থাকে আগন্তুক নিশিকান্তর মুখের দিকে। গলার স্বর যে চেনা-চেনা লাগছে, কিন্তু তবু চিনতে পারছে না!

নিশিকান্তও তাকিয়ে ওরই মুখের দিকে।

এদিকে সুব্রত আর শশাংক রাত্রি প্রায় পৌনে একটায় দ্রুত গাড়ি চালিয়ে শশাংকর বাড়িতে পৌঁছেই স্বরূপের মুখে শুনতে পেল বসন্তবাবু এসেছিলেন।

বসন্তকাকা! শশাংক চমকে ওঠে।

হ্যাঁ। বসন্তবাবু এসে তোকে খোঁজে, তোর দেখা না পেয়ে নীলিমাকে তার বাড়ি থেকে আমাকে দিয়ে ডাকিয়ে আনে।

নীলিমা দেবী! চম্‌কে ওঠে সুব্রত।

হ্যাঁ, নীলিমা দেবী। স্বরূপ বলে।

সুব্রত ব্যস্ত হয়ে ওঠে, সব কথা আমাকে খুলে বল স্বরূপদা!

স্বরূপ সংক্ষেপে সব কথাই বলে।

সমস্ত শুনে সুব্রত বলে, এখুনি—এখুনি একবার খোঁজ করা দরকার নীলিমা দেবী কোথায়? চলুন শশাংকবাবু, এখুনি—এখুনি একবার নীলিমা দেবীর বাসার দিকে!

নীলিমার সাহায্যেই সুব্রত গতকাল বাসাটা দেখে রেখেছিল। গাড়ি এসে গেটের সামনে দাঁড়াতেই দারোয়ান উঠে দাঁড়াল।

সুব্রতই প্রশ্ন করে, তোমাদের দিদিমণি বাসায় ফিরে এসেছেন কিনা জানো?

দারোয়ান বললে, নেহি!

সুব্রতর মাথা ঘুরে ওঠে। সর্বনাশ! তাহলে নীলিমা নিশ্চয়ই বসন্তর খপ্পরে পড়েছে! সমস্ত বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিই যেন সুব্রতর গুলিয়ে যাচ্ছে।

কি—কি উপায়, কোন্ রাস্তা ধরে, কোন্ সূত্র ধরে সে এখন অগ্রসর হবে?

নীলিমা!

BanglaBook.org

॥ ২১ ॥

শেষ পর্যন্ত নীলিমা কিনা এমন বেহিসেবী একটা কাজ করে বসল! অনেকখানি আশাই যে সুব্রতর নীলিমার উপরে ছিল!

শশাংকও যেন বোবা বনে গিয়েছে, নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে সুব্রতর পাশে। একটা কথাও তার মুখ দিয়ে বের হয় না।

শশাংকবাবু? সুব্রতই ডাকল।

অ্যাঁ! আমাকে কিছু বলছেন মিঃ রায়? সুব্রতর মুখের দিকে তাকাল।

হঠাৎ পশ্চাৎ দিক হতে এমন সময় অরিন্দম সরকারের বজ্রকঠিন কণ্ঠস্বর শোনা যায়, সুব্রত রায়, শশাংক মিত্তির—এক পা নড়েছো কি—

চম্‌কে ওরা একসঙ্গেই ফিরে তাকায়। হাত দুয়েকের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে অরিন্দম সরকার। তার হাতে উদ্যত পিস্তল এবং তার পাশে আর একজন—তার হাতেও উদ্যত পিস্তল।

সে রাত্রে সেই মুখোশধারী ভদ্রলোকের সুনীল করের কক্ষ হতে তার ডাইরিটা নিয়ে অন্তর্ধানের পরই অরিন্দম ও তার অনুচর সেখানে গিয়ে সুনীল করকে মৃত দেখে সোজা এখানে চলে আসে।

হঠাৎ দূর থেকে সুব্রত ও শশাংককে দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলতে দেখে চুপিচুপি পশ্চাৎ দিক হতে এসে ওদের প্রতিরোধ করেছে।

অরিন্দম সরকারকে চিনতে সুব্রতর কষ্ট হয় না। গলার স্বরেই সে চিনতে পেরেছিল। চকিতে মাথার মধ্যে যেন চিন্তার বিদ্যুৎ খেলে যায়।

মুহূর্তে মনস্থির করে নিয়ে সুব্রত শান্ত গলায় বলল, মিঃ সরকার, আমাদের বন্দী বা হত্যা করতে চান করবেন, কিন্তু এদিকে জানেন কি আপনার মেয়ে নীলিমা যে আপনাদের দলেরই কোন শয়তানের হাতে বন্দী?

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই সুব্রতর কথায় চম্‌কে ওঠে শশাংক, নীলিমা! নীলিমা তাহলে অরিন্দম সরকারেরই মেয়ে! তাই তার এত গোপনতা—এত ছলনা—পরিচয় দানে অনিচ্ছা! ঐ শয়তানটার মেয়ে সে! নীলিমার এই পরিচয়! শেষ পর্যন্ত নীলিমা—

অরিন্দম সরকার কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করে না। হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বললে, বাগে পড়লে অমন অনেক শালাই বাবা বলে ডাকে সুব্রতবাবু!

আপনার বিশ্বাস না হয় আপনার দারোয়ানকেই জিজ্ঞাসা করে সন্দেহটা ভঞ্জন করে নিন না?

সত্যিই তো। অরিন্দম সরকার দারোয়ানকেই সম্বোধন করে এবার জিজ্ঞাসা করে, বলবীর, দিদিমণি কাঁহা?

দো-তিন ঘণ্টা আগাড়ী নিকাল গিয়া—আভিতক তো নেহি পৌঁছা সাব!

অ্যাঁ! নীলু দু'তিন ঘণ্টা আগে বের হয়ে গিয়েছে!

কিছুক্ষণ যেন বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে থাকে অরিন্দম সরকার। বর্তমান সব পরিস্থিতিই যেন কেমন অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে।

হঠাৎ সে পাগলের মতই বলে ওঠে, বংশী—বংশী তবে সেদিন তো ঠিক কথাই বলেছিল! That scoundrel—এ নিশ্চয়ই তার কাজ!

BanglaBook.org

সঙ্গে সঙ্গে অদূরে দণ্ডায়মান গাড়িটার দিকে ছোটে কতকটা পাগলের মতই যেন অরিন্দম সরকার। মাথার মধ্যে তখন তার আগুন জ্বলছে। সর্বাঙ্গে যেন বিষের জ্বালা ছড়িয়ে যাচ্ছে। একলাফে গাড়িতে উঠেই অরিন্দম গাড়িতে স্টার্ট দেয়।

সুব্রতও ছুটতে ছুটতে গিয়ে তার নিজের গাড়িতে ওঠে।

একপাশে দাঁড়িয়ে রতন ওদের কথা শুনছিল, ও ছুটে গিয়ে সুব্রতর সামনে দাঁড়াল, সাব!

কি?

হামভি আপকো সাথ সাথ যায়েঙ্গে—

চল।

সুব্রত গাড়িতে স্টার্ট দেয়।

পশ্চাতে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকে হতবাক শশাংক মিত্র আর অরিন্দমের অনুচর। আগে আগে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলে অরিন্দম সরকারের গাড়ি।

পশ্চাতে ছোটে সুব্রতর ডিমলার। পাশে তার রতন।

এদিকে গাড়িটা চিৎপুর রোডের উপরে দাঁড় করিয়ে রাজেশ্বর ও পশ্চাতে নামে সেই চশমাধারী ব্যক্তি। অবশ্য এই মুহূর্তে তার চোখে চশমার বদলে আঁটা রয়েছে কালো একটি মুখোশ।

রাজেশ্বর দূর হতে মুখোশধারীকে নির্দিষ্ট বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে এবং সরু গলিপথটা ছাড়াও অন্য যে গোপন দ্বিতীয় পথটি দিয়ে বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করা যায় সেই পথের কথা বলে গাড়ির মধ্যে আবার ফিরে এসে অপেক্ষা করতে থাকে।

ঘরের মধ্যে হতবাক নীলিমা লোকটার মুখের দিকে বোবাদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যেন।

সাপের চোখের মতোই জ্বলছে যেন নিশিকান্তর দুই চোখের মণি দুটো।

স্থির চোখের দৃষ্টি নিশিকান্তর নীলিমার মুখের উপরেই নিবদ্ধ।

আপনি—মানে তুমি—যেন কি বলবার চেষ্টা করে নীলিমা।

হঠাৎ হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে নিশিকান্ত।

সেই হাসির শব্দটা কক্ষের রুদ্ধ দেওয়ালে দেওয়ালে শব্দের প্রতিধ্বনির যেন একটা বিভীষিকা ছড়িয়ে দেয়। চম্‌কে ওঠে নীলিমা সহসা।

ওদিকে হাসির শব্দ নিচের ঘরে মদ্যপানরত কিটির কানেও গিয়ে পৌঁছেছে। চম্‌কে উঠে মদের গ্লাসটায় শেষ চুমুক দিয়ে বাকী সমস্ত তরল পদার্থটুকু একেবারে গলায় ঢেলে দিয়ে টল্‌তে টল্‌তে উঠে দাঁড়ায় বর্মী মেয়ে কিটি।

ডান হাতের দৃঢ় মুষ্টিতে ধরা সেই ধারালো ছুরিটা।

॥ ২২ ॥

হাঃ হাঃ করে হাসছে নিশিকান্ত।—ভয় পেয়েছো নীলিমা?

নীলিমা নিরস্ত্র অসহায়। চেয়ারটার উপর হতে উঠে দাঁড়িয়ে পায়ে পায়ে দেওয়ালের দিকে পিছু হাঁটতে শুরু করে।

নিশিকান্ত হাসছে হাঃ হাঃ হাঃ করে।

BanglaBook.org

চারিপাশে অভেদ্য কঠিন দেয়াল। নিশিকান্ত চৌধুরীর খাসমহল বাদশা ঔরংজীবের রংমহলকেও হার মানায়।

একবার এই কক্ষে প্রবেশ করলে আর বাইরে যাওয়া যায় না! কিন্তু কেন তুমি ভয় পাচ্ছ নীলিমা? রাজার ঐশ্বর্যই আমার শুধু যে আছে তাই নয়, সেই ঐশ্বর্যের সঙ্গে আমার প্রভূত ক্ষমতা।

নীলিমা তবু পিছু হাঁটে।

নিশিকান্তও এক পা এক পা করে অগ্রসর হয়।

ভয় পেয়ো না লক্ষ্মীটি! শোন, দাঁড়াও—

না-না-না। সভয়ে নীলিমা দু'হাতের করতলে মুখ ঢেকে আর্ত চিৎকার করে ওঠে। চিরন্তন নারী অসহায় পশুশক্তির সামনে ভয়ার্ত চকিত বেপথুমানা।

সার্থক তোমার নাম নীলিমা! জীবনে তুমি আমার নীল স্বপ্নই এনেছো!

হঠাৎ দরজাটা খুলে যায় নিশিকান্তর পশ্চাতে এবং খিল্‌খিল্ করে প্রেতের মত একটা হাসির তরঙ্গ যেন মুহূর্তে কক্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে যায়।

বিদ্যুৎ চমকের মতই ফিরে দাঁড়ায় নিশিকান্ত, কে?

খোলা দরজার ঠিক উপরেই দাঁড়িয়ে বর্মী মেয়ে কিটি। মাথার চুল বিসর্পিল গতিতে বুকে পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে।

নেশায় পা ও দেহ টলছে। হাতে তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরি। ঘরের অত্যুজ্জ্বল আলোয় ধারালো ইস্পাত হিল্‌হিল্ করে ওঠে। খিল্‌খিল্ করেই আবার প্রেতের মত হেসে ওঠে কিটি।

নীল স্বপ্ন! হিঃ হিঃ হিঃ! পাগলের মতই হাসছে কিটি।

মুহূর্তে নিশিকান্তর চোখের তারা দুটো আগুনের শিখার মতই যেন দপ্ দপ্ করে জ্বলে ওঠে। চৌকো চোয়াল দৃঢ় হয়। মুখের পেশীগুলো স্প্রিংয়ের মত সজাগ হয়ে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে চাপা ক্রুদ্ধস্বরে গর্জন করে ওঠে নিশিকান্ত, হারামজাদী!

ঠিক সেই মুহূর্তে কিটির হাতের ছোরাটা বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এসে নিশিকান্তর কাঁধের উপরে বিদ্ধ হয়।

ছোরা-বিদ্ধ অবস্থাতেও নিশিকান্ত বাঘের মতই একটা গর্জন করে ছুটে গিয়ে কিটির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং লোহার মত শক্ত কঠিন দু'হাতে কিটির গলাটা টিপে ধরে।

নিষ্ঠুর কঠিন পেষণে নেশাগ্রস্ত কিটি একটুতেই এলিয়ে পড়ে—চোখ দুটো যেন ঠেলে বের হয়ে আসে—সমস্ত মুখটা রক্তরাঙা হয়ে ওঠে।

নিশিকান্ত, your game is up! বজ্রের মতো কঠোর নির্দেশ শোনা গেল।

চকিতে নিশিকান্ত মুখ ফিরিয়ে দেখলে শয়নকক্ষের খোলা দরজার ঠিক উপরে দাঁড়িয়ে দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি, হাতে উদ্যত পিস্তল।

নীলিমারও সেদিকে দৃষ্টি পড়েছিল, এতক্ষণ সে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। কিন্তু মুখোশধারীর কণ্ঠস্বরে সে-ও ফিরে তাকায়, এ কণ্ঠস্বর যে তার পরিচিত!

অস্ফুট গলায় নীলিমা বলে ওঠে, আপনি!

নিশিকান্ত, হাতের নিশানা আমার কখনো ব্যর্থ হয় না—সাবধান!

বিহ্বল নিশিকান্তর দৃঢ় মুষ্টি যা কিটির কণ্ঠের উপরে সাপের মতই বেষ্টন করে ছিল, সহসা কেমন শিথিল আলগা হয়ে গেল। হতজ্ঞান কিটির দেহটা মাটির উপরে পড়ে গেল।

নিশিকান্ত উঠে দাঁড়ায়।

BanglaBook.org

সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের শব্দ। কারা যেন অত্যন্ত দ্রুত উপরে উঠে আসছে সিঁড়িপথে।

এবারে লক্ষ্মী ছেলের মত ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াও। কঠোর আদেশ আবার ধ্বনিত হলো।

প্রাণীহত্যা আমি ঘৃণা করি, কিন্তু প্রয়োজন হলে তোমার মত নীচ শয়তানকে খুন করতে এতটুকু দ্বিধাও আমি করবো না। হয়ত আমার হাতের অব্যর্থ লক্ষ্য সম্পর্কে তোমার সন্দেহ হতে পারে, তাই সামান্য একটা প্রমাণ দিচ্ছি দেখ—

হঠাৎ একটা গুলির শব্দ হলো এবং দেখা গেল ঘরের কোণে ত্রিপয়ের উপরে রক্ষিত ছোট আলোর বাল্বটি চুরমার হয়ে গিয়েছে।

বুঝতে পারছো—I never miss!

হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল প্রথমে উন্মাদের মত অরিন্দম ও পশ্চাতে তার সুব্রত।

হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতই ছুটে এসে নিশিকান্তর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে অরিন্দম সরকার, Scoundrel! আজ তোকে আমি খুন করবো!

দু'হাতে মুহূর্তে নিশিকান্তর গলা টিপে ধরাশায়ী করে ফেলে তাকে অরিন্দম সরকার।

সুব্রত বাধা দিতে যায়।

মুখোশধারী ভারী গলায় বললে, Let them settle their own affair! ওদের পাওনাগণ্ডা ওদেরই বুঝে নিতে দাও সুব্রত!

চম্‌কে ফিরে তাকাল সুব্রত, কে?

ভদ্রলোক মুখের উপর থেকে টান দিয়ে দাড়ি গোঁফ ও চশমাটা খুলে ফেলে।

সুব্রতর আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠ হতে উচ্চারিত হয়, কিরীটী! তুই!

হ্যাঁ রে, আমি।

যুধ্যমান নিশিকান্ত ও অরিন্দম সরকার পরস্পর পরস্পরকে জাপটে ধরে ঘরের বিস্তৃত কার্পেটের উপরে তখন গড়াগড়ি খাচ্ছে।

সেই দিকে একবার তাকিয়ে দেখে কিরীটী বললে, সুব্রত, যা, এখান থেকে নীলিমাকে সঙ্গে নিয়ে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আয়।

কিন্তু নিশিকান্ত?

নিশিকান্তর জন্য ভাববার আরো লোক আছে। বোস সাহেব তার দলবল নিয়ে আসছে—তাদেরও হিসাবনিকাশ আছে নিশিকান্তর সঙ্গে। পাপের বোঝাটা আজ ওর এতখানি ভারী হয়ে উঠেছে যে, পুলিসের হাতে ওকে না তুলে দিলেও যে মহাপঙ্ক ওকে গ্রাস করেছে তার থেকে ওর নিস্তার নেই, মুক্তি নেই। অনেক ঋণ করেছিল নিশিকান্ত—আজ সব ওকে শুধতে হবে।

হঠাৎ কিরীটীর কথা শেষ হলো না, একটা আর্ত চিৎকার নিশিকান্তর কণ্ঠ চিরে নির্গত হলো। কিটির নিক্ষিপ্ত ছোরার আঘাতে রক্তক্ষয়ে আগেই সে অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে, তার উপরে অরিন্দমের আক্রমণে বেশীক্ষণ ও যুঝতে পারলে না।

ধস্তাধস্তির সময় সেই ছোরাটাই একপাশে পড়ে গিয়েছিল, সেইটাই তুলে নিয়ে অরিন্দম নিশিকান্তর বুকের মধ্যে সমূলে বসিয়ে দিয়েছে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে।

ভল্‌ভল্ করে তাজা লাল রক্ত মুহূর্তে মেঝের কার্পেটটাকে ভিজিয়ে দিল।

হাঁপাতে হাঁপাতে অরিন্দম সরকার রক্তাক্ত আহত নিশিকান্তর এলায়িত দেহটার পাশেই তখন বসে পড়েছে।

BanglaBook.org

নীলিমা ছুটে এসে অরিন্দমের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, বাবা!

হঠাৎ পাগলের মতই অরিন্দম সরকার চিৎকার করে ওঠে, যা, যা—আমার সামনে থেকে যা! ছুঁস নে, আমায় ছুঁস নে!

॥ ২৩ ॥

কিরীটী তার কাহিনী বিবৃত করছিল।

শশাংক মিত্রের বাসায় সকলেই এসেছে—সুব্রত, দিগেন সান্যাল, নীলিমা এবং কিরীটী।

আজ দু'দিন হলো অরিন্দম সরকার কোথায় চলে গিয়েছে কেউ জানে না। তবে সে যাওয়ার আগে বন্দী দিগেন সান্যালকে মুক্তি দিয়ে গিয়েছে।

বোস সাহেব, দাশবাবু, ব্রজলাল সকলেই অদৃশ্য। নিশিকান্ত মৃত। সেই ছোরার আঘাতেই রক্তক্ষয়ে তার জীবনান্ত ঘটেছে। কিটি অবশ্য বেঁচে উঠেছে—মরেনি। কণ্ঠের পেষণে সে জ্ঞান হারিয়েছিল মাত্র। হাসপাতালে রিমুভ করায় বেঁচে উঠেছে। তবে এখনও অত্যন্ত দুর্বল।

নিশিকান্ত সম্পর্কে সেও একটা জবানবন্দি দিয়েছে।

কিরীটী প্রথমে সেই জবানবন্দিটাই পড়ছিল।

আমি কিটি স্বেচ্ছায় এই জবানবন্দি কিরীটী রায়কে দিচ্ছি ঃ

মৌলবিনে আমার বাড়ি। আমার বাবা একজন শিক্ষিত গৃহস্থ ছিলেন—রেঙ্গুন পুলিস-কোর্টে ওকালতি করতেন। আমরা এক বোন দুই ভাই।

আমার যখন বছর-পনেরো বয়স—রেঙ্গুনের মিশনারী স্কুলে পড়ছি, ইরসাদ ভাগ্যান্বেষণে রেঙ্গুনে আসে এবং উ'সু আমার মাসতুত ভাইয়ের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। সেই সূত্রে সে আমাদের বাড়িতেও যাতায়াত করতে থাকে।

ক্রমে যাতায়াতের ফলে আমার ও ইরসাদের মধ্যে আলাপ জমে ওঠে ও আলাপ ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়। গোপনে মা'র কাছে আমাদের সব কথা খুলে বলি ও আমাদের যাতে বিবাহ হয় তার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানাই।

কিন্তু আমার মা হৃদয়হীনা নারী ছিলেন এবং ভারতবাসীকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। আমার কথা শুনে তিনি ক্ষেপে উঠলেন এবং বাবাকে সব কথা বলে দিলেন। বাবা ইরসাদকে আমাদের বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দিলেন।

বাড়িতে না এলেও গোপনে রাস্তায় মার্কেটে এবং মধ্যে মধ্যে ভিকটোরিয়া লেকে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ চলতে লাগল। গোপনে আমরা বিবাহ করবো বলে ঠিক করলাম। এবং ঠিক হলো বিবাহ করে আকিয়াবে পালিয়ে যাবো।

এমন সময় একদিন ইরসাদ এসে বললে, সে একজন মস্ত বড় বাঙালী ব্যবসায়ীর ওখানে কাজ পেয়েছে। লোকটি নাকি খুব ধনী এবং ইরসাদকে অত্যন্ত স্নেহ করেন।

ইরসাদ তার নতুন মনিবকে সব কথা খুলে বলায় তিনি নিজে ইরসাদ ও কিটিকে সাহায্য করবেন আশা দিয়েছেন। ইরসাদের মনিবের মেমিওতে একটা বাড়ি আছে, আপাতত সে বাড়িটাতেই ইরসাদকে কিটিকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে উঠতে বলেছেন।

BanglaBook.org

সেই মতই একদিন এক বস্ত্রে রাত্রে বাড়ি থেকে পালিয়ে ইরসাদের সঙ্গে তার মনিবের মেমিওর বাড়িতে গিয়ে দু'জনে আমরা উঠলাম।

মেমিও পাহাড়ের উপরে চমৎকার ছবির মত সাজানো ছোট শহরটি। সরকারী কর্মচারীদের গ্রীষ্মাবাস এটা। প্রাকৃতিক দৃশ্য ও স্বাস্থ্য ওখানকার খুব ভাল।

মেমিওতেই আমাদের দেশীয় প্রথায় বিবাহও হয়ে গেল।

দিনসাতেক আনন্দে ও স্বপ্নের মধ্য দিয়ে যেন কেটে গেল। জীবনে এত সুখ বোধ হয় ভগবানের ইচ্ছা ছিল না, কালো দুঃখের মেঘ এলো ঘনিয়ে অলক্ষ্যে আমাদের জীবনের বারোদিনের সূর্যোদয়কে গ্রাস করতে।

ইরসাদের মনিব কি একটা কাজে দিনকতকের জন্য মেমিওতে বেড়াতে এলো। লোকটি অত্যন্ত ভদ্র—অত্যন্ত অমায়িক, তথাপি চোখে যেন তার কি এক রকম দৃষ্টি। কোন কোন মানুষের চোখের দৃষ্টিতে যে অশুভ সংকেত থাকে ওর দৃষ্টিতেও বোধহয় ছিল তাই—কেমন যেন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে লোকটা আমার দিকে চেয়ে থাকত সর্বদা।

আর তার দৃষ্টির সামনে মনে হতো আমার মনের সমস্ত শক্তিই যেন কেমন ঝিমিয়ে আসছে। একটা বিশ্রী অসোয়াস্তি, একটা আশংকা—দৌর্বল্য অনুভব করতাম।

লোকটা হেসে হেসে কথা বলতো, মিষ্টি কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ভদ্র কেতাদুরস্ত—তবু মনে হতো লোকটা যেন সাক্ষাৎ শয়তান! ভীষণ হিংস্র প্রকৃতির—পশু চরিত্রের।

যাহোক, দিন পনেরো বাদেই লোকটা চলে গেল। আমিও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু দিন-কুড়ি বাদেই আবার সে এলো। এমনি করে তারপর থেকে প্রায়ই সে মেমিওতে যাতায়াত করতে লাগল মধ্যে মধ্যে।

এদিকে ইরসাদকেও ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে মধ্যে মধ্যে রেঙ্গুন যেতে হতো। কখনো কখনো দু-তিন-দিন—এবং মধ্যে মধ্যে আরো বেশী এমন কি আট-দশ-দিন পর্যন্ত রেঙ্গুনে কাটিয়ে আসত।

ঐ সময়টা একাই আমি বাড়িতে থাকতাম।

বাড়িতে একটা বর্মী ভৃত্য অবশ্য থাকতো।

ক্রমে ইরসাদের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। ইরসাদের কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া ভাব। সর্বদাই অন্যমনস্ক, কথা যা বলে তার মধ্যে টাকা-পয়সার কথাই বেশী।

একদিন রেঙ্গুন থেকে ইরসাদ বললে, তার মনিবের ব্যবসার চার আনার অংশীদার হয়েছে সে। ইরসাদের মনিবের কাঠের ব্যবসা থাকলেও আসল অর্থাগমের যে উপায়টা তার ছিল, বহুদিন পরে জানতে পারি সেটা চোরাই কোকেন ও আফিমের ব্যবসা। অর্থাৎ স্মাগলিং। প্রচুর টাকা নাকি সে উপায় করতো ঐ ভাবে স্মাগলিং করে।

কিছুদিন পরে হঠাৎ ইরসাদের অনুপস্থিতিতে তার মনিব এসে হাজির হলো একদিন। ইরসাদ বাড়িতে নেই, কেমন ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠলো। কিন্তু মুখে আদর অভ্যর্থনা জানালাম।

সেই দিনই সন্ধ্যার দিকে এলো ইরসাদ। ভাল খাবারের আয়োজন হলো রাত্রে এবং সন্ধ্যার কিছু পরে ইরসাদ ও সেই লোকটা মদ খেতে শুরু করলো। মদের আসরে ইরসাদের অনুরোধে আমাকেও গিয়ে বসতে হলো। মদ আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতাম।

ইরসাদ যে ইতিমধ্যে একজন ঘোর মদ্যপায়ী হয়ে উঠেছে টের পাইনি।

ইরসাদ ও তার মনিব আমায় বার বার অনুরোধ করতে লাগল কিন্তু আমি বার বারই অনিচ্ছা জানাতে লাগলাম।

BanglaBook.org

আমার ঘোর অনিচ্ছা দেখে লোকটা বললে, যাক্, ও যখন খেতে চায় না—ওকে অনুরোধ করো না ইরসাদ।

যা হোক, আহারাদির পর কফিপান শুরু হলো। কফির পাত্র শেষ না করতে করতেই ঘুমে আমার দু'চোখ যেন কেমন জড়িয়ে আসতে লাগল।

তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে শয়নকক্ষে গেলাম। ঘুমে সর্বাঙ্গ তখন আমার এলিয়ে আসছে। ঘুমিয়ে পড়লাম শয্যায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই।

ঘুম ভাঙল শেষরাত্রের দিকে বিশ্রী একটা দুঃস্বপ্ন দেখে এবং চমকে চেয়ে দেখি, ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে আর—আর আমার শয্যায় কে—কে ও শুয়ে! সেই—সেই লোকটাই না! মাথাটা কেমন ঘুরে উঠলো।

টলতে টলতে কোনমতে বাইরে এসে দেখি—অন্ধকারে বারান্দায় কে যেন দাঁড়িয়ে ধূমপান করছে।

আমার পদশব্দে সে প্রশ্ন করে, কে?

ইরসাদ—আমি।

কিটি নাকি?

রাগে দুঃখে লজ্জায় অপমানে সর্বাঙ্গ যেন আমার কাঁপছে। বুঝতে আর কিছুই তখন আমার বাকী নেই।

স্বেচ্ছায় আমার স্বামী অন্যের হাতে তুলে দিয়েছে, কফির সঙ্গে ঘুমের ঔষধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে অচেতন করে।

অর্থের লোভেই ইরসাদ শেষ পর্যন্ত আমায় অন্যের হাতে বিক্রী করে।

দিনের পর দিন সে যে কি দুঃসহ গ্লানির বোঝা আমি বয়ে বেড়িয়েছি! ইরসাদ—যাকে ভালবেসে আমার আত্মীয়স্বজন ঘরবাড়ি সব ছেড়ে এলাম, সে কিনা শেষ পর্যন্ত আমায়—

ঝগড়া, রাগ, মান, অভিমান সব ব্যর্থ হয়ে গেল।

ভাবলাম পালাবো, কিন্তু ইরসাদকে ছেড়ে চলে যেতে প্রাণ আমার কেঁদে উঠলো। পালানো হলো না।

নরকের মধ্যেই দিন আমার দুঃসহ গ্লানি ও অপমানে কাটতে লাগল। মনের সে জ্বালাকে নিবাতে গিয়ে আশ্রয় নিলাম তরল বিষের। সেই বিষ তিল তিল করে ক্রমে আমায় গ্রাস করলে। কিন্তু কিছুই তো হলো না, বিষে শুধু সর্বাঙ্গ আমার নীল বিষাক্তই হয়ে গেল—মৃত্যু তো হলো না।

এরপর কলকাতায় এলাম ওদের সঙ্গে।

কলকাতায় এসেই জানতে পারি লোকটার আসল নাম নিশিকান্ত চৌধুরী।

লোকটা একজন ফেরারী আসামী। নাম ভাঁড়িয়ে রেঙ্গুনে পালিয়েছিল, সঙ্গে ছিল ওর প্রচুর অর্থ, সেই অর্থের সাহায্যে চোরা মাদকদ্রব্যের কারবার করে—পরে রেঙ্গুন পুলিসও লোকটার গতিবিধি সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠায় পালিয়ে এল কলকাতায় আমাকে আর হতভাগ্য ইরসাদকে সঙ্গে নিয়ে।

এদিকে কলকাতায় আসবার পর ইরসাদের আরো পরিবর্তন হলো। দিবারাত্র বেশীর ভাগ সময়ই নেশায় বুঁদ হয়ে থাকত। আর এখানে এসে ইরসাদের পরিচয় হলো নিশিকান্তর ভৃত্য।

BanglaBook.org

সহকারী ব্যবসায়ী আর নয়। শুধু ভৃত্য! কারণ যা কিছু ইরসাদের টাকাকড়ি জমেছিল কলকাতায় আসবার কিছুদিনের মধ্যেই সব উড়িয়ে নষ্ট করে দিল এবং সম্পূর্ণভাবে নিশিকান্তরই মুখাপেক্ষী হয়ে দিন কাটতে লাগল।

আমি কিন্তু আমার নারকীয় ঘৃণ্য জীবনের কথা কোনমতেই ভুলতে পারলাম না। দিবারাত্র মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলে। এবং প্রথম সর্বনাশ আমার হয় এক অমাবস্যার রাত্রে। তাই প্রতি অমাবস্যার রাত্রি এলেই অন্তরের জ্বালা যেন আমার দ্বিগুণ হয়ে উঠতো। মাথার মধ্যে খুন চাপত। উন্মাদিনীর মত আমি অস্থির ভয়ঙ্কর প্রকৃতির হয়ে উঠতাম। যাকে সামনে পেতাম, আঁচড়ে কামড়ে রক্তারক্তি করে দিতে ইচ্ছা হতো। দুঃসহ রাগে সর্বাঙ্গ যেন আমার জ্বলে যেতো।

আর সেই সময় নিশিকান্ত আমাকে একটা চামড়ার চাবুক দিয়ে নৃশংস ভাবে মারত।

আশ্চর্য! সমস্ত চাঞ্চল্য সমস্ত অস্থিরতাই যেন সেই নির্মম চাবুকের আঘাতে আঘাতে শান্ত হয়ে আসত। মনের হঠাৎ-ক্ষেপে-ওঠা মানুষটা যেন সেই দানবীয় কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়ত।

ঠিক সেই সময় শয়তান নিশিকান্ত আমার অসাড় পঙ্গু দেহটা পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে পাশের ঘরের শয্যাটার উপরে গিয়ে শুইয়ে দিত। তারপর শরীরে কি একটা তীব্র মাদকদ্রব্য ইনজেকশন দিয়ে আমাকে ৮/১০ ঘণ্টার জন্য ঘুম পাড়িয়ে দিত।

প্রথম প্রথম অবশ্য সেই তীব্র মাদকদ্রব্যের ক্রিয়ায় আমি ঘুমিয়েই পড়তাম। পরে আর ঠিক ঘুম আসত না তবে কেমন একটা অসাড় তন্দ্রামত আচ্ছন্নতা ৮/১০ ঘণ্টা ধরে আমায় যেন ঘিরে রাখত। আর সেই অবস্থায় আমার উপরে চলত দানব নিশিকান্তর জঘন্য অত্যাচার।

তন্দ্রার মধ্যে টের পেতাম কিন্তু শারীরিক বাধা দেবার কোন ক্ষমতাই আমার মধ্যে তখন আর থাকত না।

কিন্তু ইরসাদ শেষ পর্যন্ত আমার ঐ অসহায় অবস্থাটা বোধ হয় সহ্য করতে পারছিল না। সে অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠতো। নিস্ফল আক্রোশে ইরসাদ পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের মত গর্জাতো, কিন্তু নিশিকান্তর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত হয়ত তারও দুঃসাহস হতো না।

দিনের পর দিন এমনি করে নিজের মধ্যে অসহায় যন্ত্রণা ভোগ করে করে শেষ পর্যন্ত ইরসাদ সত্যিই বোধ হয় সহ্যের শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল। এবং মনে মনে যে সে নিশিকান্তর সঙ্গে একটা শেষ বোঝাপড়ার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছিল তা আমি টের পাইনি।

টের পেলাম সেইদিন— যেদিন নিশিকান্তর প্রাইভেট ঘর থেকে মদ চুরি করতে গিয়ে অতর্কিতে নিশিকান্তর হাতে ধরা পড়ে গেলাম।

নিশিকান্ত মাঝে মাঝে তার শয়নকক্ষ-সংলগ্ন স্নানঘরে রাত্রি দশটার পর স্নান করতে ঢুকত এবং ৩/৪ ঘণ্টার আগে স্নান তার শেষ হতো না। সেদিনও স্নানঘরেই সে ঢুকেছিল এবং আমি জানতাম ৩/৪ ঘণ্টা সময় হাতে পাবো, কিন্তু অতর্কিতে সে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে কখন টের পাইনি।

যা হোক, আমাকে মদ চুরি করতে দেখে নিশিকান্ত ভীষণ ক্ষেপে গেল এবং আমাকে নিয়ে পাশের হলঘরে চলে এলো।

ইরসাদকে বললে দেওয়াল থেকে চামড়ার চাবুকটা পেড়ে আনতে। সে এনে দিল চাবুকটা। হঠাৎ ইরসাদের মধ্যে এলো পরিবর্তন এবং হিংস্র বাঘের মতই চোখ দুটো তখন তার জ্বলছে।

BanglaBook.org

প্রথমে ইরসাদ ও নিশিকান্তর মধ্যে কথা-কাটাকাটি, পরে হঠাৎ মারামারি বেধে গেল— চেষ্টা করেও আমি ওদের প্রতিরোধ করতে পারিনি।

হ্যাঁ, ইরসাদকে খুন করেছে নিশিকান্তই। এবং নিশিকান্তই ইরসাদের রক্তাক্ত মৃতদেহটা কোথায় যেন সরিয়ে ফেলেছে। তারই প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিশিকান্তকে ছোরা নিয়ে আমি আক্রমণ করি। নিশিকান্তই আমার জীবনের শনি! কুগ্রহ!

জীবনে আমার সমস্ত দুঃখ অপমান ও দুর্দশার মূল। তাই ওকে আমি খুন করতে গিয়েছিলাম। স্বেচ্ছায় এই জবানবন্দি আমি দিলাম।

হতভাগিনী বর্মী মেয়ে কিটির জবানবন্দি পড়া শেষ হলো।

সমস্ত কক্ষটি জুড়ে একটা বিষাদের স্তব্ধতা যেন থম্‌থম্ করছে।

কিরীটী আবার বলতে শুরু করে, সুব্রত, তুই যেদিন তোর আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ি থেকে রাত্রে ফোনে আমাকে জানালি যে সে-রাত্রে আমার বাড়িতে তুই নিমন্ত্রণে আসবি না, জরুরী কাজ আছে—আমি মনে কিছু করিনি। কিন্তু ঐদিনই হঠাৎ মাঝরাত্রে শ্যামবাজারের এক পেট্রোল পাম্প থেকে ফোন করে যখন জরুরী তাগিদ দিলি গাড়ি পাঠিয়ে দিতে হীরা সিংকে দিয়ে—মনে খট্‌কা লাগল। তার পরদিন হীরা সিং ফিরে এসে সব বলতে বুঝলাম, এবারে তুই শক্ত পাল্লায় পড়েছিস! ইতিমধ্যে সরকারের থেকে ডাঃ মিত্রের ব্যাপারে আমাকে অনুসন্ধান করতে নির্দেশ দিয়েছিল।

আমি ডাঃ মিত্রের ব্যাপারটা অনুসন্ধান শুরু করি। এবং খোঁজ করতে করতে যখন জানতে পারলাম সব রহস্যের মূলে রয়েছে একটা বিরাট দল তখন সেই দলটার খোঁজ শুরু করলাম।

তারপর?

ইতিমধ্যে শশাংককে নিয়ে তুই বেশ জড়িয়ে পড়েছিস, আর আমিও অনুসন্ধান করতে করতে জানতে পারলাম তোর আর আমার লক্ষ্য এক। তখন সব কিছুর উপরে নজর রাখবার জন্য বিমল বলে একজনকে তোর উপরে নজর রাখতে বলি। নিজে বেলেঘাটা অঞ্চলে একটা বাড়ি ঠিক করে, বিষণ সিং নামে একজন দারোয়ান ও একজন ভৃত্য রাখলাম—নাম করালীচরণ।

টালিগঞ্জের বাড়ির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখলাম না।

স্থানই শুধু বদল নয়, ভেক পর্যন্ত বদলে ধরলাম ছদ্মবেশ। মুখে মুখোশ।

একটু থেমে কিরীটী আবার বলতে শুরু করলে, সবই হলো কিন্তু রুই-কাতলার সন্ধান আর পাই না। এমন সময় বিচিত্র ভাবে দক্ষিণেশ্বরের ব্রীজের উপরে আলাপ হয়ে গেল বংশী নাগ ও রাজেশ্বরের সঙ্গে। কেমন করে আলাপ হলো সে কাহিনী অন্য একদিন শোনাব—তবে সেদিনও ছদ্মবেশেই ছিলাম এবং মুখেও ছিল মুখোশ।

রাজেশ্বর ঐ সময় ঠিক সিংগাপুর হতে কোনমতে প্রাণ নিয়ে বেঁচে এসেছে। দলপতি বোস সাহেবের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎও হয়েছে। রাজেশ্বর লোকটা চিরদিনই একটু দিলখোলা টাইপের এবং নেশার কারবারী। গাঁজা ও কোকেন দুর্মূল্য। এদিকে হাত একেবারে খালি। দলপতির কাছে সে কিছু টাকাও চেয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য, বোস সাহেবেরও তখন বোধ হয় খুব টানাটানি এবং ডাঃ মিত্রের গবেষণার কপির ব্যাপারে যথেষ্ট খরচপত্রও হয়েছে, অথচ আসল কাজ কিছুই এগোয়নি, মন-মেজাজও খুব চড়া। রাজেশ্বরকে সে হাঁকিয়ে দিল।

তারপর?

এদিকে বংশী ও রাজেশ্বরের সঙ্গে আলাপ করে বুঝলাম, প্রথমটি অত্যন্ত শক্ত প্রকৃতির ও

BanglaBook.org

তীক্ষ্ণ, যাকে বলে সত্যিকারের বুদ্ধিমান। দ্বিতীয়টি নিরেট বোকা ও দুষ্ট। আমারও একটা বোস সাহেবের মত দল আছে জেনেই সানন্দে দু'জনেই আমার দলে ভিড়ে গেল।

দু'দিনেই বুঝলাম, বংশী আমার দলে ভিড়লেও ইস্পাতে গড়া এবং অদ্ভুত সিনিক্ টাইপের, ভাঙবে তবু মচকাবে না।

কিন্তু রাজেশ্বর ক্রমে ক্রমে রূপালি মোহে ধরা দিল। আরো ঘনিষ্ঠ হতে বুঝলাম লোকটা দলে পড়ে অর্থের অভাবে চোরা-পথে আনাগোনা করে। শুরু হলো আমার কাজ রাজেশ্বরকে নিয়েই।

সময়ে অসময়ে প্রচুর টাকা তাকে দিতাম, বিনিময়ে সে দলের সমস্ত খুঁটিনাটি সংবাদ আমায় এনে সরবরাহ করতো। ঐ ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু করে রাজেশ্বরকে বাঁকা রাস্তা ছেড়ে সোজা পথের দিকে টানতে লাগলাম।

এদিকে সুনীল কর এখানে ফিরে এসে দলের থেকে দূরেই ছিল, তার কারণ সামান্য যেটুকু মনুষ্যত্ব তখনও তার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল সেটাই বোধ হয় তাকে নিরন্তর অঙ্কুশবিদ্ধ করছিল।

ওদিকে বোস সাহেব সুনীল করের কোন সংবাদ না পেয়ে মরীয়া হয়ে উঠেছে তখন।

দলের মধ্যে একমাত্র রাজেশ্বরই দলের সঙ্গে সিংগাপুর গিয়েছিল, অথচ রাজেশ্বরের কাছ থেকেও খুঁটিনাটি সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করা যায়নি।

রাজেশ্বর যে এদিকে তলে তলে আমার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে দলের অনেক সংবাদই পাচার করে দিচ্ছে, বোস সাহেবের মত ঝানু লোকও ঘুণাক্ষরে সেটা বুঝে উঠতে পারেনি। রাজেশ্বরের সাহায্যেই এদিকে আমি সুনীল করের সব খবর পেলাম। যদিও রাজেশ্বর নিজে সুনীল কর সম্পর্কে সঠিক সংবাদ জানত না।

সুনীল করের সংবাদ তাহলে তুই পেয়েছিলি কিরীটী? সুব্রত প্রশ্ন করে।

পেয়েছিলাম, কিন্তু—

কিন্তু কি?

তোড়জোড় করে তাকে ধরবার আগেই সে suicide করে—I found his dead body only, আর তার ডাইরীটা।

কিরীটী সিগার-কেস্ হতে একটা সিগার বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করে আবার বলতে শুরু করে, রাজেশ্বরের সাহায্যেই শশাংকবাবুর বিপদের সংবাদ পেয়েই তাকে দু-দুবার আমি উদ্ধার করি। এবং রাজেশ্বরের সাহায্যেই নীলিমা সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার আমি জানতে পারি।

কিরীটী নীলিমার মুখের দিকে তাকাল।

নীলিমা লজ্জারক্তিম মুখখানা অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয়।

সুনীল কর বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে—কিরীটী তার অসমাপ্ত কাহিনী আবার শুরু করে, ডাঃ মিত্রের গবেষণার কপির ১/৩ অংশ টুকে নিয়ে সরে পড়ে। কিন্তু বেচারা তখনও ভাবেনি শেষ পর্যন্ত ক্রেতারা আসল এবং সম্পূর্ণ কপিটাই চেয়ে বসবে। সাগরতীরে হতভাগ্য ডাক্তার মিত্রকে খুন করবার পরই সুনীলের মনে বোধ হয় অনুশোচনা জাগে এবং তারপর যখন ক্রেতারা আসল কপি চেয়ে বসল, এত পরিশ্রমের পর কোন কিছুই প্রকৃত পক্ষে লাভ হলো না, সুনীলের মনে সে অবস্থায় অনুশোচনা জাগাটা বিশেষ কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু তখন মনে দ্বিধা জাগলেও ফিরবার আর পথ নেই। কাজেই হীরা সিং ইত্যাদির সঙ্গেই কোনমতে সুনীল প্রাণ নিয়ে জাহাজে করে পালিয়ে আসবার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। জাহাজডুবি হয়েও শেষ পর্যন্ত হীরা সিংয়ের দল কলকাতায় আবার পৌঁছায় এবং তীরে নেমেই সবার অলক্ষ্যে সুনীল কর গা-ঢাকা দেয়।

BanglaBook.org

সুনীল করের কথা এই পর্যন্তই। এরপর আসবো আসল মেঘনাদ-রহস্যে।

চিৎপুর রোডে নিশিকান্ত চৌধুরী নামে এক মহাত্মা অবস্থান করতেন। লোকটি সত্যিই গুণী। এবং তার চরিত্র সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি আমার মনে হয়, লোকটা এক ধরনের মস্তিষ্ক-বিকৃতিতে ভুগছিল। এবং মস্তিষ্কের ঐ বিকৃতি ঘটেছিল লোকটার কুৎসিত ধরনের যৌন-আকাঙ্ক্ষা হতেই। যে কোন নারী—যার দেহের একটা আলগা সুষমা বা লাবণ্য আছে এবং বিশেষ করে যে সব নারীর দেহ-সৌষ্ঠব অজ্ঞাতে পুরুষের লালসাকে উদ্রিক্ত করে অর্থাৎ এক কথায় যে সব নারীর দেহে সহজ একটা যৌন-আবেদন আছে, নিশিকান্তর মনকে তারাই আকর্ষণ করতো। এবং সেই সব নারীকে নিজের মুঠোর মধ্যে পাওয়ার জন্য নিশিকান্তর পৃথিবীতে এমন কোন নীচ বা জঘন্য উপায়ই ছিল না যা সে না নিতে পারতো। নিশিকান্তরও একটা পূর্ব ইতিহাস—

হঠাৎ বাধা দিল এইখানে সুব্রত, পেয়েছি। আমি জানি নিশিকান্তর পূর্ব ইতিহাস। লোকটা পলাতক খুনী ও জালিয়াৎ। আসল নাম ওর দ্বিজেন সেন—জাতে তিলি। ওর দাদার নাম ছিল হরিপদ সেন। পূর্ববঙ্গে ওদের মস্ত বড় জমিদারী ও পাটের কারবার ছিল। সহসা এক রাত্রে পাষণ্ড দ্বিজেন তার পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভাইকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে গা-ঢাকা দিল। দ্বিজেনের বয়স তখন ২২/২৩য়ের বেশী নয়। হত্যা করবার দিন-দুই আগেই জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে ব্যবসার ও অন্যান্য যে সব নগদ টাকা ব্যাঙ্কে ছিল, তার বেশীর ভাগ টাকাই প্রায় লক্ষাধিক হবে, দ্বিজেন দাদার নাম জাল করে চেকের সাহায্যে তুলে নিয়েছিল।

বলিস কি!

তরিবৎ ছেলে! ঐ বয়সেই জাল হতে শুরু করে খুন করতে পর্যন্ত দ্বিধা করে নি। বড় ভাই বিশ্বাস করে ছোট ভাইয়ের উপরেই সমস্ত কিছুর ভার অর্পণ করে বসেছিল। নিজের মায়ের পেটের ভাইকে তো দূরস্থান, বোধহয় নিজের সন্তানকেও এতখানি বিশ্বাস করে না—যতটা বিশ্বাস ও স্নেহ করতো হরিপদ তার ঐ স্কাউন্ড্রেল ভাইটাকে। মানুষ পাষণ্ড ও নীচ হলেই যে হরিপদর মত বড় ভাইকে খুন করতে পারে দ্বিজেনের কথা শুনবার আগে পর্যন্তও আমার ধারণা ছিল না!

সুব্রতর কথাটা একপ্রকার যেন লুফে নিয়েই কিরীটী বলে ওঠে, সুব্রত, ক্রাইম জগৎটাই একটা বিচিত্র জায়গা! অনেক সময় দেখা যায় ও গিয়েছে—ক্রাইম বা দুষ্কৃতি করবার লিপ্সা মানুষের মধ্যে তার পূর্বপুরুষদের চরিত্র থেকেই সংক্রামিত হতে, আবার কোন কোন ক্রিমিন্যাল টাইপের লোক আপনা হতেই দুষ্কৃতিটাকে মনে ও চরিত্রের মধ্যে ফুটিয়ে তোলে।

এই যে শেষোক্ত শ্রেণীর লোক, এদের যদি ব্রেন (মস্তিষ্ক) ও তার দেহমধ্যস্থিত নলীহীন গ্রন্থিগুলো (Ductless gland) পরীক্ষা করে দেখা যেত, হয়ত অনেক রহস্যের মীমাংসা হতো। এবং তোমার ঐ দ্বিজেন ছোকরাটি শেষোক্ত শ্রেণীরই। আভ্যন্তরীণ দৈহিক গঠন, মানসিক বৃত্তি, চরিত্রগত প্রবৃত্তি সবই ছিল—হয়ত দুর্দান্ত একটা ক্রিমিন্যালের মতই, অথচ বহির্গঠনের দিক দিয়ে সেটা জানবার বা বুঝবার উপায় ছিল না। আরো আশ্চর্য দেখবি এরা সাধারণতঃ বাইরে অত্যন্ত বিনয়ী, মৃদুভাষী হয়, যাতে করে চেহারার দিক থেকেও কোন বিশেষত্ব দেখা দেয় না। তাই এই শ্রেণীর লোক সম্পর্কে বিশেষ সাবধান বা সতর্ক না হলে ঠকতে হয় শেষ পর্যন্ত।

ঠিক তাই। সুব্রত আবার বলে, সেই কারণে হরিপদও ঠকেছিল বোধহয়। যাহোক, দ্বিজেন হরিপদকে খুন করে লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে একবারে সোজা ছদ্মবেশে বর্মা মুল্লুকে চলে গেল এবং সেখানে গিয়ে নাম পর্যন্ত পালটে নাম নিল নিশিকান্ত চৌধুরী। সেখানেও অনেক কীর্তি করে ইরসাদ ও কিটির সর্বনাশ করে—পুলিসের নজরে ঘন ঘন যখন পড়তে লাগল, সেই সময় কলকাতায় পালিয়ে এসে played the role of Dr. Jackal and Mr. Hide। চন্দননগরে বসন্ত ঘোষাল

BanglaBook.org

নামে ভদ্রজীবনের একটা খেলা চলতে লাগল এবং কলকাতার চিৎপুর অঞ্চলে নিশিকান্ত ও ওঙ্কারনাথরূপে চললো আসল ব্যবসা। কোকেনের কারবার করতে করতে নিজেও ধরলো কোকেন বোধ হয়, তাই না?

হ্যাঁ। জবাব দেয় কিরীটী।

তারপর একটু হেসে আবার বলতে শুরু করে, এইবারে বাকী রহস্যটি আমিই খোসলা করে দিই শোন্। কলকাতায় ফিরে এসে নিশিকান্ত নিজেকে আর সাক্ষাৎ ভাবে দুষ্কৃতির সঙ্গে না জড়িয়ে, টাকার থলি, মদের বোতল, হ্যাসহিস ও কোকেন নিয়ে কিছুকাল কলকাতা শহরে যে একটা অন্ধকার পাড়া ও সমাজ আছে তাদের লোকগুলোর সঙ্গে এবং মাঝে মাঝে রেসের ময়দান ও জুয়ার আড্ডাতেও ঘুরতে লাগল। ঐ সময়েই টাকা, মদ, কোকেন ইত্যাদির দ্বারা কতকগুলো দুর্দান্ত প্রকৃতির লোককে বশীভূত করে একটা দল গড়ে তোলে। অবশ্য এসব সংবাদও রাজেশ্বরের মুখেই আমি পেয়েছি, কারণ প্রথম দিকেই সে নিশিকান্তর দলে ভিড়েছিল এবং কিছুকাল লোকসংগ্রহের ব্যাপারে রাজেশ্বরই নিশিকান্তর ডান হাত ছিল এক প্রকার বললেও হয়। কিন্তু একটানা কাউকেই নিশিকান্ত ঘনিষ্ঠভাবে পাত্তা দিত না, অতএব রাজেশ্বরকেও একদিন দূরে সরে যেতে হলো। নিশিকান্তর এটাই ছিল চরিত্রের বড় দুর্বলতা। যাহোক, নিশিকান্ত ঐভাবে অনেকগুলো লোককে নিজের মুঠোর মধ্যে রেখে নিজে সম্পূর্ণভাবে দূরত্ব বাঁচিয়ে আড়াল থেকে দলের মধ্যে ৫/৬ জনকে প্রয়োজনমত দলপতি খাড়া করে ভিন্ন ভিন্ন নামে ও রূপে যত প্রকার দুষ্কৃতি সাধন করত। দলপতিরা পরস্পর যেমন পরস্পরকে জানত না বা চিনত না, তেমন সাক্ষাৎভাবে আসল কর্তাটিরও কোনদিন দেখাসাক্ষাৎ পেত না। এতে করে প্রত্যেকটি দলপতিই ভাবত আমিই আসল এবং আমিই যে অন্যের অধীন তা কেউ জানে না। অদ্ভুত একটি অস্ত্রের সৃষ্টি করে নিশিকান্ত যার নামকরণ করে 'বাঘনখ'।

আসলে ছোটখাটো ঐ দলপতিগুলোই ছিল নিশিকান্তর এজেন্ট।

নিশিকান্তর আর একটা বিশেষ গুণ ছিল, ঐ সব দলপতিদের মধ্যে কখনো আবির্ভূত হয়ে নিজের আধিপত্য ও ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করত না। কেবল প্রচুর অর্থসাহায্য আসত নিজেরই অন্য একটি রূপ নিশিকান্তর সেক্রেটারীরূপী ওঙ্কারনাথের হাত দিয়ে। অর্থাৎ প্রচুর অর্থের সাহায্যে কতকগুলো সাংঘাতিক বেপরোয়া ক্রিমিন্যাল টাইপের দুর্জন লোক নিয়ে দুষ্কৃতির ব্যবসা করতো নিশিকান্ত।

এতে করে লোকগুলোও হাতে থাকত, টাকাও আসত এবং নিজের অবৈধ যৌন-পরিতৃপ্তিরও সুযোগ মিলত। এই হচ্ছে রহস্যের মেঘনাদ নিশিকান্তর আসল কাহিনী।

অরিন্দম সরকার ছিল এম্. এস্-সি'তে আমার সহপাঠী। অত্যন্ত সৎ চরিত্রের লোক ছিল প্রথম জীবনে।

তারপর সঙ্গদোষে জুয়ো খেলতে শুরু করে ও ক্রমে জুয়োর নেশায় একবার পেয়ে বসলে যা হয়, অধঃপাতের সোজা সড়কটা ধরে দ্রুত এগিয়ে চলতে লাগল।

শিক্ষা-দীক্ষা-রুচি সব গেল। এই অবস্থায় বোস সাহেবের খপ্পরে গিয়ে পড়ল। এবং সেই হয়েছিল দলের বস্ নামে পরিচিত। তাই প্রথম দিনই দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অরিন্দম সরকারকে দেখে আমার চিনতে কষ্ট হয়নি। কিন্তু সে আমায় চিনতে পারেনি আমার ছদ্মবেশ থাকার দরুন।

হঠাৎ সুব্রতর নজর পড়ল ইতিমধ্যে কখন একসময় নীলিমা ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গিয়েছে, কিরীটী অরিন্দম সরকারের কথা বলতে শুরু করতেই।

BanglaBook.org

।। উপসংহার ।।

ব্রজলাল ও দাশবাবুর কোন সংবাদ এখনও পাওয়া যায়নি।

অরিন্দম সরকারও যে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছে কেউ জানে না।

আরো দিন-দুই পরে। সুব্রত ও শশাংক কথা বলছিল।

সুব্রত বলছিল, সত্যি আপনার কাকা ডাঃ অজয় মিত্রের গবেষণাটার পিছনেই ছিল বোধ হয় অভিশাপ। অভিশপ্ত তাঁর গবেষণার পাণ্ডুলিপিটা। মনে করে একবার দেখুন, নিজে ডাক্তার মিত্র ঐ গবেষণার পাণ্ডুলিপিটার দরুন কোথায় কোন্ দূরদেশে নির্জন সাগরতীরে প্রাণ দিলেন, বন্ধু সুনীল কর প্রাণ দিল আত্মহত্যা করে, বলদেব ঘোষ নিহত হলো, নিশিকান্ত প্রাণ দিল—এখন ঐ বাকী অংশটা বের করা—

না, অভিশপ্ত ও পাণ্ডুলিপি যেমন আছে তেমনই থাক। শশাংক বলে, ওতে আর আমার কোন লোভ নেই সুব্রতবাবু!

কিন্তু অত বড় একটা মূল্যবান গবেষণা—সুব্রত বলে।

না। যার সৃষ্টিমাত্রেই এত অমঙ্গল, এত রক্তারক্তি, প্রাণ হানাহানি—ওটার কথা আর নয়!

তাহলে সেদিন যে পাণ্ডুলিপির অংশটা আপনাকে দিয়ে গিয়েছিলাম—

আলমারির মধ্যেই পড়ে আছে। হাতও দিইনি। শশাংক জবাব দেয়।

নীলিমা দেবীর খবর কি?

তারপর থেকে আর তো দেখা হয়নি।

ঐদিনই সন্ধ্যার দিকে। শশাংক বাইরে বেড়াতে বের হবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে, ঘরের মধ্যে পদশব্দ পেয়ে চম্‌কে ফিরে দেখে—ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে নীলিমা।

নীলিমা দেবী! সবিস্ময়ে বলে ওঠে শশাংক।

এলাম। বিদায় নিতে—

বিদায় নিতে!

আগামীকাল আমি মাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি চিরদিনের মত কলকাতা ছেড়ে মিঃ মিত্র।

বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

শশাংকর আহ্বানে নীলিমা সামনের সোফাটায় উপবেশন করে।

কিন্তু আপনি যেন কোথায় বের হচ্ছিলেন মিঃ মিত্র—এসে বোধ হয় বাধা দিলাম—

বিশেষ কোথাও না, আপনার ওখানেই যাচ্ছিলাম।

আমার ওখানে!

হ্যাঁ। খুব আশ্চর্য হবার মত কিছু কি? শোন নীলিমা, যে কথাটা তোমাকে বলবার জন্য আমি যাচ্ছিলাম, সেটা তুমি যখন এসেই গেলে এখানেই বলা চলতে পারে।

সবিস্ময়ে নীলিমা শশাংকর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

শশাংক আরো একটু সন্নিকটে এসে দাঁড়ায় এবং হঠাৎ নিচু হয়ে নীলিমার ডান হাতখানা ধরে বলে, তোমার তো যাওয়া হতে পারে না নীলা! তোমাকে যে আমার বিশেষ প্রয়োজন—

BanglaBook.org

আমি—সংকোচে ব্রীড়ায় নীলিমার মুখখানি রক্তাভ হয়ে ওঠে।

হ্যাঁ, ভেবে দেখলাম এ কদিন—তোমাকে বাদ দিয়ে আমার চলবে না। বল নীলা, আমার এ দাবিটুকু কি খুবই অসঙ্গত?

সহসা নীলিমা তার মুখখানা কোলের মধ্যে গুঁজে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে যেন ভেঙ্গে পড়ে।

কেঁদো না নীলা—কেঁদো না।

না, না—এ হতে পারে না। আমার বাবা, আমার পরিচয়—

তোমার পরিচয় তুমি—তোমার বাবা নয়। তিনি নিমিত্তমাত্র।

কয়েকদিন পরে—

দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার নির্জন কূলে। সন্ধ্যা সমাগত। পাশাপাশি বসে নীলিমা ও শশাংক।

হঠাৎ এক সময় পকেট হতে সুব্রতর উদ্ধার-করা তার কাকার গবেষণার সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি বের করে শশাংক ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতে থাকে।

ও কি! কি ওটা ছিঁড়লে!

অভিশপ্ত সেই পাণ্ডুলিপিটা নীলা। শশাংক মৃদু হেসে জবাব দেয়।

অত বড় মূল্যবান গবেষণাটা নষ্ট করে ফেললে!

হ্যাঁ। অনেক প্রাণহানি, অনেক রক্তপাত ঘটেছে—তাই গঙ্গার জলেই একে বিসর্জন দিলাম।

হঠাৎ অদূরে কার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, মাই গড্! শেষ পর্যন্ত মা-গঙ্গা—

বংশী নাগকে ওরা চেনে না। কিন্তু বংশী নাগ ওদের চেনে।

চকিতে ওরা ফিরে তাকায়, কিন্তু স্পষ্ট করে বংশী নাগকে দেখতে পায় না। কারণ সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারে চারিদিক তখন ঘোর হয়ে গিয়েছে। শুধু শুনতে পায় বিলীয়মান একটা দ্রুত পদশব্দ। আর গঙ্গার বুকে বোধ হয় জোয়ার এলো—ঘোলাটে জলের কলকল শব্দ!

শশাংক কিছুক্ষণ অবাক হয়ে অন্ধকারে চেয়ে থাকে।— কে কথা বললে?

এক সময় শশাংক ডাকে, নীলিমা!

নীলিমা বলে, কি?

যাবে না!

চলো।

—শেষ—

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org